বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

ফরিদপুর

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

ফরিদপুর

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

মাসুদ রেজা

সংগ্রাহক

মো. শওকত আলী মোল্লা

মাহবুব রেজা

শামীমা আকতার

সালাহউদ্দীন আহমেদ

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
ফরিদপুর

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৪৯৭৯

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA FARIDPUR : (Present state of Folklore in Faridpur District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managaing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 250.00 only. US$: 5.

ISBN-984-07-4997-8

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার

www.pathagar.com

জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, ‟Folklore is folklore only when performed”. অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১.সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২.সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩.সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪.সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫.সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬.সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭.সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮.প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯.সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০.সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১.সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২.বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১.জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২.জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩.জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪.জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫.জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬.লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭.অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক.ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ.ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ.দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ.যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ.স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ.থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

www.pathagar.com

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item-যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner

www.pathagar.com

rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল

www.pathagar.com

বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি৷ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট৷ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য৷ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর৷ মৃত্তিকার ধরন৷ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু৷ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি)৷ নারী-পুরুষের হার৷ তরুণ ও প্রবীণের হার৷ শিক্ষার হার৷ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয়৷ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি)৷ শিল্প-কারখানা৷ ব্যবসা-বাণিজ্য৷ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি)৷ খাদ্যাভ্যাস৷ পোশাক-পরিচ্ছদ৷ পেশাগত পরিচয়৷ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ)৷ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি৷ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা,

www.pathagar.com

রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, আটপাড়া, নেত্রকোনা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর),

www.pathagar.com

গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ি), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল, উজিরপুরের গুঠিয়ার সন্দেশ এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি এবং বিন্নি, কদমা, বাতাসা, কুলখানি, চেহলাম, জিয়ারত, মেজমানী ইত্যাদি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়ে হলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ির শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস** : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলা ভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি :

www.pathagar.com

ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম :বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত),

২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়ে হলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন

www.pathagar.com

এবং অনবরত তাগাদা ও নিদের্শনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রণয়ন সমন্বয়কারী এবং বাংলা একাডেমির প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান ফরিদপুর জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে ফরিদপুরের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৮৮

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঘ. নদ-নদী ও খাল-বিল
ঙ. হাটবাজার
চ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা
জ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব
ঝ. মুক্তিযুদ্ধ
ঞ. বিশিষ্ট লোককবি ও সাধক

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৮৯-১৩৬

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. লোকপুরাণ
ঘ. লোকছড়া
ঙ. ভাটকবিতা
চ. পুথিপাঠ ও পুথিসাহিত্য

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১৩৭-১৪৬

১. মৃৎশিল্প
২. আলপনা
৩. নকশিকাঁথা
৪. নকশিপাখা
৫. দারুশিল্প
৬. পটশিল্প
৭. বাঁশবেত
৮. পূজার চিত্র

www.pathagar.com

৯. পিঁড়িচিত্র
১০. কুলাচিত্র
১১. গেট চিত্র

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১৪৭-১৪৮

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৪৯-১৫০

লোকসংগীত (folk song) ১৫১-২২৬
১. বিয়ের গীত
২. মুর্শিদি গান
৩. কবিগান
৪. বিচার গান
৫. গাজির গান
৬. জারিগান
৭. রয়ানি গান
৮. সূর্য পূজার গান
৯. গোক্ষুর নাড়ু
১০. নইলা গান
১১. হ্লোই গান
১২. সারিগান
১৩. বারোমাসি
১৪. গাশ্‌শি
১৫. গোয়ালের ডাক
১৬. ছয়হ্যাটুরে বা নামকরণ
১৭. অন্যান্য আঞ্চলিক গান

লোকউৎসব (folk festival) ২২৭-২৩১
১. নবান্ন উৎসব
২. নববর্ষোৎসব
৩. রথযাত্রা
৪. পৌষ উৎসব
৫. বৃষ্টি উৎসব

লোকমেলা (folk fair) ২৩২-২৩৫

www.pathagar.com

লোকাচার (ritual) ২৩৬-২৪৪
১. জামাইষষ্ঠী
২. বিয়ে
৩. অন্নপ্রাশন
৪. ছয়হ্যাটুরে বা নামকরণ
৫. সুন্নতে খাতনা
৬. ভাদ্রমঙ্গল চণ্ডি
৭. কৃষকের লোকাচার

লোকখাদ্য (folk food) ২৪৫-২৪৮
১. পিঠাপুলি
২. বাগাটের দধি-মিষ্টি
৩. বিবির ডাল
৪. কাজীর ভাত
৫. টক জাউ
৬. তাল পিঠা ও তালবড়া
৭. চাপড়ি
৮. নটাগুটা
৯. খাটা
১০. শিরনি
১১. নাড়ু
১২. জুলাভাতি

লোকক্রীড়া (folk games) ২৪৯-২৫৪
১. হাতটাবুটি খেলা
২. জলকেলি খেলা
৩. লাঠিখেলা

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ২৫৫-২৬৬

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ২৬৭-২৭৪

ধাঁধা (riddle) ২৭৫-২৮০

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ২৮১-২৮৮

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ২৮৯-২৯৬

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ২৯৭-৩০০
১. কৃষিকাজে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি
২. মাছ ধরার ফাঁদ
৩. তেলের ঘানি
৪. মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি
৫. লৌহজাত দ্রব্য থেকে লোকপ্রযুক্তি
৬. তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি
৭. গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি
৮. খেজুরগাছ ও তালগাছ থেকে রস আহরণ ও গুড় তৈরিতে লোকপ্রযুক্তি
৯. অন্যান্য লোকপ্রযুক্তি

লোকভাষা (folk language) ৩০১-৩১২

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি
ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

ফরিদপুর জেলা : প্রসিদ্ধ সুফিসাধক শেখ ফরিদউদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর (র.) [শেখ ফরিদ]-এর নামানুসারে 'ফরিদপুর' নামকরণ হয়েছে। ইদানিং কোনো কোনো গবেষক শেখ ফরিদউদ্দিন ও শেখ শাহফরিদ নামের অপর দু'জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন।

এ-জেলার পূর্বনাম 'ফতেহাবাদ' সুলতান জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ-এর (১৪১৫-১৪৩৩) শাসনামলে এটি টাকশাল শহর হিসেবে গড়ে ওঠে। 'আইন-ই- আকবরী' গ্রন্থে এর নাম 'হাউশী মহল ফতেহাবাদ' হিসেবে উল্লেখ আছে। ডিব্যাগ্রেস ও ব্রেভ এর মানাচিত্রে শহরটির নাম 'ফতিয়াবাস' লেখা হয়েছে। ফন ডেন ব্রুকের মানচিত্রে শহরটির নাম 'ফাথুর'। দৌলত উজির বাহরাম খানের লাইলী মজনু (১৫৬৫-১৭৭৫) গ্রন্থে ফতেহাবাদ এর উল্লেখ আছে। কথিত আছে, ফতেহ আলী (আমীন জৈনুদ্দীন ফতেহ শাহ) নামের একব্যক্তি জনবিরল এলাকাটি আবাদ করে বাসযোগ্য করে তুলে ছিলেন। ফলে একাটার নাম হয় ফতেহাবাদ। ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের পাতরাইল গ্রামে তার সমাধি ঢিবি পাওয়া গিয়েছে। যদিও ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ অক্টোবর নবাব শায়েস্তা খাঁর রাজমহল থেকে ফরিদপুর হয়ে ঢাকা আগমনের বর্ণনায় 'ফরিদপুর' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। রেনেলের মানচিত্রে (১৭৬৪) ফরিদপুর শব্দটি রয়েছে। আঞ্চলিক উচ্চারণে 'ফইরাদপুর' শব্দ থেকে ধারণা করা হয় 'ফরিয়াদ' জানানোর স্থান হিসেবে এর নামকরণ হতে পারে। এ-জেলার জন্মকাল নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতভেদ দেখা যায়। Administrative convenience order 18th December 1807 অনুযায়ী (ঢাকা ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার), W.W Hunter-এর মতে ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুরে আলাদা কোর্ট ভবন নির্মাণ করা হয়। কারো কারো মতে, ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি এ জেলায় জন্য স্বতন্ত্র Revenue Adminiotration গঠন করা হয়। অর্থাৎ Faridpur collectorate Separated." এ-ছাড়া ১৮৩৫–১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে, আবার কেউ কেউ ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে এ-জেলার নাম ফরিদপুর হয়েছে ধারণা করেন। তৎপূর্বে এ-জেলাকে ঢাকা-জালালপুর বলা হতো।

উপজেলাসমূহের নামকরণ : ভাঙ্গার পূর্ব নাম কুমারগঞ্জ। কুমার নদের পাড়ে বাজার গড়ে ওঠার কারণে সম্ভবত এই নামকরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে উভয় পাড়ের লোকজনের মধ্যে ব্যবসায়িক বা অন্য কোনো কারণে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তখন বাজার ভেঙে যায় এবং নদীর দুই পাড়ে বাজার গড়ে ওঠে। সেই থেকে কুমারগঞ্জের নাম পরিবর্তন হয়ে ভাঙ্গা নামকরণ হয়। মহাকবি কালিদাসের পঙ্‌ক্তি থেকে ভাঙ্গার

www.pathagar.com

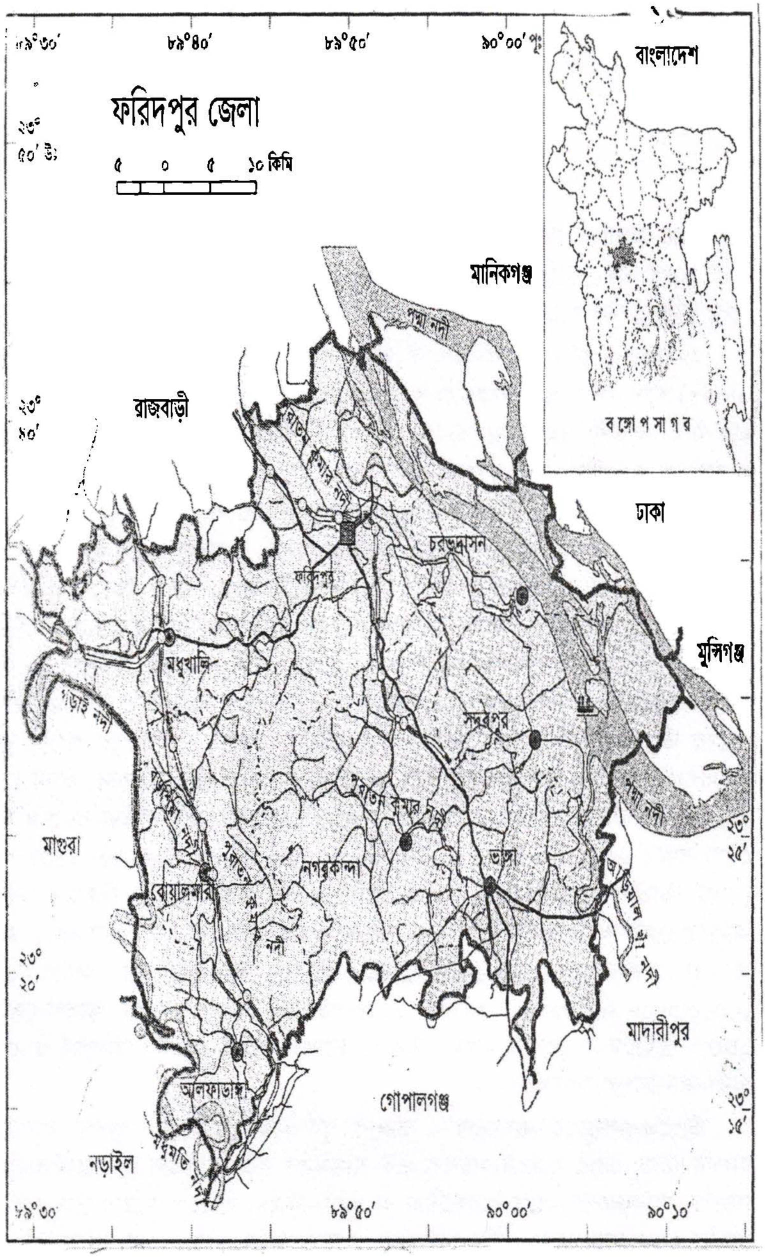

ফরিদপুর জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

বর্ণনা পাওয়া যায় যে, এটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় সমৃদ্ধশালী ছিল। দ্বীপটি গঠিত হয়েছিল গঙ্গার প্রবাহের ভিতর। নৌকা পরিচালনা ব্যবস্থা ও যুদ্ধের নৌচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে ভাঙ্গা প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল।

ঐতিহ্যবাহী ও ইতিহাসের মূল ভূখণ্ড ভূষণার আদি ভূ-ভাগ মধুখালী। ভূষণার সকল ইতিহাসের ধারক বাহক এটি। মধুখালীর ইতিহাস জড়িয়ে আছে ভূষণার আদি ইতিহাসের সাথে। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ভূষণা থানা মূল ভূষণা থেকে সৈয়দপুর এবং বোয়ালমারী স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত মধুখালী বোয়ালমারী থানার সঙ্গে যুক্ত থাকে। মধুখালী নামে পৃথক থানার জন্ম ১৯৮৪ সালে।

মধুখালী নামকরণের কোনো সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয়, রাজা সীতারাম রায়ের আমলে চন্দনা বারাশিয়া নদীর একটি অংশ মধুখালী থেকে বোয়ালমারী ও মাগুরা জেলার মহম্মদপুর এর আংশিক অঞ্চলে খরস্রোতা নদী নামে পরিচিত ছিল। এই নদীটি আদি আমল থেকেই নাব্য ছিল। তবে দিক পরিবর্তনের ফলে চর জমে নদীটির বিলুপ্তি ঘটেছে। ধারণা করা যায়, মধু নামের কোনো ব্যক্তির নামে মধুখালী নামকরণ হয়েছে। আবার অনেকের মতে, এই অঞ্চলের বনজঙ্গলে এক সময় মৌমাছিদের আহরিত মৌচাক থেকে প্রচুর মধু উৎপন্ন হতো বলে এলাকার নাম হয়েছে মধুখালী।

প্রাচীন কালের ভূষণা ভূ-ভাগ থেকে বোয়ালমারী থানার জন্ম। ১৮০০ সালের গোড়ার দিক থেকে চন্দনা-বারাসিয়া নদীর তীরে বোয়ালমারী বাজার নামে একটি ছোট্ট বাজার গড়ে উঠেছিল আদি যুগ থেকে বোয়ালমারী নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ধারণা করা হয়, বোয়ালমারী নামক স্থানটি ইংরেজ বণিকদের বাংলায় আগমনের পরবর্তী সময়ে স্থানটির নামকরণ করা হয়েছে। ১৭৭৯ সালে কোম্পানি সরকার কর্তৃক বঙ্গ ও বিহারে নীল চাষের অধিকার পেয়ে ইউরোপীয় বণিকেরা নীলচাষ ও কুঠি স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে থাকে।

১৮৩৩ সালের দিক চন্দনা-বারাসিয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য নীলকুঠি স্থাপন ও নীলচাষ আরম্ভ করে। এ থেকে ধারণা করা হয়, নীলকুঠি স্থাপনের পূর্বভাগে ইংরেজ কর্তৃক এ স্থানের নামকরণ করা হয়েছে। বোয়ালমারী নামকরণ করা নিয়ে বেশ কিছু উপকথা প্রচলিত আছে। প্রচলিত কথা অনুযায়ী, নীলকুঠি স্থাপনের পূর্বে কোন এক ইংরেজ ঘোড়া ছুটিয়ে নদীর পাড় দিয়ে যাচ্ছিলেন, কোথায়ও নীলকুঠি স্থাপন সম্ভব কিনা? এ সময় নদীতে অসংখ্য জেলে মাছ ধরছিল। এ অঞ্চলে সে সময় জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ার কারণে ইংরেজ সাহেব সঠিক স্থান নির্ধারণ করতে পারছিলেন না, হঠাৎ তিনি ঘোড়া থামিয়ে এক জেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, What is the name of the place? জেলেটি ভাবলো, সে কি মাছ ধরছে, সাহেব বোধ হয় তাই জিজ্ঞেস করছে। জেলে উত্তর দিল বোয়াল মারি। সেই থেকে ইংরেজ সাহেবেরা এই স্থানটিকে বোয়ালমারী নামে প্রচলন করে। পরবর্তীকালে ইংরেজদের সাথে মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে স্থানীয় অধিবাসী বাঙালিরাও এই স্থানটি নির্দিষ্ট করে বোঝাতে বোয়ালমারী বোঝাতো।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রচলিত কথা হলো, চন্দনা-বারাসিয়া নদী পূর্ব থেকেই খরস্রোতা নদী ছিল। নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছিল অসংখ্য বিল-বাওড় ও নিচু জলাভূমি। এই নদীর একটি মুখ মধুমতির সাথে সংযুক্ত হওয়ায় ঘোলা পানির স্রোতের সাথে নদীতে প্রচুর বোয়াল মাছ পাওয়া যেত। দূর দূরান্ত থেকে এখানে অনেক লোক মাছ ধরতে আসতো। যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো, কোথায় যাও? বলতো বোয়াল মারীতে।

বোয়াল মাছের বোয়াল এবং ধরা শব্দের পরিবর্তিত শব্দ মারা সংযুক্ত হয়ে লোক মুখে পরিবর্তনে স্থানটির নাম হয়েছে বোয়ালমারী। বোয়ালমারী উৎপত্তির তৃতীয় প্রচলিত কথাটি হলো, ইংরেজ শাসনের বহু পূর্বে শ্রী বলচন্দ্র নামে একজন তালক মণ্ডলের শাসনকর্তা ছিলেন। তার সহধর্মিনীর নাম ছিল মীরা শ্রীচন্দ্র বল এর বল এবং মীরা সংযুক্ত হয়ে বলমীরা এর ক্রম পরিবর্তিত রূপ হলো বোয়ালমারী।

বোয়ালমারী নামকরণ নিয়ে যত প্রচলিত কথাই থাক না কেন, একটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হলেই অন্যটি মিথ্যা হয়ে যায়। অতএব, ইংরেজ সাহেবদের আগমনকালেই হোক অথবা চন্দ্র আমল থেকেই হোক– এ প্রচলিত কথাটিও ফেলে দেওয়া যায় না, যেহেতু ঐ আমলে বিভিন্ন রাজা শাসনকর্তা অথবা তাদের বিভিন্ন কাজকর্মের ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁরা নিজেদের নামানুসারে এলাকার নামকরণ করতেন। অতএব, মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যেহেতু এলাকাটি চন্দনা-বারাসিয়া নদীর তীরে বোয়ালমারী বাজার অবস্থিত, নদী এবং বোয়ালমাছ ধরাকে কেন্দ্র করেই এ স্থানটির নাম বোয়ালমারী হয়েছে।

আলফাডাঙ্গা ফরিদপুর জেলার একটি ছোট উপজেলা শহর। জমিদারি আমলে নড়াইল জমিদারের অধীনস্ত আলফাডাঙ্গার উত্তর পশ্চিমাংশ বানা শিরগ্রাম ছিল বোয়ালামারীর অন্তর্ভুক্ত। আলফাডাঙ্গা থানা কত সালে স্বতন্ত্র থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তার কোন সঠিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে, ইংরেজ শাসনামলের শেষভাগে আলফাডাঙ্গার অস্তিত্ব ছিলো। ১৯৬০ সালের পূর্ব সময় পর্যন্ত আলফাডাঙ্গা ছিল নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত। মধুমতি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এই আলফাডাঙ্গা নদীর বাঁক পরিবর্তনের কারণে যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার কিছু অংশ এবং নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত আলফাডাঙ্গাকে যশোর থেকে পৃথক করে ফরিদপুরে অন্তর্গত করা হয় ১৯৬০ সালে। মধুমতি নদীর বাঁক পরিবর্তনের কারণে যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার যে অংশটি যশোর থেকে পৃথক করে ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সে অংশটি হলো বর্তমান বোয়ালমারী উপজেলার ময়না ও গুণবহা ইউনিয়ন।

আলফাডাঙ্গা উপজেলার নামকরণের কোন ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে নামকরণের প্রাচীন অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আলফা + ডাঙ্গা সমন্বয় করলে দাঁড়ায় আলফাডাঙ্গা। ডাঙ্গা শব্দটি শুষ্ক ভূখণ্ডের একটি কথ্যরূপ। যার অর্থ জলনিমগ্ন অঞ্চলের উপকূল, তীর, চর বা জলামগ্নতার বিপরীতার্থক শব্দ বিশেষ। অপরদিকে

www.pathagar.com

আলফাডাঙ্গার নামকরণ সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে প্রবাদ আছে যে, আলফা নামক এক ঘাসের নাম থেকে আলফাডাঙ্গা নামের উৎপত্তি।

আবার কেউ কেউ মন্তব্য করেন, অল্প ডাঙ্গা থেকে আলফাডাঙ্গা মধুমতিরই বাঁক পরিবর্তিত, জলনিমগ্ন অংশ থেকে জেগে উঠা চর বা অঞ্চল যা ডাঙ্গা হিসেবে কথিত। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, রাজা সীতারাম রায়ের আমলের এই অঞ্চল ছিলো গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। এটি ছিলো মগ, ফিরিঙ্গিদের নিরাপদ স্থান।

ধারণা করা হয়, তখন এই অঞ্চলে আলফা নামক একজন দুর্ধষ দস্যুর আস্তানা ছিলো। পরবর্তীতে সেই দস্যুর নামানুসারে স্থানের নাম হয় আলফাডাঙ্গা।

পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ ও ভুবনেশ্বর বিধৌত সদরপুর। সদর মানে প্রথম, প্রধান ইত্যাদি। পূর্বে এখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। পুলিশ ফাঁড়ি থানা হিসেবে উন্নীত হয়ে থানা সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। লোকজন তখন এটাকে সদরপুর বলতে শুরু করে। তাই নাম হয় সদরপুর। অনেকে মনে করেন, থানা সদর হতে এলাকাটির নাম সদরপুর। আবার কেউ বলেন, সর্দার পদবি হতে এলাকাটির নাম হয় সর্দারপুর। যার অপভ্রংশ সদরপুর।

পদ্মা ও ভুবনেশ্বর বিধৌত চরভদ্রাসন। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে চরসালেপুর নামক স্থানে চরভদ্রাসন থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূল এলাকাটি ছিল পদ্মা নদীর চর। চাষাবাদ করে চরকে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য তৎকালীন জমিদার কৃষি পেশার সঙ্গে যুক্ত কিছু লোককে এখানে নিয়ে আসেন।

এই ভদ্র সম্প্রদায়ের লোকজন চাষাবাদের মাধ্যমে চরটিকে শস্যশ্যামল করেছিল বলে চরটির নাম হয় চরভদ্রাসন।

আবার কেউ কেউ মনে করেন এক সময় যার বিখ্যাত ভদ্রা পলি জমে জমে চরটি জেগে ওঠেছিল। ভদ্রা নদীর চরে একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল বলে এর নাম হয় চরভদ্রাসন।

ভুবনেশ্বর ও কুমার নদ বিধৌত নগরকান্দা। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে এখানে একটি থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। নগর ও কান্দা এই দুইটি শব্দদ্বয়ে নগরকান্দা। নগর শব্দের অর্থ লোকালয় বা শহর এবং কান্দা শব্দের অর্থ পাশে বা কিনারে। স্থানটি তৎকালীন মূল নগর বা জনপদের একপাশে ছিল তাই নাম হয় নগরকান্দা।

আবার কেউ কেউ মনে করেন, কাদা হতে কান্দা শব্দের উৎপত্তি। নগরটি প্রচুর কাদায় ভর্তি ছিল। তাই নাম হয় নগরকাদা>নগরকান্দা।

নগরকান্দার উভয়-পশ্চিমাংশ বিভক্ত করে সালথা থানার জন্ম হয়। সালতা নামকরণ নিয়ে যে সকল কথা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে 'চালতা' কথাটি অন্যতম। এখানে একটি প্রকাণ্ড চালতা বৃক্ষ ছিল। এই চালতা থেকে সালতী নামটি এসেছে।

www.pathagar.com

একনজরে ফরিদপুর জেলা ও উপজেলা পরিচিতি

জেলা/উপজেলার নাম	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	ইউনিয়ন	মৌজা	গ্রাম	মোট	শিক্ষার হার
জেলা : ফরিদপুর	২০৭২.৭২	৭৯	১০৩৮	১৮৬০	১৭৫৬৪৭০	৪০.৯
উপজেলা : আলফাডাঙ্গা	১৩৬	৬	৯২	১২১	১০০৫৯৮	৪৩.০
চরভদ্রাসন	১৪১.৫৯	৪	২৪	৮৮	৭৬৩৬৬	৩৪.৩
নগরকান্দা	১৯৬.০৬	৯	১৪০	১৬৫	১৭৭১০	৩৬.৪
ফরিদপুর নদর	৪০৭.০২	১১	১৫৭	৩৩২	৪১৩৪৮৫	৪৯.৭
বোয়ালমারি	২৭২.৩৪	১১	১৭৩	২৫১	২৩৩৬৮৩	৩৬.৪
ভাঙ্গা	২১৬.৩৪	১২	১৩৬	২০৫	২৩২৩৮৬	৩৮.১
মধুখাণী	২৩০.২০	৯	১২৯	২৪১	১৮৭৭৭৫	৪৩.৩
সদরপুর	২৯০.২০	৯	৮৮	২৯৬	১৮৮৭৫৭	৩৬.৩
সালথা	১৮২	৮	৯৯	১৬১	১৪৫৭১০	৩১.১৬

ফরিদপুর জেলাবোর্ড : ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলাবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলাবোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন এইচ. বামুর। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন। জেলা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯ জন। ১৯২২-২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সদস্য সংখ্যা ২৪ জনে উন্নীত হয়। এর মধ্যে ১২ জন নির্বাচিত, ৮ জন মনোনীত ও ৪ জন পদাধিকার বলে। ১৯২৩-২৪ খ্রিষ্টাব্দে সদস্য সংখ্যা ৩০ জনে উন্নীত হয়। আইএম রায় ছিলেন সরকার মনোনীত জেলা বোর্ডের শেষ চেয়ারম্যান। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে খানবাহাদুর নাদের হোসেন নন অফিসিয়াল চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান একাধারে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ফরিদপুরে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট।

ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) এবং আলীমুদ্দিন আহমেদ (খান সাহেব) দীর্ঘদিন জেলাবোর্ডের যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।

পৌরসভা : ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের আইনগত অধ্যাদেশ অনুযায়ী ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটি, ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মাদারীপুর মিউনিপ্যালিটি, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজবাড়ি মিউনিসিপ্যালিটি এবং ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি টাউন কমিটিতে উন্নীত হয়।

বর্তমানে ফরিদপুরে ৪টি পৌরসভা রয়েছে। যথা : ফরিদপুর পৌরসভা, বোয়ালমারী পৌরসভা, ভাঙ্গা পৌরসভা ও নগরকান্দা পৌরসভা।

www.pathagar.com

ইউনিয়ন বোর্ড : ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের চৌকিদার এ্যাক্ট ১৮৭০ অনুযায়ী প্রথম স্থানীয় স্বনির্ভর সরকার (Local Self Government) গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করে। এর উন্নয়নে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে 'গ্রাম পুলিশ' পরিচালনার জন্য প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চায়েত গঠিত হয়। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার সর্বত্রই স্থানীয় সরকার গঠিত হয়। কিন্তু তাদের কাজের জন্য কোনো অর্থ আদায় করার ক্ষমতা ছিল না। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে ট্যাক্স আদায় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ইউনিয়ন কমিটির স্থলাভিষিক্ত হয় ইউনিয়ন বোর্ড। ১৯২৩–২৪ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুরে ৫৩টি ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। এর ৫টি ফরিদপুর সদরে, ২০টি গোয়ালন্দে, ১৮টি মাদারীপুরে এবং ১০টি গোপালগঞ্জে। ইউনিয়নগুলোর আয়োতন ছিল ৪৮১ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ৪,৭১,০০০ জন। বর্তমানে ফরিদপুর জেলায় ইউনিয়নের সংখ্যা ৭৯টি।

উপজেলা : ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে এরশাদ সরকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি থানাকে মান উন্নীত থানায় রূপান্তর করে। পরে মান উন্নীত থানা ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জুলাই থেকে সরকারের অধ্যাদেশ বলে উপজেলায় পরিণত হয়। ফরিদপুর জেলায় ৯টি উপজেলা রয়েছে। এগুলো হলো : ফরিদপুর সদর উপজেলা, ভাঙ্গা, বোয়ালমারী, সদরপুর, নগরকান্দা, আলফাডাঙ্গা, চরভদ্রাসন, মধুখালী ও সালথা (২০০৬)।

ইউনিয়ন সংখ্যা- ৭৯, মৌজা- ১১৬২, গ্রাম- ১৯৪৬।

ফরিদপুর সদর উপজেলা : গেরদা, কৈজুরী, কানাইপুর, মাচ্চর, কৃষ্ণনগর, ঈশান গোপালপুর, ডিক্রিরচর, নর্থ চ্যানেল, চর মাধবদিয়া, অম্বিকাপুর ও আলীয়াবাদ।

চরভদ্রাসন : চরভদ্রাসন, গাজিরটেক, চরহরিরামপুর ও চরঝাউকান্দা।

ভাঙ্গা : আজিমনগর, কালামৃধা, মানিকদহ, নাসিরাবাদ, নূরুল্যাগঞ্জ, চান্দ্রা, কাউলিবেড়া, তুজারপুর, হামিরদি, ঘারুয়া, আলগি ও চুমুরদি।

মধুখালী : জাহাপুর, রায়পুর, মধুখালী, কামারখালী, গাজনা, আড়পাড়া, ডুমাইন, মেগচামী ও বাগাট।

বোয়ালমারী : বোয়ালমারী, রূপাপাত, পরমেশ্বরদী, চতুল, গুনবাহা, শেখর, ময়না, ঘোষপুর, সাতৈর, চাঁদপুর ও দাদপুর।

আলফাডাঙ্গা : বুড়াইচ, গোপালপুর, আলফাডাঙ্গা, টগরবন্দ, বানা ও পাচুরিয়া।

সদরপুর : আকটের চর, চরবিষ্ণুপুর, সদরপুর, ঢেউখালী, কৃষ্ণপুর, চর মানাইর, ভাষানচর ও নারিকেল বাড়িয়া।

নগরকান্দা : যদুনন্দি, বল্লভদী, চর যশোরদী, পুড়াপাড়া, কোদালিয়া, শহীদনগর, ফুলসূতী, তালমা, ডাঙ্গী, লস্করদিয়া ও মাঝারদিয়া।

সালথা : সোনাপুর, আটঘর, রামকান্তপুর, রামনগর, ভাওয়াল ও গট্টি।

ফরিদপুর শহর প্রতিষ্ঠা তথা নগরায়ণ : ফরিদপুর শহরের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। মধ্যযুগে বাংলায় পর্তুগীজ বনিকদের আগমনের সাথে সাথে ফতেহাবাদ জমিদারি প্রথা চালু হয় এবং এ-শহর তখন ব্যবসা কেন্দ্র ও সেবা কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত

www.pathagar.com

হতে থাকে। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে ফরিদপুর শহরের উৎপত্তি হয় বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। ফরিদপুরে মোগল শাসনের সূত্রপাত ঘটে ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। চকবাজার তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই 'চকবাজার' শব্দটিও মোগলসূত্রে প্রাপ্ত। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে গোয়ালচামট, খাবাসপুর, অম্বিকাপুরে হিন্দু আশ্রম, মঠ, মন্দির গড়ে উঠতে থাকে। নিলটুল সড়ক তখনকার একমাত্র প্রধান সড়ক। এ সড়কের ধার দিয়ে গড়ে উঠা নতুন নতুন স্থাপনা তৎকালীন উন্নয়নের নির্দেশক। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুরে ব্রিটিশ শাসনের ছোঁয়া লাগে। ১৮০০ শতাব্দির শেষের দিকে এবং ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে শহরে গড়ে উঠতে থাকে ইট-পাথরের ভবনাদি, পাশ্চাত্য নকশির বাংলোসমূহ। এ সময়ে পদ্মানদী শহরের কাছে তার গতি পরিবর্তন করে। পললায়নের ফলে নতুন ভূমি উত্থিত হয় এবং বিশাল নতুন চর জেগে উঠায় নতুন মাত্রায় শহরের পূর্ব অংশ বর্ধিত হয়। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের আইনগত অধ্যাদেশ অনুযায়ী পৌরসভা স্থাপিত হয় (১৮৬৯)। আসাম-বেঙ্গল রেল লাইন ১৮৯৫ এর মধ্যে গোয়ালন্দ-কোলকাতা রেল লাইন এবং পরবর্তীতে গোয়ালন্দ-ফরিদপুর রেল লাইনের সম্প্রসারণ তখনকার বিশাল উন্নয়ন প্রমাণ করে। এটি বর্ধিত ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ হতে ফরিদপুর শহরের অম্বিকাপুর পর্যন্ত। ইতিমধ্যে ফরিদপুর জেলাস্কুল (১৮৪০), ফরিদপুর জজকোর্ট (১৮৮৯), হিতৈষী উচ্চবিদ্যালয় (১৮৮৯), ইশান ইনস্টিটিউশান (১৮৯১)সহ ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে শহরের পূর্বাংশে ফরিদপুর রেল স্টেশন, প্রশাসনিক ভবনের পাশাপাশি বেশকিছু ভবন গড়ে ওঠে। সংযুক্ত সড়ককে স্টেশন রোড নামকরণ করা হয়। ১৯৪০–৪১ সময় কালের মধ্যে ফরিদপুর মিশন হাউজ সংলগ্ন এলাকায় ২৫ একর জমিতে স্থাপিত হয় পুলিশ লাইন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় কুমার নদের পূর্বতীরে স্থাপিত হয় আযম মার্কেট (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল আযম খানের নামে) এছাড়া অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন রাজেন্দ্র কলেজ (১৯১৮) সহ ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র ধীরগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বলা বাহুল্য, পাকিস্তান আমলে এ শহরের পারস্পরিক পরিবর্তন তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে হয়নি।

স্বাধীনতা পরবর্তী (১৯৭১) সময়ে ফরিদপুর শহরের নগর প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপর্যাপ্ত স্থানীয় প্রশাসনিক ক্ষমতাকে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শহর অবকাঠামো তৈরির কাজ-শুরু হয় মূলত শহরের আবাসন স্থল, কলেজ, হাসপাতাল, নতুন সড়ক নির্মাণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এবং নতুনভাবে কর্মসূচির প্রচলন করা হয়। ফরিদপুর শহরের নগর উন্নয়ন প্রকৃতি ও প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে ফরিদপুর পৌরসভার কার্যাবলি ও ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৮৯–১৯৪৭ = ৭৮ বছর ব্রিটিশ সময়কাল, ১৯৪৭–১৯৭১ = ২৪ বছর পাকিস্তান সময়কাল, ১৯৭১–২০০৭ = ৩৬ বছর বাংলাদেশ সময়কাল হিসেবে ভাগ করলে দেখা যায়, ফরিদপুর শহরের নগর উন্নয়ন হয়েছে কখনও শম্বুক গতিতে, কখনও কিছুটা ত্বরিত গতিতে, আবার কখনও নানা কারণে এর উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। আশির দশকে এ শহর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কুমার নদের উপর ব্রিজ তৈরি হবার দরুণ শহরের পশ্চিমাংশে অফিস ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্প কারখানা স্থাপিত হয়; ফলে শহর ঘিরে আবাসিক এলাকা সমূহের ব্যাপ্তি ঘটে।

www.pathagar.com

যদিও ষোড়শ শতাব্দির একটি মাঝারি আকৃতির এই ফরিদপুর শহর শুরু থেকেই যার উন্নয়ন অপরিকল্পিত, অনুন্নত। শহর বেড়ে চলেছে তার নিজস্ব গতিতে ব্যক্তির চাহিদা ও প্রয়োজনের তাগিদে।

শিল্পায়ন ও নগরায়ণ একই সূত্রে গাঁথা হলেও ফরিদপুর শহর শিল্পে অনগ্রসর। যে কারণে নগরায়নে গতিশীলতা অনেকটা মন্থর। শহরের ভেতরে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের পাশাপাশি মিশ্র আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। এই শহরে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মেডিকেল কলেজ, কৃষি কলেজ, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে স্কুল কলেজ, কোচিং সেন্টার, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এছাড়া আধুনিক বিপনিকেন্দ্র, বহুতল বিশিষ্ট হোটেল, বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়গনস্টিক সেন্টার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরে পরিবহন ও যোগাযোগ পর্যায়ে উন্নতি সাধিত হয়েছে। আন্তঃজেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সকল জেলাসমূহসহ উত্তরবঙ্গের সকল জেলা শহর ও রাজধানী ঢাকার সঙ্গে উন্নত সড়ক ও পরিবহন যোগাযোগ বিদ্যমান।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

জেলার আয়তন : ২০৭২.৭২ বর্গকিলোমিটার।

সীমানা : উত্তরে রাজবাড়ি জেলা, পূর্বে পদ্মা নদী যা মানিকগঞ্জ জেলা থেকে ফরিদপুরকে পৃথক করেছে। দক্ষিণ-পূর্বে শরীয়তপুর জেলা। দক্ষিণে মাদারীপুর জেলা। দক্ষিণ-পশ্চিমে গোপালগঞ্জ জেলা। পশ্চিমে মধুমতি-গড়াই নদী যা মাগুরা ও নড়াইল জেলা থেকে ফরিদপুরকে পৃথক করেছে।

অবস্থান : ফরিদপুর ২২.৪৫ ও ২৩.৫৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.১৫ থেকে ৯০.৪০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৬ ফুট।

লোকসংখ্যা : ১৭,৫৬,৪৭০; পুরুষ-৮,৯৩,৩৫৮; মহিলা-৮,৬৩,১১২ (২০০১)

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর সদর থানার জন্ম। উপজেলায় উন্নীত হয় ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। সদর উপজেলা কার্যালয়টি ফরিদপুর শহরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। যার পাশ ঘেঁষে চলে গেছে ঢাকা-বরিশাল, ঢাকা-খুলনা, ঢাকা-বেনাপোল মহাসড়ক। সদর উপজেলা পরিষদের ২ কিলোমিটার পূর্বে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের অবস্থান। ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে বিসিক শিল্পনগরী। দক্ষিণাংশে বাইপাস সড়ক।

ফরিদপুর সদর উপজেলায় ইউনিয়ন সংখ্যা ১১টি, যথা- গেরদা, কৈজুরী কানাইপুর, মাচ্চর, কৃষ্ণনগর, ঈশান-গোপালপুর, ডিক্রিরচর, নর্থ চ্যানেল, অম্বিকাপুর ও আলিয়াবাদ। মৌজা- ২০২, গ্রাম- ৩৪২, পৌরসভা- ১, পৌরসভার ওয়ার্ড- ৯, পরিবার সংখ্যা ৭৯৮৮০টি।

ঐতিহাসিক স্থাপত্য, প্রত্নদর্শন ও ঐতিহ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-গেরদাহা ঐতিহাসিক মসজিদ, শের ফরিদ (র.) এর দরগা, চকবাজারস্থ শিবমন্দির, কানাইপুর

www.pathagar.com

শিকদারবাড়ি, রথখোলা চৌধুরীবাড়ি, জগবন্ধু সুন্দরের আশ্রম, অম্বিকাহল (অধুনালুপ্ত), কোর্ট মসজিদ, চৌরঙ্গীভবন (অধুনালুপ্ত), জেলা জর্জকোট, হাফেজ বিল্ডিং, আলিমুজ্জামান হল, রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর জেলা স্কুল, ঈশান ইন্সটিটিউশন, কবি জসীম উদ্‌দীনের বাড়ি, গোয়ালচামট শাহ শাহের বাড়ি, বিসমিল্লাহ শাহের দরগা, গৌর গোপাল আঙ্গিনা, ফরিদপুর খ্রিস্টান মিশন, মহিম স্মৃতিমঠ, অম্বিকাচরণ মজুমদারের বাড়ি, খান বাহাদুর আবদুল গণি মিয়ার বাড়ি, ফরিদপুর টাউন থিয়েটার, সাজেদা কবির কলেজিয়েট স্কুল, ঝিলটুলী ম্যানেজার অফিস, ময়েজ মনজিল ও জেলা প্রশাসকের বাসভবন।

স্থানীয় ইতিহাস : গাঙ্গেয় 'বদ্বীপ' অঞ্চলের একটি জেলা ফরিদপুর। ফরিদপুর জেলার ভূমিগঠন এবং জনবসতি সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ববিদ জেমস ফরগান বলেছেন, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে গঙ্গানদীর অববাহিকা সেঁতসেঁতে এবং জঙ্গলাকীর্ণ ও মানুষের বাসের অনুপযোগী ছিল। ফরিদপুর হতে ভাগীরথী পর্যন্ত এ 'বদ্বীপ' অঞ্চল ঐতিহাসিক কালে কখনও সমৃদ্ধ জনপথ, কখনও গভীর অরণ্য, কখনও নদীগর্ভে বিলীন, আবার কখনও নতুন নতুন ভূমি সৃষ্টি হয়েছে। ভূমি জেগে উঠার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার গাছ, ঝোঁপ-ঝাড়, বাঁশ-বেত ইত্যাদিতে প্রকৃতিগতভাবে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। এই ঝোঁপ-ঝাড়ের নমুনা ১৯৪৭ সনের পরেও ফরিদপুরের অনেক স্থানে পরিলক্ষিত হয়েছে। গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর এলাকায় প্রাচীন লোকবসতি থাকলেও নতুন জেগে ওঠা চরে বসতি স্থাপন করতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়েছে। ঘন জঙ্গলের পাশে বিভিন্ন এলাকায় প্রশস্ত বিল ও জলাভূমির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ১৫৮৬ সনে Ralph Fitch ফরিদপুর অঞ্চল ভ্রমণ করে লিখেছেন, অনেক জলাভূমি ও নদী বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। তাঁর ঘোড়াচালক তা অতিক্রম করতে পারেনি।

ফরিদপুরের লোকবসতি কোনো একক এলাকা বা কোনো বিশেষ গোষ্ঠি থেকে সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়েনি। নতুন চর জেগে উঠার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন এসে এখানে বসতিস্থাপন করে। ১৮৯১ সনের আদমশুমারি অনুযায়ী এ জেলায় লোকসংখ্যা ছিল ৯৬,৩৩৩ জন। তন্মধ্যে ৮৬,৪৬৯ জন ছিল বিভিন্ন জেলা থেকে আগত।

ফরিদপুর জেলার ভূমিগঠন, জনবসতি প্রাকৃতিক কারণে পরিবর্তিত হয়েছে। তাছাড়া রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক সীমারেখা অবশ্যম্ভাবীভাবে বারবার বদলে গেছে। চন্দ্রদ্বীপ, ধলেশ্বরী পরগণা, ভূষণা পরগণা, ফতেহাবাদ, মাহমুদাবাদ সরকার, ঢাকা-জালালপুর ক্রমধারায় যশোর জেলার কিয়দংশ নিয়ে ফরিদপুর জেলা গঠিত হয়েছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে গ্রিক বিবরণীতে দেখা যায়, গঙ্গার মোহনায় গঙ্গারিডি নামে একটি রাজ্য ছিল। যার রাজধানী ছিল কুমারতালুক বা কোটালীপাড়া। কোটালীপাড়া চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের একটি প্রধান জনপদ ছিল। বাকুড়ার পুষ্করণের রাজা সিংহ বর্মারপুত্র চন্দ্রবর্মন কোটালীপাড়া জয় করেন। তিনি এখানে চন্দ্রবর্মন কোট নামে একটি দুর্গ

www.pathagar.com

নির্মাণ করেন। এই কোটালীপাড়া ছিল প্রাচীন ও উন্নত জনপদ। চতুর্থ শতকের শেষভাগে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এই জনপদটি বিলীন হয়ে যায়। বিজয় সেনের (১০৯৭-১১৬৯) আমলে ফরিদপুর সেন রাজত্বের আওতায় ছিল। রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ, বাগড়ী ও নাব্য নামে তাদের পাঁচটি প্রদেশে ছিল। পূর্ববঙ্গ বিক্রমপুর ও নাব্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। বিক্রমপুর ভাগ কোটালীপাড়া ও ইদিলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

লক্ষ্মনৌতির ২৩ তম শাসক সুলতান মুগীসউদ্দীন তুগরীল (১২৬৮-১২৮১) ফরিদপুরের কিছু অংশে কর্তৃত্ব স্থাপন করলেও সুলতান রুকনউদ্দীন বরবকশাহ (১৪৫৯-১৪৬৫) সর্ব প্রথম কোটালীপাড়াসহ চন্দ্রদ্বীপ দখল করেন।

সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সময় ফতেহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ঢাকা ও বাকেরগঞ্জের অংশ। ফতেহাবাদের পশ্চিমে যশোর, কুষ্টিয়া ও মাহমুদাবাদ সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্রাট আকবরের জায়গিরদার মুরাদ খানের সময় ফতেয়াবাদ এবং সরকার বাকলা সম্রাট আকবরের রাজ্যভুক্ত হয়।

১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দের পর বাংলায় বারো ভুঁইয়াদের সময় ফতেহাবাদের সীমা নির্ধারণের কোনো নিয়ম পাওয়া যায় না। ফতেহাবাদের জমিদার মজলিশে কুতুব এবং ভূষণার রাজা সীতারামের পর এ-দুটি রাজ্যের গুরুত্ব কমে যেতে থাকে।

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলায় দেওয়ানি লাভের চুক্তি অনুযায়ী ফরিদপুরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী জমিদারের আওতাভুক্ত ও ঢাকার নায়েবাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। এর দ্বিতীয় অংশ ঢাকা-জালালপুর, তথা ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ। ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা-জালালপুরের সদর দপ্তর ফরিদপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে এ জেলাকে পৃথক জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়।

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ মহকুমাকে ফরিদপুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঢাকার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ জেলার মর্যাদায় উন্নীত হয়। আয়তন ছিল ১৩১২ বর্গমাইল।

১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার আলফাডাঙ্গা থানা ও মাগুরা মহকুমার মোহাম্মদপুর থানার বানা, পাচুরিয়া, গুনবাহী এবং ময়না ইউনিয়ন ফরিদপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তখন ফরিদপুর সদর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ এই ৪টি মহকুমা ছিল।

পরবর্তীতে মাদারীপুরের পালং, জাজিরা, ডামুড্যা নিয়ে ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজি শরিয়তুল্লাহর নামানুসারে শরিয়তপুর মহকুমা গঠিত হয়।

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ৫টি মহকুমা বিলুপ্ত করে ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ি ও শরিয়তপুর নামে ৫টি পৃথক জেলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফরিদপুর জেলার জন্মকথা নিয়ে সতন্ত্র মতামত রয়েছে।

www.pathagar.com

ঘ. নদ-নদী ও খাল-বিল

নদ-নদী, জলাশয়, হাওর-বাওড়, বিল-ঝিল : সমগ্র বাংলাদেশে প্রধানত দুটি উৎস থেকে পানির প্রবাহ এসে থাকে। একটি ভারতের মহানন্দা, তিস্তা, যমুনা, অন্যটি গঙ্গা-পদ্মা নামে প্রবাহিত। এই দুটি প্রবাহই ফরিদপুরের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। ফরিদপুরের কোথাও কোথাও সঠিকভাবে পানি নিঃসরণ না হওয়ায় কোথাও বিল ও হাওড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

ফরিদপুরের উত্তর এবং পূর্বদিকে গঙ্গা নদীর প্রধান শাখা পদ্মা নদী প্রবাহিত। পূর্বাংশে থেকে দক্ষিণ দিকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে গঙ্গা নদীর শাখা নয়া ভাঙ্গনী, আড়িয়ালখাঁ, পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে গড়াই ও এর অগ্রবর্তী নাম চন্দনা, মধুমতি ও বারাসিয়া; এছাড়া মেঘনা-যমুনা প্রভৃতি নদীর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ফরিদপুরে পতিত হয়েছে। ফরিদপুরের অন্যান্য নদ-নদী হলো : কুমার, ছোটকুমার বা মরা কুমার, ভুবনেশ্বর, লোয়ার কুমার, মরা পদ্মা, বিল পদ্মা, নয়া ভাঙ্গা, শৈলদহ বা ঘঘরনদী, বিলরুট, মান্দারতলা খাল প্রভৃতি।

বিল-জলাভূমি : ঢোলসমুদ্র, বিল রামকেলী, ঘোড়াদারে বিল, চাপাদহের বিল, বিল মাহমুদপুরের বিল, শুকুনের বিল। ফরিদপুর শহরের টেপখোলায় পদ্মানদীতে বাঁধ দিয়ে একটি কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : রেলপথ ২৬ কি.মি. (বর্তমানে অবলুপ্ত), পাকারাস্তা ২৭২ কি.মি., আধাপাকা- ৬১২ কি.মি., কাচারাস্তা- ২১০৮ কি.মি., নদীপথ- ৫৬০ কি.মি., বিমানপথ নেই।

সনাতন লোকযান : একমাল্লাই নৌকা, দুইমাল্লাই নৌকা, গয়না নৌকা, বজরা নৌকা, ঘাসি নৌকা, ভেলা, তালের ডুঙ্গা, এক বেহারা, ঢুলি পালকি, গরুরগাড়ি, কাহার, ঘোড়ার গাড়ি, টমটম প্রভৃতি।

ঙ. হাটবাজার

হাটবাজার : হাটবাজারের সংখ্যা ১৯৮টি। উল্লেখযোগ্য আড়তদারি হাট-বাজার : কানাইপুর, তালমার হাট, কৃষ্ণপুর হাট, পিয়াজখালী, কামারখালী, বাগাট, হাজীগঞ্জের হাট, চকিঘাটা, টেপাখোলার হাট, বাখুণ্ডা হাট, সালথার হাট, নগরকান্দার হাট, ভাঙ্গারহাট, ময়েনদার হাট, তাম্বুলখানার হাট, গজারিয়ার হাট, চরমাধবদিয়া হাট, গেন্দুমোল্লার হাট। এই সকল হাট-বাজার স্থানীয় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতোপ্রতভাবে জড়িত। কৃষিজীবী সমাজে বিনিময় প্রথার মাধ্যমেই হাট-বাজারের জন্ম। এতদাঞ্চলে যেসকল কৃষিজাত পণ্য উৎপাদিত হয় তা বিভিন্ন হাট-বাজারে বেচা-বিক্রি হয়ে থাকে। বিশেষ করে উৎপাদিত রবিশস্য, ধান-পাট এবং গৃহপালিত পশু, কৃষি সরমঞ্জামাদি, গৃহসামগ্রী এবং দৈনন্দিত ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এ-সকল হাটবাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। বহুকাল যাবৎ টেপাখোলার হাট গরু বা অন্যান্য পশু বিক্রির হাট হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। পাট বিক্রির হাট হিসেবে হাজীগঞ্জের হাট, কামারখালীর

www.pathagar.com

হাট, পুকুরিয়ার হাট, তালমার হাট, কানাইপুরের হাট পরিচিত। রবিশস্যের হাট বলতে কানাইপুরের হাট, বাখুণ্ডার হাট, তালমার হাট, সালথা ও নগরকান্দার হাট সর্বজন পরিচিত। পিয়াজ বিক্রির কথা বলতেই পিয়াজখালীর হাট, সালথার হাট, নগরকান্দার হাট, তালমার হাটের নাম আসে। শাক-সবজি, বেগুন এবং অন্যান্য তরিতরকারির হাট হিসেবে কৃষ্ণপুর, গজারিয়া, কানাইপুর, বাখুণ্ডা এবং ফরিদপুরের হাটকে বুঝায়। বলা বাহুল্য, এতদঞ্চলের অর্থনীতি মূলত এ সকল হাট-বাজারে বেচা-কেনার মাধ্যমে সচল রয়েছে। মানুষের সামাজিক এবং অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে হাট-বাজারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি : বিবাহ, জন্মদিন, আকিকা, অন্নপ্রাশন, খাতনা, চল্লিশা, ভাদ্রমঙ্গলচণ্ডী, জামাই ষষ্ঠী, ঈদ-উল আযহা, ঈদ-উল ফিতর, বড়দিন, মহররম, দূর্গোৎসব, পৌষমেলা, দোলপূর্ণিমার অনুষ্ঠানাদি, রথযাত্রা, সরস্বতী পূজা, কালিপূজা।

সমাজ ও সংস্কৃতি : নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি, জাতি বিভাজন ও অন্যান্য বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলার অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অভিন্ন। বিভিন্ন সময়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেও এ জেলায় মানুষের আগমন ও বসতি নির্মাণের ঘটনা ঘটেছে। এ জেলার অধিবাসী বিভিন্ন মিশ্রিজাত জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত।

অধিবাসীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের বেশির ভাগই বিস্তৃত শিরস্ক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘ শিরস্কদের সংখ্যা তাদের মধ্যে কম। মঙ্গোলীয়, অস্ট্রিক, আদি অস্ট্রেলীয় বা ভেড্ডিড, আর্য, সেমিটিক, অনার্য প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন মাত্রার সংমিশ্রণ এ জেলার অধিবাসীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র তীরবর্তী 'বাঙ' থেকে চণ্ডাল ও নিষাদ বা পুণ্ড্রনামে এক অনার্যজাতি আর্যাধিকারের পূর্বে বঙ্গের চন্দ্রদ্বীপের অধিবাসী ছিল। এদের অধঃস্তন পুরুষ হচ্ছে বর্তমান কালের নমশূদ্র সমাজ। মি. ফকস পুণ্ড্র-ক্ষত্রিয়ও নমশূদ্রদিগকে আদিম জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। ভবদেব ভট্ট এই অন্ত্যজ শ্রেণিকে রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ ও ভিন্ন এই সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন। এই সকল প্রাচীন জাতি এখনও ফরিদপুরে বসবাস করছে। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জে এদের সংখ্যার আধিক্য দেখা যায়। এরা আদিম অধিবাসী চণ্ডাল জাতীয় হিন্দু সমাজ থেকেই উদ্ভূত। বঙ্গদেশের আদিম সভ্যতা এদেরই দানের ফল।

'ফরিদপুরের ইতিহাস' রচয়িতা আনন্দনাথ রায় (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) জাতিভেদ বর্ণাশ্রম প্রথার ভিত্তিতে ফরিদপুরের হিন্দু সম্প্রদায়কে ৭২ প্রকার শ্রেণিতে ভাগ করেছেন : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ, ছত্রি, গন্ধবণিক, কামার, কুমার, আগরওয়ালা, আগুরি, তাম্বুলি, সদগোপ, শূদ্র, কুরমি, তিলি, মালী, কাঁশারি, শাঁখারি, নাপিত, বৈষ্ণব, বারই, কৈবর্ত, গাররি, বাদক, গোপ বা গয়লা, সুবর্ণ বণিক, সেকরা, সূত্রধর, সাহা, পাইটাটি, কলু, তাঁতি, জুগি, চুনারি, পাইটাল, জেল, কাড়াল, কারশি, মাল, মাঝি, পোদ, টিয়র, পূবর, বাইয়তি, বেহারা, ধনু, বাগদি, পাটনি, কোয়রি, তাতা, ধোপা, কাচুরি, নমশূদ্র, কাপালি, বাউতি, কাহার, মুচি, পালি, বিন্দু, চেল, ডোম, দোসাদ, বারাঙ্গি, আদারিয়ার, রাজবংশি, মাল, মালো, হাড়ি, কাওলা, ভূঁইমালি, মিহাটার, বুনা ও নর বা নট্ট।

মুসলমানদের মধ্যে যে-সকল বংশ ও পদাবলী পরিচয় পাওয়া যায় তা হল : মিয়া, মোল্লা, মুন্সি, শেখ, পোদ্দার, জোদ্দার, খাঁ, খান, হাওলাদার, পাঠাদার, কাজি, জোলা,

www.pathagar.com

কুলু, কারিকর, মণ্ডল, খলিফা, মাঝি, বয়াতি, মির, মৌলভী, ফকির, বিশ্বাস, সৈয়দ, চৌধুরি, খন্দকার, গাজি, লস্কর, মল্লিক, সরকার, খালাশি, মজুমদার, দেওয়ান, মির্জা, তালুকদার, আকন, ভূঁইয়া, সিরাজি, চাকলাদার, শিকদার, মৃধা, সরদার, পরামানিক, দারিয়া, ঠাকুর, আকন্দ, বেপারি, চোকদার, খয়রাতি, জমাদার, মোড়ল, মাতুব্বর, কোতয়াল, মালত, পাল, ঢালি, বাগদি, কাহারি, মিস্ত্রি, ফরাজি, কাদিয়া প্রভৃতি।

এ-জেলার জেলাশহরের আলীপুরের বান্ধব পল্লীতে 'ধাঙর' এবং টেপাখোলার লেকপাড়ে 'বিন্দু' নামের দু'শ্রেণির হরিজন সম্প্রদায় বসবাস করে। ধাঙ্গর (মেথর) শ্রেণি তিন ধরনের অনুজাতিগত সম্প্রদায়। এরা হলো ডোম, হাড়ি ও হেলা। প্রায় দু'শত বছর পূর্বে ব্রিটিশ শাসনামলে এদেরকে ভারতের এলাহাবাদ, ভাগলপুর কাঠিয়া থেকে আনা হয়েছিল। বিন্দুদের আদিবাস বিহার। নগর পত্তনের সাথে এদের আগমন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

এ-জেলায় কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী ও চাকুরে–এই চার শ্রেণির লোক ছাড়াও হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে একশ্রেণির মৌলভী, পুরোহিত ও পাদরি ধর্মচর্চা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে একশ্রেণির প্রধান পেশা কৃষি। কৃষিজীবীরা নিজস্ব জমিতে চাষাবাদ ছাড়াও কেউ কেউ অন্যের জমিতে বর্গা চাষাবাদ করে। তিলি ও সাহাগণ এ জেলার প্রধান ব্যবসায়ী। পূর্বে 'নবশাখগণই' নানারূপ ব্যবসা করত। কাঁসারি, সুবর্ণ বণিক, গন্ধবণিক অনেকে ব্যবসায় বড় হয়েছে। বাস্তবিক : 'বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী'। মুসলমানগণ হালে ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করছে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণের মধ্যে অনেকেই নিঃস্ব; তাদের অনেকে ব্যবসা ও চাকুরি করে জীবিকা চালাচ্ছে। পূর্বে মুসলমানও হিন্দুদের মধ্যে একশ্রেণির নৌকার মাঝিগিরি করত। মালো ও কৈবর্তগণ এ কাজে বিশেষ পটু ছিল। কিন্তু নৌপথের ব্যবহার কমে যাওয়ায় এ পেশা অনেকেই বন্ধ করে দিয়েছে। বাদিয়া সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট কোনো বাড়িঘর না-থাকায় যাযাবরের ন্যায় ছোট-ছোট নৌকায় বসবাস করে। এদের জীবিকার প্রধান উপায় মনোহারি দ্রব্যাদি বিক্রি এবং তন্ত্র-মন্ত্র, টোটকা চিকিৎসা। নাপিত ও চামার অন্ত্যজ শ্রেণির লোক; এরা ক্ষৌরকর্ম ও জুতা সেলাই করে। অন্যান্য কাজের মধ্যে গায়ক, বাদক, গোয়ালা, কবিরাজি, ফকিরি, গাড়োয়ান, রাখাল ও ঝি-চাকরের কাজ উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম ও সম্প্রদায় : এই জেলায় মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টান এই তিন শ্রেণির বসবাস। পূর্বে ব্রাহ্ম, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কিছু লোক বাস করতো। কেউ কেউ বলেন, ফরিদপুর অঞ্চল তথা বঙ্গে আর্যদের আগমনের পূর্বে একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রচলন ছিল। আর্যগণ ছিল অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, পরশ প্রভৃতি পূজারি। কাজেই অনার্যদের সঙ্গের এই পৌত্তলিকদের বিরোধ স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছে। সাধারণত হোম, যাগযজ্ঞ ও বলিদানের মাধ্যমে তাদের (আর্যদের) এসব পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতো। আর্যদের পূজা-অর্চনার নেতৃত্বকারীরা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত ছিল। হিন্দুধর্মের বর্ণবৈষম্যবাদ আর্যদের ব্রাহ্মণ্যবাদেরই পরিণতি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বিভাজন তারাই করেন। জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে) বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সত্যের সন্ধান দেন। গৌতমবুদ্ধের (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৭ অব্দে) প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের

www.pathagar.com

আত্মশুদ্ধি, আত্মনির্মাণের কাছে ব্রাহ্মণ্যবাদের সংঘাত চরমে উঠে এবং সমগ্র বঙ্গদেশসহ ফরিদপুরে হিন্দুদের জাগরণ ঘটে। বাংলায় বৈদিক রীতিতে পূজার্চনার জন্য সেন রাজাগণ বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বাংলায় কৌলীন্য প্রথার পুনর্জন্ম হয়। কথিত আছে, ভারতের বারানসি থেকে ৫ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ কোটালীপাড়ায় আনয়ন করা হয়েছিল।

ইসলামের প্রারম্ভিককাল থেকেই বাংলায় ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঘটে। ৮ম ও ৯ম শতক কিংবা এর পূর্বে ফরিদপুরে মুসলমানগণ আগমন করেন। কোটালীপাড়া বা ফরিদপুরের ভূমিগঠন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর স্থলভাগ সুদূর সন্দ্বীপ বা চট্টগ্রামের খুব নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবত এই সময়ে আরব বণিক এবং আউলিয়া দরবেশদের আগমন হয়। ব্যবসাসূত্রে অথবা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে এসে এদেশীদের সঙ্গে সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এককালে ফরিদপুরের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (শরিয়তপুর) ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাবা আদম শহীদ (মৃত্যু- ১১৭৯ খ্রি.) বিক্রমপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে বাবা আদমের অনুসারীগণ পরবর্তী সময়ে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ক্রমে ইসলামের দাওয়াত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার (৫৩১–৬২৮ হিজরি) মধ্য এশিয়ার নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম প্রচারে ব্রত হন। কেউ কেউ মনে করেন তিনি ফরিদপুরে আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন। 'ফরিদপুর' নামকরণের পেছনে শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার এবং শেখ ফরিদউদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর (শেখ ফরিদ) নামক দু'জন কামেল পিরের নাম পাওয়া যায় তবে একজন কামেল পির ফরিদপুরে আগমন করেছিলেন কিনা– এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে শেখ ফরিদের নামে ফরিদপুর শহরে একটি দরগা রয়েছে। শাহআলী বাগদাদি ফরিদপুরের উচ্চমার্গের সুফি ও আধ্যাত্মিক বুজুর্গ। তিনি সুদূর বাগদাদ থেকে দশম হিজরিতে ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে কসবা গেরদায় আগমন করেন। পরে তিনি ঢাকার মিরপুর এসে স্থায়ীভাবে আস্তানা গাড়েন। তার পুত্র সৈয়দ শাহ ওসমান, সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ হানিফ ও সৈয়দ শাহ হামযা কামেল ও সুফি সাধক হিসেবে এ জেলায় ইসলাম প্রচার করেন। শাহ হুসাইন তেগা বুরহান, শাহ আবদুর রহমান গঙ্গেয়াজ, শাহ বদিউদ্দিন, শাহ আব্দুল ওহাব, শাহ-মির, শাহ আবদুর রহমান দানিশমন্দ এবং ফতেহাবাদ পরগণার সাতৈর অঞ্চলের ১২ জন আউলিয়া ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ফরিদপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। বর্তমানে ফরিদপুর জেলায় অধিকাংশ হানাফি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত সুন্নি মুসলমান। অল্পসংখ্যক সিয়া মতবাদের লোক এ-জেলায় বসবাস করেন। এ জেলার নিম্নশ্রেণির হিন্দু বিশেষ নমশূদ্র সম্প্রদায় হতে দেশীয় খ্রিষ্টানদের উৎপত্তি। দরিদ্রতার কারণে এরা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

ফরিদপুর জেলার অধিবাসী অসাম্প্রদায়িক ধর্মীয় চেতনায় বিশ্বাসী, সহনশীল ও উদার। যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায় একই পাড়ায় সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করে আসছে।

www.pathagar.com

চ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ফরিদপুর জেলার প্রাচীন শিক্ষা

বাংলার প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা যা ছিল ফরিদপুর অঞ্চল তার ব্যতিক্রম ছিল না। মধ্যযুগের বাংলায় যখন সংস্কৃত শিক্ষা ছিল অভিজাত্যের ধারক সে সময় এ শিক্ষা প্রদানের উচ্চতর যে ৬৫টি প্রতিষ্ঠান সারা বাংলা জুড়ে পরিচিত ছিল তার মধ্যে ১২টি ছিল ফরিদপুর অঞ্চলে। এই ১২টির মধ্যে কোটালিপাড়া, মাজপাড়া, উজিরপুর, শ্রীনগর, কানুরগাঁ, ভোজেশ্বর, ধানুকা, ছয়গা, দেভোগ, মুলঘর, ব্যাসপুর ও রামদিয়ার সঙ্গে কোড়কদির নামও পাওয়া যায়।

ফরিদপুরের সংস্কৃত টোল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কত ছিল তার সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে ষাটের দশকে ছিল ৪টি। মোট ছাত্র-ছাত্রীর ছিল ৩২২ জন। এর মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ৪৪। বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ফরিদপুরে প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নুরানি ও ফোরকানিয়া। পরবর্তী স্তরে আলিয়া মাদ্রাসা। ফরিদপুরে বর্তমানে দাখিল মাদ্রাসা ৫১টি, আলিয়া মাদ্রাসা ১৩টি, ফাজিল মাদ্রাসা ১০টি ও ৬১টি কামিল মাদ্রাসা রয়েছে।

ফরিদপুর জেলার শিক্ষাব্যবস্থায় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা অন্যতম। এই মাদ্রাসার প্রাণ কেন্দ্র হলো 'দারুল উলুম দিওবন্দ'। মুলত ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগ্রত রাখা, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করা, মুসলিম শক্তিকে সুসংহত করা, ধর্মীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং বিদাত সমূহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফদিরপুর জেলায় কয়েকটি মাদ্রাসার পরিচয়

জামিয়া আরাবিয়া শামসুল উলুম মাদ্রাসা : দারুল উলুম দিওবন্দের অনুকরণে বাংলাদেশে যে কয়টি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে তার মধ্যে জামিয়া আরাবিয়া শামসুল উলুম মাদ্রাসা অন্যতম। ১৯৬৯ সালে মুফতি আব্দুল কাদিরের নিরলস প্রচেষ্টায় ফরিদপুর শহরের পশ্চিম খাবাসপুরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে এটি দাওয়ারে হাদিস (টাইটেল) শ্রেণিতে উন্নীত হয়। এখানে লিল্লাহ বোডিং ও আবাসিক ছাত্রাবাস রয়েছে।

বিশ্বজাকের মনজিল : ১৯৭৭ সালে ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানাধীন বিশ্বজাকের মনজিলের গদিনসীন পির হাসমতুল্লাহ ফরিদপুরী বিশ্বজাকের মনজিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

তাছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। ফরিদপুরের উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা হলো : বাকীগঞ্জ ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, চন্দ্রপাড়া সুলতানিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বিছমিল্লাহ শাহ দরগা ও সিনিয়ার মাদ্রাসা, ফরিদপুর মুসলিম মিশন দাখিল মাদ্রাসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

প্রাথমিক শিক্ষা : ১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে নতুন ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করে এবং বিদ্যালয়গুলিতে আর্থিক অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই নীতি অনুসারেই এ দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও দেশীয় পদ্ধতিতে পাঠশালা, টোল, মাদ্রাসা, মক্তব ও সংঘারাম ভিত্তিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য ইন্টার কমিশন গঠন করা হয়। ১৯১৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন এবং ১৯৩০ সালে বঙ্গদেশ পল্লী প্রাথমিক শিক্ষা আইন চালু করা হলেও এর তেমন সুফল পাওয়া যায়নি। ১৯৬০-৬১ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে এই শিক্ষাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।

ফরিদপুর জেলার উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়

গোয়ালচামট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

১৯১৮ সালে নিন্দু ঠাকুর, হরিন্দ্র মিত্র এবং জয়নাল আবেদীন এর প্রচেষ্টায় বর্তমান হাজি শরীয়তুল্লাহ বাজারের পশ্চিম পাশে পাঠশালা নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে স্কুলটি মডেল স্কুলে পরিণত হয়। স্কুলটি শুরুর প্রাক্কালে ফরিদপুর পৌরসভার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। ১৯৭৩ সালে স্কুলটি জাতীয়করণ করা হয় এবং গোয়ালচামট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে নামকরণ করে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

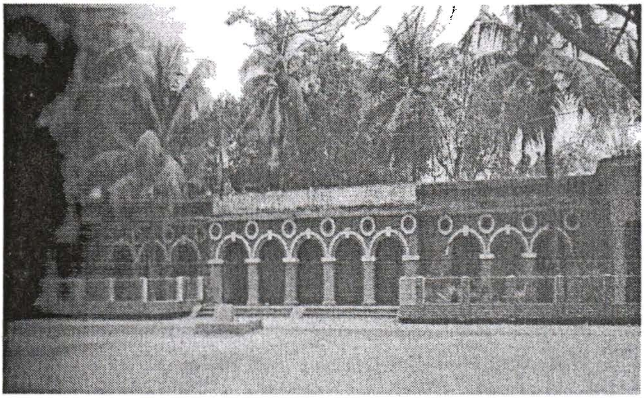

ফরিদপুর জিলা স্কুল

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করার জন্য ১৮১৩ সালের পর থেকে শাসকগোষ্ঠী প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন আনার প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ এই পরিবর্তনের ঘোষণা দেন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক। ইংরেজিকে

www.pathagar.com

রাষ্ট্রভাষা করার দাবির প্রেক্ষিতে তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে সরকারি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে ফরিদপুর জিলা স্কুল অন্যতম। ১৮৪০ সালে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ১৮৪০-১৮৫৬ সাল পর্যন্ত ফ্রানকয়েম ও লেফেবরা নামে দুজন ইউরোপিয়ান এই স্কুলের শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এই স্কুলের অন্যতম ছাত্র ছিলেন পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন। ১৮৪৪ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজকাজে নিযুক্ত হবার পর গ্রামাঞ্চলে ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৮৮৯ সালে ভাঙ্গা পাইলট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়

ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ফরিদপুর জেলার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৫১ সালে ফরিদপুরের তৎকালীন ডেপুটি মেজিস্টেট ভগবানচন্দ্র বসু ও চন্দ্রমোহন মৈত্র এই শহরের বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এটি মিডল ভ্যর্নাকুলার স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে এটি মিডল ইংলিশ স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ১৯৩৪ সালে অক্ষয় কুমার বাহাদুর এর প্রচেষ্টায় উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এই স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও ঈশানচন্দ্র ঘোষ।

ফরিদপুর জেলার প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় হলো : মহিম ইন্সটিটিউশন, ঈশান ইন্সটিটিউশন (অধুনালুপ্ত), হিতৈষী উচ্চ বিদ্যায়ল, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বোয়ালমারী জজ একাডেমি, ময়েজ উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়, এম. এন একাডেমি, বাইশরশি শিবসুন্দরী একাডেমি, হালিমা গালর্স উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি।

কলেজীয় শিক্ষা : রাজেন্দ্র কলেজ

অবিভক্ত বাংলার উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ অন্যতম। ১৯১২ সালে গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ফরিদপুর আগমন করলে ফরিদপুরবাসী এখানে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়, কিন্তু তাদের দাবি অগ্রাহ্য হয়। ফরিদপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজনৈতিক অম্বিকাচরণ মজুমদার ফরিদপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯১৫ সালের ২১ নভেম্বর ফরিদপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করেন। ১৯১৬ সালের ৯ জানুয়ারি কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অম্বিকাচরণ মজুমদার কলেজ প্রতিষ্ঠা কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। তিনি এ ব্যাপারে অর্থ সংগ্রহের জন্য বাইশরশির জমিদার রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরীসহ অন্যদের সংগে যোগাযোগ করেন। রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৯১৬ সালের ১৭ জুলাই জানান তাঁর স্বর্গীয় পিতা রাজেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীর নামে কলেজের নামকরণ করা হলে তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহযোগিতা করবেন।

১৯১৬ সালের ১৩ অক্টোবর কলেজ কমিটির সভায় এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯১৮ সালের ১ জুন কামাক্ষ্যানাথ মৈত্র কলেজের অধ্যক্ষ ও ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে যোগদান

www.pathagar.com

করেন। ১০ জুলাই কলেজের শুভ উদ্বোধন ও ক্লাস শুরু হয়।

ভারতবর্ষের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই কলেজে প্রথমে আইন ও আইএসসি খোলা হয়। ১৯২১ সালে ডিগ্রি কোর্স চালু হয়। ব্রিটিশ আমল থেকেই এই কলেজে অনার্স কোর্স চালু ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অর্থাৎ ১৯৭২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ১৬টি বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার কোর্স চালু রয়েছে। এই কলেজের দুটি ক্যাম্পাস রয়েছে। একটি শহর ক্যাম্পাস আরেকটি বায়তুল আমান ক্যাম্পাস। এই কলেজে ৪টি ছাত্রাবাস রয়েছে। বর্তমানে শহর ক্যাম্পাসে প্রশাসনিক ভবন, ইন্টারমিডিয়েট কোর্স, ডিগ্রি পাস কোর্সের কার্যক্রম ও বিজ্ঞান অনুষদের কয়েকটি বিষয়ে কিছু কিছু ব্যবহারিক ক্লাস নেয়া হয়। বায়তুল আমান ক্যাম্পাস অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের জন্য নির্ধারিত।

ফরিদপুরের উল্লেখযোগ্য কলেজগুলো হলো : ভাঙ্গা কলেজ (১৯৬৫), বোয়ালমারী কলেজ (১৯৬৬), সারদাসুন্দরী মহিলা কলেজ (১৯৬৬), ইয়াছিন কলেজ (১৯৬৮), নগরকান্দা কলেজ, মধুখালী আইনউদ্দিন কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ কলেজ, ফরিদপুর মুসলিম মিশন কলেজ, ফরিদপুর মহাবিদ্যালয়।

ফরিদপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ এর সুপারিশ ও ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ১৯৬২ সালে ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে বায়তুল আমান এলাকায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। জেলাভিত্তিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হিসেবে এটি একটি অনন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল, পাওয়ার ও ইকেল্ট্রনিক্স বিভাগ চালু রয়েছে। দেশের উন্নয়নকল্পে দক্ষ প্রকৌশলীর চাহিদা মিটাতে এই কলেজের অবদান অনস্বীকার্য।

ফরিদপুর কমার্শিয়াল কলেজ

১৯৪৭ সালের পূর্বে এ অঞ্চলে বিজ্ঞান সম্মত বাণিজ্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। ১৯৬৫ সালে ফরিদপুরে কর্মাশিয়াল কলেজ স্থাপিত হয়। এ কলেজটি বিভিন্ন সময়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে কমলাপুরস্থ চাঁদমারীর চকে স্থায়ী নিজস্ব ভবনে পাঠদান করা হচ্ছে।

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)

দেশের শিল্প কারখানায় ক্রমবর্ধমান দক্ষজনশক্তি তৈরির লক্ষে আর্ন্তজাতিক শ্রমসংস্থার সহায়তায় ফরিদপুর পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণকান্দায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বর্তমানে ১২টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

নার্সিং শিক্ষা

ফরিদপুর মেডিকেল হাসপাতালের উত্তরপাশে পশ্চিম খাবাসপুরে নার্সিং কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি শিপটে এ-সনে ৫০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

www.pathagar.com

আইনশিক্ষা

এলএলবি ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে ফরিদপুর শহরে একটি আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈশকালীন শিক্ষার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নদী গবেষণা সংলগ্ন হাসরা কৈজুরী এলাকার বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা খোলা হয়েছে। এস এস সি, এইচ সি এবং ডিগ্রি পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি পশ্চিম খালাসপুরে টাইম বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও ফরিদপুর শহরে পিটিআই, ফ্রিড এবং বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি ও বেসরকারিভাবে গড়ে উঠেছে।

ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ

ফরিদপুরে বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষা চালু হয় মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে এটি চালু হয়। এখান থেকে পাশ করা চিকিৎসকগণ ফরিদপুরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে থাকেন, কিন্তু ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় এই শিক্ষা অপ্রতুল হওয়ায় এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই পটভূমিতে ১৯৮৪ সালে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ চালু হয়। ফরিদপুর ঈশান ইন্সটিটিউশনে অফিস ও কলেজ ভবন এবং হাড়োকান্দিতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল অবস্থিত। প্রতি শিক্ষাবর্ষে ৫০ জন শিক্ষার্থী এখানে ভর্তি হতে পারে। বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে ডায়বেটিস মেডিক্যাল কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

পাতরাইল মজলিস আউলিয়া মসজিদ : এই ঐতিহাসিক স্থাপনাটি ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের পাতরাইল গ্রামে অবস্থিত। দশ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির দৈর্ঘ্য ২৫.১২ মিটার এবং প্রস্থ ১২.৪৬ মিটার। চার কোণে ৪টি মিনার রয়েছে। মসজিদের দেয়াল ২.১০ মিটার। মসজিদের ভেতরে ৪টি স্তম্ভ আছে। মসজিদটি ষোড়শ শতাব্দীর সুলতানি আমলের মসজিদ বলে ধারণা করা হয়। এই মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বর্তমানে সংরক্ষণ করছে। সম্প্রতি এটি পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। কেউ কেউ এর নির্মাণ শৈলীর গঠন অনুযায়ী মসজিদটি হোসেনশাহী আমলের বলে ধারণা করেন। মজলিস আউলিয়া নামক একজন ধর্মপ্রাণ সাধকের নামানুসারে মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছে। কথিত আছে, শাহ ইসমাইল এবং শাহ ইউসুফ

www.pathagar.com

নামক দুই ব্যক্তির আহ্বানে এক সাধক দরবেশ সুদূর বাগদাদ থেকে এসে এখানে বসবাস করতেন এবং তিনিই এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

গবেষকগণ মনে করেন, গঠন শৈলী অনুযায়ী এই মসজিদটি মুসলিম স্থাপত্য রীতিতে তৈরি। যদিও গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের সঙ্গে এই মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদটি সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ নির্মাণ করেছিলেন।

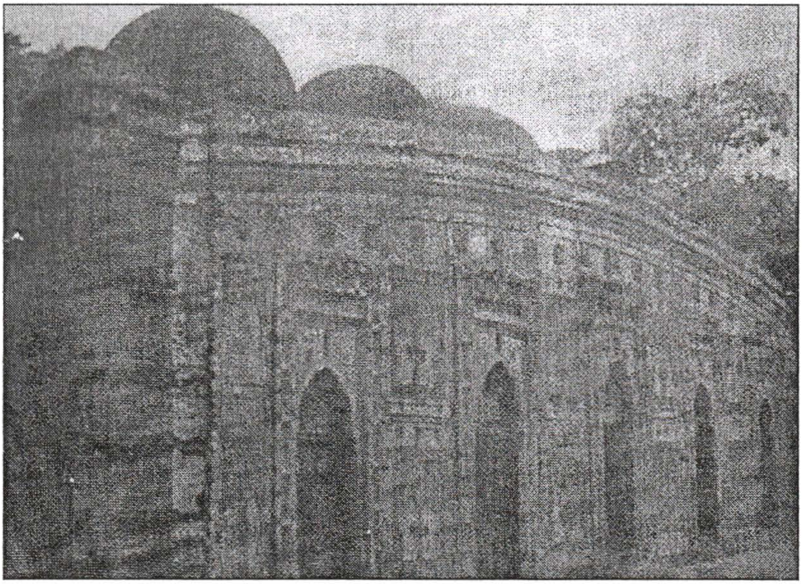

পাতরাইল মজলিসআউলিয়া মসজিদ

খরসুতি বেলে পাথরের মন্দির : এই প্রত্নস্থলটি ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার ময়না ইউনিয়নের খরসুতি গ্রামে অবস্থিত। রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এটি নির্মাণ করেছেন বলে জানা যায়। ধারণা করা হয় মন্দিরটি উনিশ শতকে তৈরি কিন্তু এ ধরনের বেলে পাথরের স্থাপনা বাংলাদেশে খুব একটা নেই বললেই চলে। মন্দিরটি উত্তর ভারতীয় Temple style-এ তৈরি মন্দিরটির উত্তর ও দক্ষিণে দু'টি কাঠের তৈরি দরজা রয়েছে। দরজার পাল্লায় কাঠের কারুকার্যে মন্ডিত দু'টি মুখোমুখি সাপ পেচানো রয়েছে এবং দুই পাল্লার মাঝে কাঠের বিষ্ণুমূর্তি বিদ্যমান। দক্ষিণ পাশের বারান্দায় একটি বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। মন্দিরের ভিতরে একটি বিশাল শিবলিঙ্গ স্থাপনা করা হয়েছিল। বর্তমানে সেটি চুরি হয়ে গিয়েছে।

www.pathagar.com

সাতৈর শাহী মসজিদ : এই ঐতিহাসিক স্থাপনাটি ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার সাতৈর ইউনিয়নের সাতৈর গ্রামে অবস্থিত। বিখ্যাত দরবেশ শাহ সাইয়ীদ মাসুদ হাক্কানী যিনি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের ধর্মনির্দেশক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তাঁর সম্মানে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটি গোলাকার ৯ গম্বুজ বিশিষ্ট। আয়তকার ভূমি নকশার ভিতরের পরিমাপ ১৩.৮০ মিটার x ১৩.৮০ মিটার এবং এটি নয়টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। চারটি পাথরের স্তম্ভের উপর গম্বুজটি উদীয়মান এবং চার দিকে আরো কয়েকটি মসজিদটি তাৎপর্যপূর্ণ। ধারণা করা হয় মসজিদটি ১৫ শতকের শেষে অথবা ১৬ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত হয়েছিল। তবে মসজিদটির নির্মাণ শৈলী বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ ও বরিশালের কসবার নয় গম্বুজ মসজিদের ন্যায়। মসজিদটি ফরিদপুর জেলার অন্যতম প্রাচীন মসজিদ। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে অনেক কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি রয়েছে।

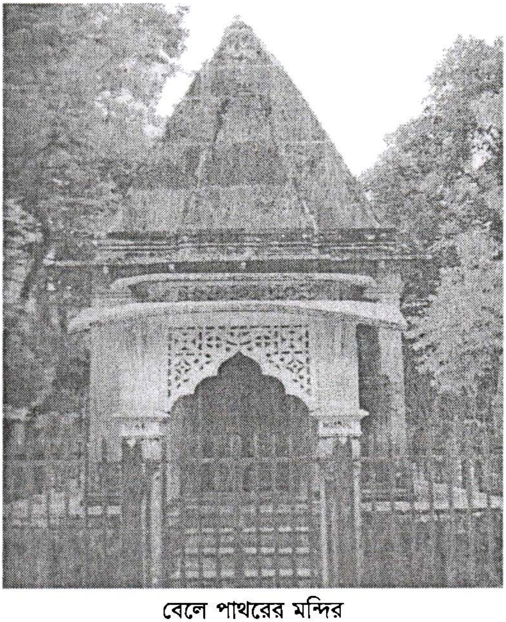

বেলে পাথরের মন্দির

পরগণাগুলো বর্তমানে খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও নোয়াখালী। জানা যায়, আকবরের আমলে বারাসিয়া চন্দনা নদীর দিকে স্থাপিত সুপরিকল্পিত ভূষণা দুর্গের একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। দুর্গটি চাঁদ রায়ের অধীনে ছিল। ১৫৯৩ খ্রি. চাঁদ রায় পাঠান প্রধান সুলাইমান এবং উসমান কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। ভূষণা দুর্গ সংলগ্ন উল্লেখ্যযোগ্য স্থাপনা হলো : একটি পুরাতন মসজিদ, পুরনো সমাধি, সুরক্ষিত গিরি, একটি কূপ, একটি ফাঁসির মঞ্চ এবং বৈরাগির আখড়া।

www.pathagar.com

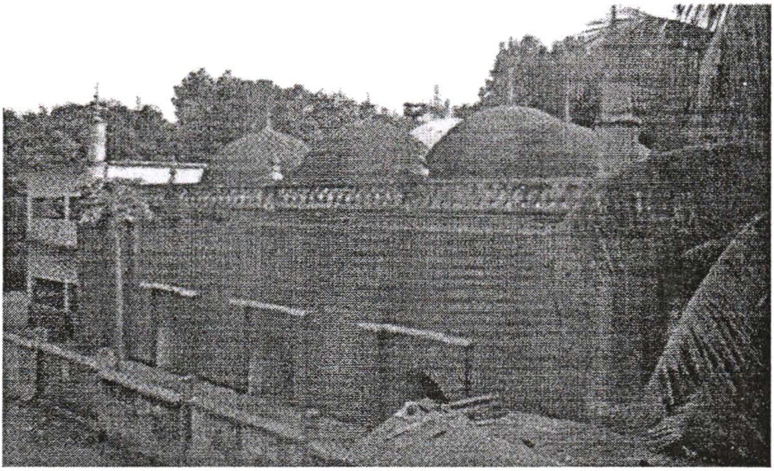

সাতৈর শাহী মসজিদ

ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্র

মথুরাপুর দেউল: এই প্রত্নস্থলটি ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের গাজনা মৌজার মথুরাপুর গ্রামে অবস্থিত। এটি মথুরাপুর

দেউল বা মঠ নামে পরিচিত। বার কোণ বিশিষ্ট এ মঠটি এদেশের মন্দির শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। মঠের বহির্ভাগ টেরাকোটা ইট দ্বারা সজ্জিত। এখানে গ্রাম্যজীবন এবং 'রামায়ণ' 'মহাভারতের' নানা দৃশ্য বিধৃত। মঠের ভেতরে রয়েছে ছোট একটি কক্ষ।

এই মঠটির নির্মাতা এবং এর ইতিহাস সম্পর্কে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। সম্ভবত মোগল সেনাপতি সংগ্রাম সিংহ ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় এসেছিলেন এবং প্রবল ক্ষমতাধর হয়ে উঠেন। তিনি কালক্রমে বাংলার বৌদ্ধ সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেন এবং মথুরাপুরের এক বৌদ্ধ পরিবারের মেয়েকে বিবাহ করেন। ঐ সময় অনেক মন্দির, উপাসনালয় এবং কূপ সংগ্রাম সিংহের নামে পরিচিতি লাভ করে। কথিত আছে, সংগ্রাম সিংহ রাজা সত্যজিৎ রায়কে যুদ্ধে পরাজিত করে বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। আবার জনশ্রুতি আছে, সম্রাট আকবারের সেনাপতি মানসিংহ স্থানীয় রাজা প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করে বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। তবে মথুরাপুরের অনিন্দ্যসুন্দর এই দেউলটি নির্মাণের পক্ষে সংগ্রাম সিংহকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়।

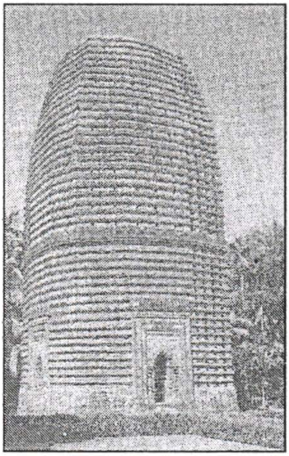

মথুরাপুর দেউল

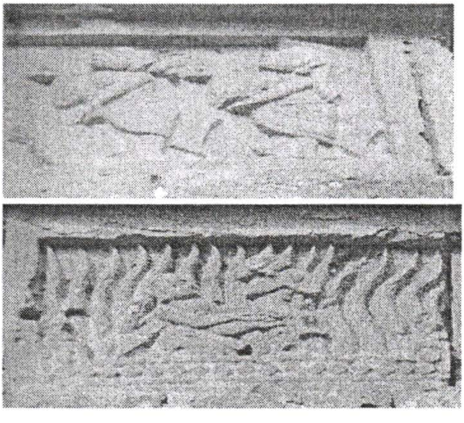

মথুরাপুর দেউলে পোড়ামাটির ফলকচিত্র

আলী আফজাল মসজিদ : এই প্রত্ননিদর্শনটি ফরিদপুর জেলায় মধুখালী উপজেলার বনমালদিয়া গ্রামে অবস্থিত। মসজিদটির গায়ের শিলালিপিতে এর নির্মাণকাল ১২৪৯ হিজরি বলে উল্লেখ রয়েছে। মসজিদের স্থাপত্য কৌশল কতকটা মোগল স্থাপত্যের অপভ্রংশ বলে কেউ কেউ মনে করেন। মসজিদের পাশে শাহ মর্দানের মাজার এবং মাজারের পাশে একটি পুকুর রয়েছে। মসজিদটির সম্মুখভাগের দেয়ালে প্রত্যেকটি গম্বুজ বরাবর খিলান দরজা রয়েছে। খিলান দরজাগুলো অর্ধ গম্বুজের ন্যায় এবং বহু নকশায় চিত্রিত।

www.pathagar.com

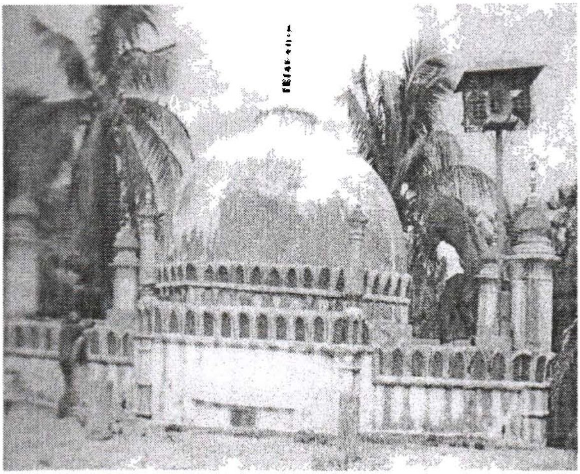

আলী আফজাল মসজিদ

শাহ ফরিদ দরগা : ফরিদপুর শহরের কালেকটরেট বিল্ডিং সংলগ্ন যশোর রোডের পাশে শতাব্দীর পুরনো বটগাছের নিচে শাহ ফরিদ শাহের দরগা (যার নামে ফরিদপুরের নামকরণ করা হয়েছে)। খাজা মাইনউদ্দিন চিশতি (র.) এর শিষ্য শাহ ফরিদ (র.) ইসলাম প্রচারের জন্য ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম সফর করেন।

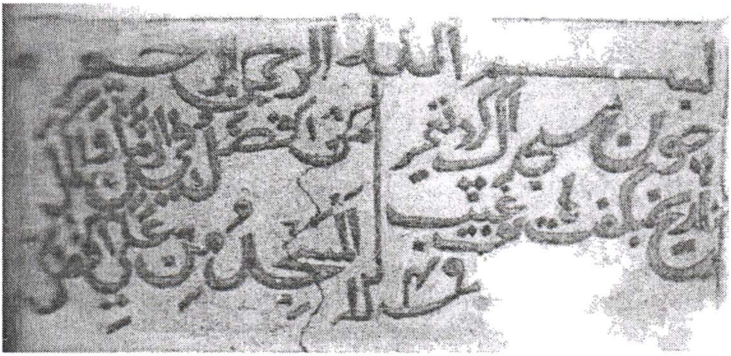

আলী আফজাল মসাজদে উৎজীন শিলালিপি

ধারণা করা হয়, সফরের সময় তিনি সঙ্গী-সাথি নিয়ে উক্ত স্থানে বিশ্রাম নেন এবং আস্তানা গড়ে তুলেন। অনেক গবেষণা মনে করেন তিনি এ অঞ্চলে আগমন করেন নি। তিনি পাকিস্তানের মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানের পাকপত্তনে তাঁর মাজার রয়েছে। এই শেখ ফদিরকে নিয়ে বাংলাদেশের অন্যত্র বেশকিছু কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। ১৩০০ সালের দিকে জনৈক পনিরউদ্দিন এখানে একটি কেল্লা তৈরি করেন। বর্তমানে এখানে শাহ ফরিদ মসজিদ বা দরগা মসজিদ নামে একটি মসজিদ রয়েছে। শাহ ফরিদের দরগাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

www.pathagar.com

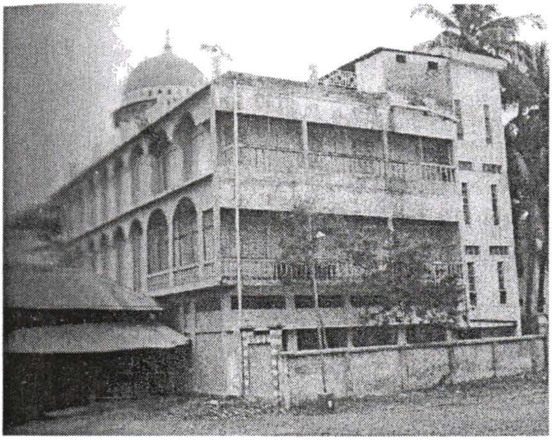

শাহ ফরিদ দরগা মসজিদ

মহিম স্মৃতিমঠ : ফরিদপুর শহরের পশ্চিম পাশে ফরিদপুর যশোর মহাসড়কের পাশে মহিম ইন্সটিটিউট সংলগ্ন মহিম স্মৃতিমঠ। স্থানীয়ভাবে এটি সমাধিমন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরটির ইটের গাঁথুনি একটি প্রশস্ত প্লাটফর্মের উপর নির্মিত। এটি একটি পঞ্চচূড়া মঠ বিশিষ্ট মন্দির। মন্দিরের গায়ে শ্বেত পাথরে খোদাই রয়েছে স্বর্গীয় মহিম চন্দ্র সাহা, দেহরক্ষা ১৩৩৬ সন ২৪ অগ্রাহয়ণ/১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ। মঠের দক্ষিণ পাশের প্রবেশ পথের সম্মুখের উপরে রয়েছে লতা-পাতার নকশি করা কারুকার্য এবং নিচের অংশে মুখোমুখি দু'টি সিংহমূর্তি। সিংহের পায়ের নিচের দেয়ালের কার্নিসে উদ্ভিদ, লতা, ফুলের নকশি সজ্জিত অর্ধ-গোলাকৃতি প্রবেশদ্বারে নকশা আঁকা রয়েছে। উত্তরের দরজায় একই কারুকার্য খচিত মুখোমুখি দু'টি বাঘের মূর্তি। পশ্চিমের দরজায় মুখোমুখি দু'টি সাপের আকৃতি উৎকীর্ণ রয়েছে। সমাধির ভেতরে ঢোকার জন্য দক্ষিণ প্রবেশদ্বারে একটি সিঁড়ি রয়েছে। ভূমি থেকে এর মেঝের উচ্চতা ১.১৫ মিটার।

জগতগৌরী চৌধুরাণী স্মৃতিমঠ : ফরিদপুর জেলা শহরের পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্টহাউজ সংলগ্ন ফরিদপুর-যশোর মহাসড়কের উত্তর পাশে জগতগৌরী চৌধুরাণী স্মৃতিমঠের অবস্থান। ১৮৯৬ সালে এটি নির্মিত হয়। স্থানীয়ভাবে এটি সমাধি মন্দির হিসেবে পরিচিত। সমাধিটির দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের উপরে শ্বেত মার্বেল পাথরের একটি স্মৃতিফলক রয়েছে। এই মঠটিতে পাঁচটি রত্ন বা প্রজেকশন থাকায় এটিকে পঞ্চরত্ন মন্দিরও বলা হয়। মন্দিরের দেয়ালের গায়ে খিলানগুলোতে নজরকাড়া সূক্ষ্ম কারুকাজ রয়েছে। মঠগুলোর চূড়ায় ঢেউ খেলানো নকশার একটি অপূর্বশৈলী মন্দিরটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

রথখোলা চৌধুরীবাড়ির দুর্গা মন্দির : ফরিদপুর আন্তঃজেলা পুরাতন বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্বে পুরাকীর্তির এক অপূর্ব নিদর্শন এই মন্দিরটি। এটি মূলত আয়তকার একটি মন্দির যার তিনটি কক্ষ এবং একটি বারান্দা রয়েছে। প্রতিমা ঘর বা গর্ভগৃহটি মন্দিরের ভেতরে অবস্থিত। সম্মুখের বারান্দা নাটমণ্ডপ হিসেবে পরিচিত। মন্দিরটির

www.pathagar.com

প্রধান ফটকের প্রবেশ দরজার উপরে মুখোমুখি দু'টি সিংহ মূর্তি। উত্তরভাগের দেয়ালের ভিতরে প্রবেশদ্বারে ৪টি পিলারের উপরে বিভিন্ন দৃষ্টি নন্দন নকশা চিত্রিত রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাশের দেয়ালের গায়ে একই রকমের বিচিত্র চিত্র দৃশ্যমান। এছাড়া চৌধুরী বাড়িতে রয়েছে বেশ কিছু দৃষ্টি নন্দন স্থাপত্য নির্দশন। যেমন- ভোজনালয়, দেয়াল ঘেরা মহিলাদের স্নান ঘাট, বৈষ্ণব মন্দির (রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি), প্রসাদ ভবন এবং কুমার নদ সংলগ্ন প্রবেশ দ্বার।

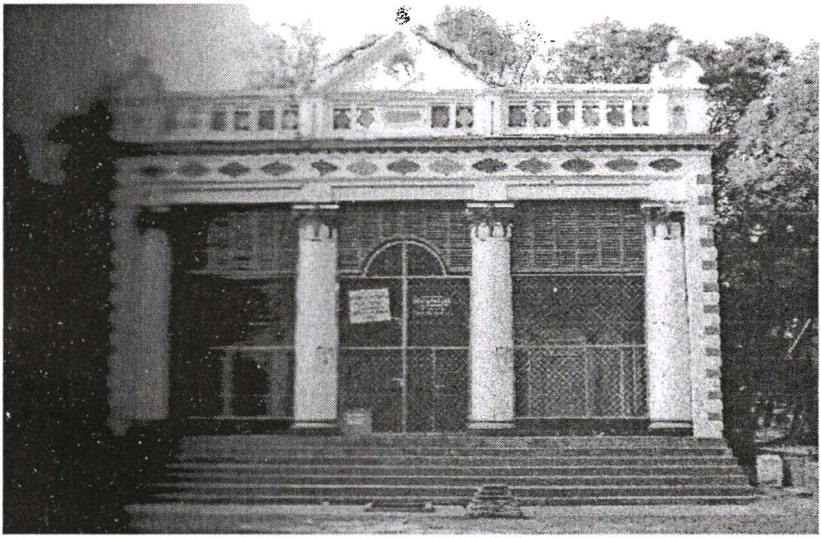

রথখোলা চৌধুরী বাড়ি দুর্গামন্দির

গৌরগোপাল বিগ্রহ মন্দির : ফরিদপুরের অন্যতম মন্দির গৌরগোপাল বিগ্রহ মন্দির। নির্মাণ কাল ১৯০৩ সাল। এটি ফরিদপুর শহরের পুরাতন বাস টার্নিনালের ট্রাফিক মোড়ের পাশে অবস্থিত। হিন্দুসম্প্রদায়ের কাছে এই মন্দিরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্কষণীয় মন্দির। শতবর্ষী চুন সুরকির তৈরি এই মন্দিরে প্রত্যহ পূজার্চনা হয়। মন্দিরের পুকুরঘাটে রয়েছে ছোট্ট একটি শিবমন্দির যেখানে সপ্তান্তে শিব পূজার আয়োজন চলে।

গেরদার ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ : ফরিদপুর জেলার সবচেয়ে পুরাতন এই মসজিদটি ফরিদপুর জেলা শহর থেকে ২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। নির্মাণ কাল দশম হিজরি। ঢাকার মিরপুরে শাহ আলী বোগদাদি (র.) যে মাজার রয়েছে। তিনি প্রথমে কয়েকজন সাহাবি নিয়ে তৎকালে গেরদা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন এবং ঐতিহাসিক শাহী মসজিদটি নির্মাণ করেন। পরবর্তী সময়ে তার সঙ্গী-সাথিরা ইসলাম

www.pathagar.com

প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হন। উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক এই মসজিদটি পদ্মার ভাঙ্গনের কবলে পরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং পরে তা নতুন করে এটি নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে মসজিদ সংলগ্নস্থানে পুরাতন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই মসজিদের একটি কক্ষে একটি পুরাতন কাঠের থালা, একটি পাগড়ি, মাছের কাটার তৈরি তসীহ, শাহ মাদারের কুর্দি, বড়পির সাহেবের জুব্বা, হযরত সাহী (র.) এর গোঁফ, হযরত হাসান (র.) ও হযরত হুসাইন (র.) এর চুল সংরক্ষিত রয়েছে।

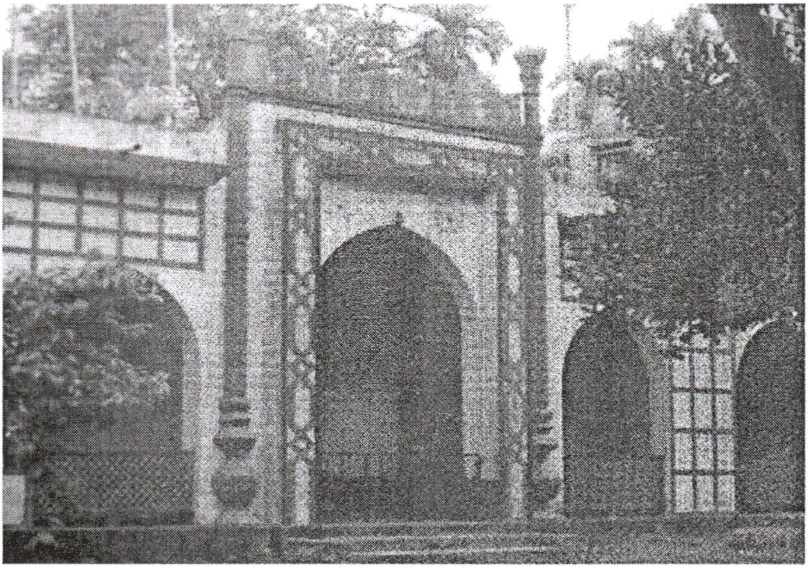

গেরদার ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ

বিসমিল্লাহ শাহের দরগা : বিসমিল্লাহ শাহের দরগাটি ফরিদপুর বরিশাল মহাসড়কের পাশে মামুদপুর এলাকায় অবস্থিত। বর্তমান স্থাপনাটি সাম্প্রতিকালের হলেও বিসমিল্লাহ শাহের ইতিহাস দশম হিজরিতে গেরদার ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেউ কেউ মনে করেন বিসমিল্লাহ শাহ শাহ আলী বোগদাদি (র.) এর একজন সাহাবি ছিলেন। বিসমিল্লাহ শাহকে নিয়ে এতদ্ঞ্চলে বেশকিছু কিংবদন্তি ছড়িয়ে আছে।

জগদ্বন্ধুর আঙ্গিনা : হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট অত্যন্ত পবিত্র তীর্থস্থান। স্থানটি ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট এলাকায় অবস্থিত। জগদ্বন্ধু নামে একজন ধর্মীয় সাধক ছিলেন। যিনি ১৩২৮ বঙ্গাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তাঁর সমাধি ঘিরে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত আধুনিক স্থাপত্যের নির্দেশন এই আঙ্গিনাটি। এখানে নামকীর্তনসহ অন্যান্য ধর্মীয় কার্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

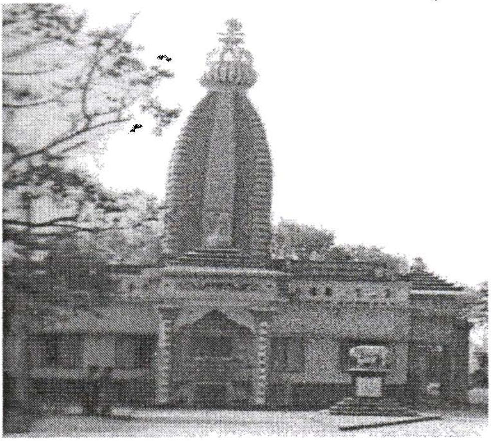

জগদ্বন্ধুর আশ্রম

শিকদার বাড়ি : এই প্রত্নস্থানটি ফরিদপুর সদরের কানাইপুর এলাকায় অবস্থিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু জমিদার শ্রেণির প্রসাদভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা রয়েছে এখানে। তন্মধ্যে রাজকীয় বিভিন্ন শ্রেণির প্রাসাদভবন, কাছারি ঘর, রাজকীয় নদীঘাট, শিবমন্দির, নারায়ণ মন্দির ও দুর্গামন্দির উল্লেখযোগ্য।

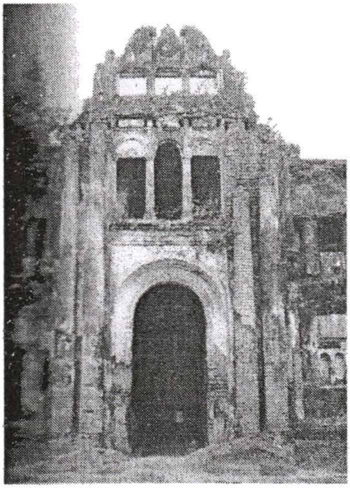

কানাইপুর শিকদার বাড়ির ভগ্নাংশ

ঈশান গোপালপুর জমিদার বাড়ি : এটি ফরিদপুর সদরের ঈশান গোপালপুর গ্রামে অবস্থিত। এটি হিন্দু জমিদার শ্রেণির রাজকীয় প্রসাদভবন। এখানে রয়েছে দুর্গামন্দির, শিবমন্দির, দোলমঞ্চ, মাতৃমন্দির এবং বেশ কয়েকটি মঠ। প্রত্যেকটি স্থাপনায় রয়েছে প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব সমাহার।

www.pathagar.com

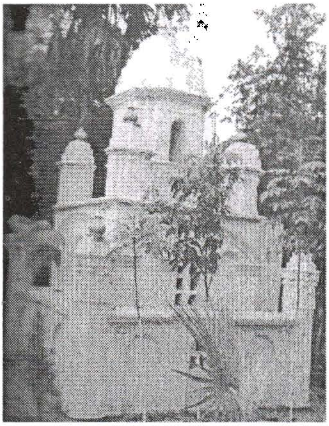

ঈশান গোপালপুর জমিদার বাড়ি দোল মঞ্চ

বাইশ রশির জমিদার বাড়ি : ফরিদপুর জেলার প্রাচীন জমিদার শ্রেণির অন্যতম বাইশ রশির জমিদার শ্রেণি। কালের গর্ভে এদের বংশধর না থাকলেও এদের নির্মিত স্থাপনা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানাধীন বাইশ রশি গ্রামে এই জমিদার শ্রেণীর স্থাপনা। যা তৎকালীন জমিদার শ্রেণীর স্থাপত্য শিল্পের নির্দশন। ইতিহাসবিদদের মতে ঔপনিবেশিক আমলের জমিদার বাড়িগুলির একটি অন্যতম পূর্ণাঙ্গ জমিদার বাড়ি এটি যা বাংলার অমূল্য প্রত্নসম্পদ। এই বাড়িতে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রসাদভবন, কাছারি ঘর, বৃহৎ পুকুর, শিবমন্দির, দুর্গামন্দির কামপ্লেক্স, মহিলাদের স্নানঘাট সম্বলিত পুকুর, বাতিঘর, অন্দর মহলের মন্দির, দৃষ্টিনন্দিত বিভিন্ন শ্রেণির মঠ, নবচূড়া সমাধিমঠ, পঞ্চচূড়া সমাধিমঠ প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য।

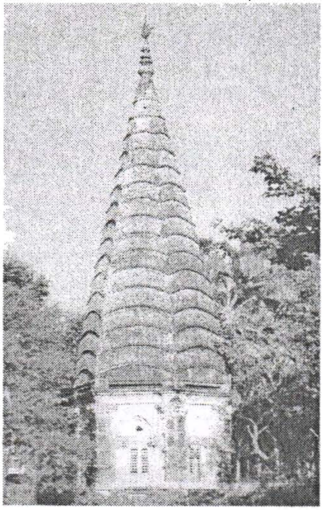

বাইশ রশির জমিদার বাড়ি সমাাধিমঠ

www.pathagar.com

ফরিদপুর জেলা জর্জ কোর্ট : দৃষ্টিনন্দিতঐতিহ্যবাহী ফরিদপুর জেলা জর্জ কোর্ট ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই ভবনটি ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের রীতি ও রং অপূর্ব। ইংরেজি এল' আকৃতির ভবনটি দোতলা বিশিষ্ট। ভবনটি ঠিক মাঝখান দিয়ে উপরে উঠার রয়েছে লোহার ডিজাইন যুক্ত সিঁড়ি। এইরূপ আরোদুটি লোহা সিঁড়ি রয়েছে। সব মিলিয়ে ভবনটিতে ১২টি বড় আকারের কক্ষ রয়েছে।

ভূষণা দুর্গ : ভূষণা দুর্গটি ফরিদপুরের অন্যতম প্রত্নস্থল। যদিও এই দূর্গের অস্থিত্ব বিলুপ্ত। আকবারনামা অনুসারে ভূষণা দুর্গটি একটি শক্তিশালী ও বিখ্যাত দুর্গ ছিল এবং এটি বাংলার বারোভূঞাদের অন্যতম মুকুন্দ রায়ের জমিদারের অধিনে ছিল। মুরশিদকুলি খানের ভূমি বন্দোবস্তের সময ১৩টি সার্কেরের কয়েকটি পরগণার অন্যতম ছিল ভূষণা দুর্গটি। দুর্গটি মূলত মাটির তৈরি ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে এই স্থলে খনন করে বেশকিছু প্রত্ন নিদের্শন পাওয়া গিয়েছে।

পূর্ণ্য বাবুর বাড়ি : বোয়ালমারী উপজেলার বোয়ালমারী উইনিয়নের ওয়াহিয়াবাদ প্রথমে ফরিদপুরের অন্যতম প্রত্নস্থল। স্থানীয়ভাবে বাড়িটিকে পূর্ণ্য বাবুর দুর্গও বলা হয়। গবেষকেরা মনে করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়এ দেশে যে রাজন্যবর্গের জন্ম হয় পুণ্য বাবু তাদেরই একজন। এই বাড়িটির অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে বাড়িটিতে কয়েকটি ছোট খিড়কি রয়েছে । যা দিয়ে বহিরাগতদের প্রতি নজর রাখা হতো এবং প্রয়োজন আত্মরক্ষার্থে তার বপির গুলি চালানো গতো

ফরিদপুর জিলাস্কুল : ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত ফরিদপুরের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম। এটির নির্মাণ শৈলী অসাধারণ।

ব্যাপিস্ট মিশন : ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত। প্রত্নতাত্তিকভাবে এর গুরুত্ব না থাকলেও ফরিদপুরে খ্রিষ্টান মিশনারি কর্মতৎপরতা ও খ্রিষ্টান ধর্মের প্রসারের ইতিহাসের সঙ্গে এই চার্চটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফরিদপুর একটি প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন যুগের সঙ্গে ফরিদপুরের স্থানীয় ইতিহাসের যোগসূত্রের পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাম্রপত্র, মুদ্রা, স্মৃতিফলক এবং জনশ্রুতির মধ্যে কিছু কিছু ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। লিখিত সূত্রের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গৃহীত কর্মসূচিকেই প্রাথমিক পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলেও মনে করা হয়।

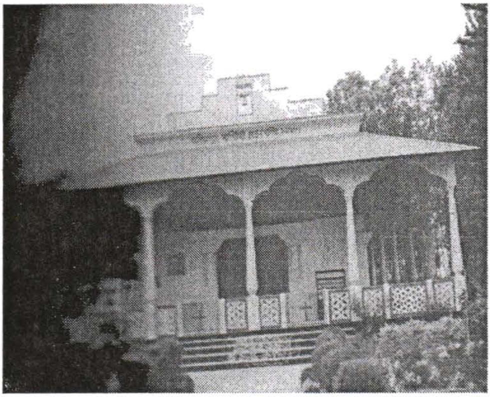

www.pathagar.com

জ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

নবাব আবদুল লতিফ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বাংলার মুসলমানেরা নানাভাবে উৎপীড়িত শোষিত হয়ে উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ অধঃপতনের সীমায় এসে উপনীত হয়। বাংলার মুসলমানদের এ ঘোর দুর্দিনে নবাব আবদুল লতিফ এদেশের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

তিনি মুসলমানদেরকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করে তাদেরকে উন্নতির পথে চালিত করার জন্য কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। উত্তর ভারতে মুসলমানদের উন্নতির জন্য সেরূপ প্রচেষ্টা চালান। বাংলার এ কৃতিসন্তান নবাব আবদুল লতিফ ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কাজি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় কলকাতা মাদ্রাসায়। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কর্তব্য নিষ্ঠা ও যোগ্যতার গুণে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কোলকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। আবদুল লতিফ চাকরি জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার কর্তৃক 'নবাব' এবং পরে 'নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে নবাব আবদুল লতিফ বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন এবং তিনিই প্রথম মুসলিম যিনি এ পদ লাভের গৌরব অর্জন করেন। তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনেরও সদস্য ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন। নবাব আবদুল লতিফ আগে থেকেই আধুনিক শিক্ষার আলোকে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা ও কুসংস্কার দূর করে তাদের পুনর্জাগরণের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। মুসলমান সমাজের কল্যাণে এবং স্বার্থরক্ষা তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তিনি তাঁর বাস্তববাদী বিবেচনা দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থতা, ইংরেজি

নবাব আবদুল লতিফ

শিক্ষা বর্জন এবং সরকারের সহিত অসহযোগনীতিই মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ

www.pathagar.com

হয়েছিল। মুসলমানদের হীনমন্যতা দূর এবং তাদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে তিনি সচেষ্ট হন। নবাব আবদুল লতিফের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো ১৮৭৩ সনে কলকাতায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে এ প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। এ সমিতিতে প্রধানত মুসলমানদের সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা ও তার যুগোপযোগী সমাধান সম্পর্কে আলোচনা হতো এবং প্রগতিশীল ভাবধারার সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় সাধনের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য আবদুল লতিফের যথেষ্ট অবদান ছিল এবং তার নেতৃত্বে ১৮৭২ সনে সরকারি সাহায্যে মফস্বলে কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন।

শিক্ষা বিষয়ে তিনি সরকারি নীতিকে সমর্থন করেন। হিন্দু কলেজের রক্ষণশীলতা এবং জাতিভেদে প্রথা দূর করে এর দ্বারা সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত করবার সরকারি প্রচেষ্টাকে তিনি স্বগত জানান। রক্ষণশীল হিন্দু কলেজের প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ১৮৫৩ সালে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সরকার তাঁকে ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বাংলার মুসলমানদের পুনর্জাগরণে নবাব আবদুল লতিফ নিঃসন্দেহে একজন অগ্রণী ছিলেন। এ কৃতিপুরুষ ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ১০ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

অম্বিকাচরণ মজুমদার

১৮৫১ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার রাজৈর (অধুনা মাদারীপুর জেলায়) থানার সেনদিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণকরেন। তিনি আইনজীবী, রাজনীতিক ও সমাজ সেবক হিসেবে পরিচিত। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এরপর তিনি ফরিদপুর বারে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও এককালীন সভাপতি।

অম্বিকাচরণ মজুমদার

www.pathagar.com

এসময় যদুনাথ পাল ছিলেন কংগ্রেসের সম্পাদক। অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ফরিদপুরে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরই নেতৃত্বে ফরিদপুরের উকিল ও মোক্তারগণ স্বদেশী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জেলার রাজনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কংগ্রেসের ৩১তম সভার সভাপতিও ছিলেন। তিনি ফরিদপুরের প্রথম কলেজ রাজেন্দ্র কলেজ এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯২২ সালে ২৯ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Indian National Evolution.

আলীমুজ্জামান চৌধুরী

খান বাহাদুর আলীমুজ্জামান চৌধুরী ফরিদপুর জেলার বেলগাছিতে (অধুনা রাজবাড়ি জেলায়) জন্মগ্রহণ করেন। বৃহত্তর ফরিদপুরে মুসলমানদের মধ্যে তিনি প্রথম আইসিএস। তিনি একনাগাড়ে দীর্ঘ ১২ বছর ফরিদপুর জেলা বোর্ড ও পৌরসভার সভাপতি ছিলেন।

ফরিদপুরের উন্নয়নে তিনি প্রচুর জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। তাঁকে তৎকালীন ফরিদপুর উন্নয়নের অগ্রনায়ক বলা হয়। তাঁর নামে ফরিদপুরে আলীমুজ্জামান ব্রিজ, আলীমুজ্জামান হল, রাজবাড়িতে তার নামে আলীমুজ্জামান সড়কসহ একটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে।

আলীমুজ্জামান চৌধুরী

বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম

১৮৯০ সালে বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম ফরিদপুর জেলার সদরপুরের বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিচারপতি, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। তিনি ১৯১৪ সালে মেট্রিক, ১৯১৬ সালে ইংরেজিতে স্নাতক (অনার্স) এবং পরে অর্থনীতিতে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২২ সালে তিনি বি এল পাশ করে প্রথমে ফরিদপুরে পরে ঢাকা বারে আইন পেশায় যুক্ত হন।

www.pathagar.com

বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম

১৯৩৯ সালে তিনি বিচার বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টেও বিচারপতি নিযুক্ত হন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন চলাকালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান অস্ত্র প্রয়োগের ভয় দেখালে তিনি এর প্রতিবাদ করেন। তিনি ১৯৫৬-৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। তিনি পাকিস্তান সরকারের আইনমন্ত্রীও ছিলেন।

জসীমউদ্‌দীন

জসীমউদ্‌দীনের জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯০৩ মাতুলালয়, তাম্বুলখানা গ্রাম, ফরিদপুর। পৈতৃক নিবাস গোবিন্দপুর গ্রাম, ফরিদপুর। কবি। পিতা ফরিদপুর শহরের হিতৈষী পাঠশালার শিক্ষক আনসারউদ্দীন মোল্লা।

ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ. (১৯২৯) পাস। ১৯৩১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ।

স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৩১-১৯৩৭ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট। ১৯৩৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৪৩ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৪৪-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের পাবলিসিটি বিভাগের অফিসার নিযুক্ত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগের Additional Song Publicity Organiser পদে যোগদান। ১৯৬২-তে প্রচার বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ। ঢাকার কমলাপুরে নিজের নির্মিত বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস। ১৯৭৬-এর ১৩ মার্চ মৃত্যুমুখে পতিত।

www.pathagar.com

কবি জসীমউদ্‌দীন

তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে ১৪ মার্চ (১৯৭৬) ফরিদপুরের আম্বিকাপুর গ্রামে তাঁর দাদীর কবরের পার্শ্বে সমাহিত। পল্লী-কবি বলে খ্যাত। ছাত্র-জীবনেই তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। কলেজে অধ্যয়নকালে 'কবর' কবিতা রচনা করে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্র তাঁর কবিতায় কুশলতার সঙ্গে অঙ্কিত। এ অঙ্কন রীতিতে আধুনিক শিল্প-চেতনার ছাপ সুস্পষ্ট।

নক্সী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪) ও মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩) তাঁর বিখ্যাত গাথাকাব্য। রাখারী (১৯২৭), বালুচর (১৯৩০), ধানখেত (১৯৩৩), রূপবতী (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫৮) ও সুচয়নী (১৯৬১) তাঁর জনপ্রিয় খণ্ড-কবিতার সংকলন।

গদ্যশিল্পী হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। যাঁদের দেখেছি (স্মৃতিকথা, ১৯৫২), ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (স্মৃতিকথা, ১৯৬১), ও জীবন কথা (আত্মজীবনী, ১৯৬৪) তাঁর সুখপাঠ্য গদ্যগ্রন্থ।

হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশী (১৩৫৬), ডালিমকুমার (১৯৫১) রসালো শিশুতোষ গ্রন্থ। চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশ (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮ প্রভৃতি তাঁর সুপরিচিত ভ্রমণকাহিনী। পদ্মাপাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), মধুমালা (১৯৫১), পল্লীবধূ (১৯৫৬) ও গ্রামের মায়া তাঁর নাটক। বাঙ্গালীর হাসির গল্প (১ম খণ্ড-১৯৬০ ও ২য় খণ্ড-১৯৬৪) গল্পগ্রন্থ। বোবা কাহিনী (১৯৬৪) উপন্যাস।

রঙ্গিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫), গাঙ্গের পাড় (১৯৬৪), জারিগান (১৯৬৮) প্রভৃতি তাঁর গানের সংকলন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত। 'নক্সী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯) কাব্যটি 'ফিল্ড অব দি এমব্রডারি কুইল্ট' নামে ইংরেজিতে অনূদিত ও প্রকাশিত।

www.pathagar.com

প্রগতিশীল ও অসাম্প্রাদায়িক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান সরকার রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের পদক্ষেপ নিলে সরকারের সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনের (১৯৬৬-১৯৭১) অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্তার একজন দৃঢ় সমর্থক হিসেবে পরিচিত। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি প্রদান। সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক (১৯৭৬) লাভ। তাঁর মৃত্যু. ঢাকা, ১৩ মার্চ, ১৯৭৬।

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া)

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া) ১৯০৫ সালে ফরিদপুর শহরের এক মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি লাল মিয়া নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।

ফরিদপুর এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের পর কংগ্রেসে যোগদানের মধ্য দিয়ে লাল মিয়ার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধী আহূত নিখিল ভারত নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে তিনি ফরিদপুরের প্রতিনিধিত্ব করেন।

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া)

তিনি ১৯৩৬ সালে ফরিদপুর জেলা থেকে একজন কংগ্রেসকর্মী হিসেবে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য এবং ১৯৪০ সালে আইন পরিষদের সদস্য লাভ করেন। ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যার্থে তাঁকে মুসলিম লীগ কর্তৃক দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটির সেক্রেটারি করা হয়। তিনি পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সে নাম বদলিয়ে আবদাল্লাহ জহির উদ্দিন নামে পরিচিত হন। তিনি কবি ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ৭ এপ্রিল মৃত্যবরণ করেন।

www.pathagar.com

ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)

ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)১৯০৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর ফরিদপুর শহরের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার শুধু জমিদার পরিবারই নয় রাজনৈতিক পরিবার। তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে মোহন মিয়া নামে পরিচিত এবং ফরিদপুরের জনগণের কাজে মাইজা মিয়া নামে খ্যাত। ছাত্রাবস্থায় তিনি ভারত ব্যাপী প্রচলিত ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)

ফলে লেখাপড়ার পরিবর্তে সমাজসেবা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই মুখ্য হয়ে ওঠে। চল্লিশের দশকে তিনি অবিভক্ত বাংলায় এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে কিং মেকার হিসেবে খ্যাত হন।

তিনি প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ না করেও ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থান করতেন। দীর্ঘ ১৫ বছর তিনি ফরিদপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ১৯৬২ সালে ঢাকা থেকে 'দৈনিক মিল্লাত' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হুমায়ুন কবির

হুমায়ুন কবির ১৯০৬ সালে ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে কোমরপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কবি, লেখক ও রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি পরিচিত।

১৯২২ সালে তিনি ইংরেজিতে লেটারসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিক, ১৯২৪ সালে প্রথম বিভাগে আই এ এবং ১৯২৬ সালে ইংরেজিতে প্রথম বিভাগে বি এ (অনার্স)

www.pathagar.com

প্রথম এবং ১৯২৮ সালে ইংরেজিতে প্রথম বিভাগসহ ১ম স্থান অধিকার করেন। পরে সরকারি বৃত্তি লাভ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড গমন করেন।

হুমায়ুন কবির

১৯৪৪-৪৬ সালে হুমায়ুন কবির জাতীয় কংগ্রেস দলের সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সেক্রেটারি হিসেবে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তীতে নিখিল ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী হিসেবে তার সুনাম রয়েছে। দর্শন, সাহিত্য ও সমাজতত্ত্বের উপর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর বহু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। নদী ও নারী, স্বপ্নসাধ ও ভারত ও সমাজতন্ত্রবাদ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি বিখ্যাত পত্রিকা 'চতুরঙ্গ'-এর সম্পাদক ও ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ১৮ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুস সালাম খান

আবদুস সালাম খান ১৯০৬ সালে ফরিদপুর জেলার কাশিয়ানী থানার বেজড়া (অধুনা গোপালগঞ্জ জেলায়) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ছিলেন।

তিনি ১৯২৯ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে (অনার্স) এবং ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ এবং ১৯৩১ সালে এল এল বি পাশ করেন। কালক্রমে তিনি ঢাকা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।

তিনি মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকসহ প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী এবং আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। যশস্বী আইনজীবী ও লেখক আবদুস সালাম খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় কৌশলী ছিলেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র শিখা, সওগাত প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

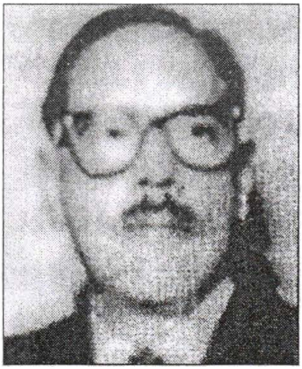

আবদুস সালাম খান

সৈয়দ আবদুর রব

সৈয়দ আবদুর রব ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে গেরদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমাজ সংস্কারক হিসেবে 'খাদেমুল ইনসান সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

সৈয়দ আবদুর রব

এই সমিতির কার্যক্রম ফরিদপুর থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের সর্বত্র অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করে। তিনি অনগ্রসর জাতিকে একতা, শান্তি ও শৃঙ্খলায় পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ছিলেন। ঐসময়ের বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, সমাজ সেবক তার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

অ্যাডভোকেট. শামসুদ্দিন মোল্লা

এ্যাড. শামসুদ্দিন মোল্লা ১৯২১ সালে ফরিদপুর জেলায় ভাঙ্গা থানার পূর্ব সদরদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪১ সালে মেট্রিক, ১৯৪৪ সালে কলকাতার সুরেন্দ্রমোহন

www.pathagar.com

কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৪৬ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। তৎকালীন সময়ের ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত নেতৃবর্গের সংস্পর্শে আসেন।

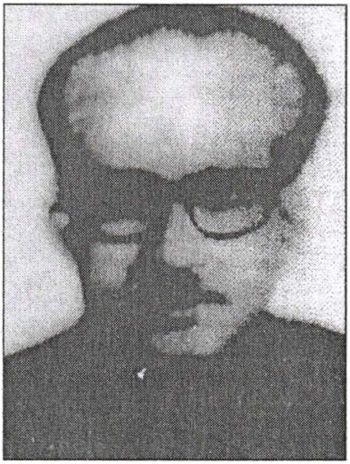

অ্যাড. শামসুদ্দিন মোল্লা

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে সকল আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তার সক্রিয় অবস্থান ছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে এলএলবি পাশ করে আইন পেশায় যোগদান করেন। তিনি ফরিদপুরে বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ৬ দফা আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদেও সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে শান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত 'বাকশাল' এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বৃহত্তর ফরিদপুরের গভর্নর মনোনীত হন। ১৯৯৯ সালের ১০ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কে এম ওবায়দুর রহমান

১৯৪০ সালে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার লস্করদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল জীবন থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ১৯৫৭-৫৮ সালে তিনি বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৫১-৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সম্পাদক এবং ১৯৬১-৬২ সালে সাংগঠনিক সম্পাদক মনোনীত হন। তিনি ১৯৬৩-৬৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৬২-৬৩ সালে তিনি ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।

www.pathagar.com

কে এম ওবায়দুর রহমান

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। পরে তিনি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি জীবদ্দশায় ১০ বছর ৩ মাস বিভিন্ন মেয়াদে কারাবরণ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। বলা বাহুল্য ১৯৯৮ সালে জেল হত্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘ ৩ বছর কারাবরণ করেন।

এস এম নূরুন্নবী

তিনি ভাঙ্গা থানায় জন্মগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অসাধারণ অবদান রাখেন। ঐ সময় তাকে ভাঙ্গা থানার এ্যাডমিনিস্ট্রেটর করে একটি প্রশাসনিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। তিনি সারা জীবন নিঃস্বার্থ রাজনীতি করেছেন। সাধারণ জীবন যাপনে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। তিনি সাদামনের রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত।

চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ

জন্ম ১৯৪০ সালের ৩ মে ফরিদপুর শহরের কমলাপুরে। পিতা পাকিস্তান রাজনীতির মেকার চৌধুরী ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)। তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করেন এবং ঐ সময় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭১-৯৬ এবং ২০০১ সালে যথাসময়ে স্বাস্থ্য ও ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ছিলেন। পরপর ৪ বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী

জন্ম ১৯৩৫ সালের ৮ মে নগরকান্দা থানার গাড়িগ্রামে। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির উল্লেখযোগ্য কর্ণধার। ১৯৫৬ সালে এই দলে যোগদান করেন এবং ১৯৬৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের অধীনে ভারতের গোবরায় মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের পরিচালক ছিলেন। আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারিসহ বিভিন্ন সময়ে ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান সংসদ উপনেতা এবং পূর্বে মন্ত্রী ছিলেন।

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী

প্রকৌশলী খন্দকার মোশাররফ হোসেন

জন্ম ১৯৪০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর সদরের গেরদায় নানা বাড়িতে। পিতা বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব খন্দকার নূরুল হোসেন (নুরু মিয়া)। ১৯৭৩-৮০ সাল পর্যন্ত রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রামের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ও প্রথম প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তিনি পরপর দু'রাব সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রথমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত।

প্রকৌশলী খন্দকার মোশাররফ হোসেন

www.pathagar.com

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফরিদপুরের অন্যান্য ব্যক্তিত্ব

রাজনীতি : অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন অ্যাড. মোশাররফ হোসেন, ডা. কাজী আবু ইসহাক, কাজী সিরাজুল ইসলাম, ইমামউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ হায়দার হোসেন, আবদুর রউফ, শাহ মো. আবু জাফর, কাজী জাফর উল্লাহ, কারানা হোসেন চৌধুরী, অ্যাড. ছরওয়ার জান মিয়া, জহিরুল হক শাহজাদা মিয়া।

সমাজ সেবক : খান বাহাদুর সৈয়দ তোজাম্মেল আলী, খান বাহাদুর মুন্সি মনিরুজ্জামান, ময়েজউদ্দিন বিশ্বাস, রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, খন্দকার নূরুল হোসেন, আবদুল হাকিম, সৈয়দ আব্বাস (মির্জা সাহেব), ওয়াফিজদ্দিন মিয়া, সৈয়দ মোতাহের হোসেন, ওয়াহেদ সর্দার, খান বাহাদুর ও ওয়াহিদুন্নবী, খান বাহাদুর আছাদুজ্জামান, খান বাহাদুর মো. ইসমাইল, রায় বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র, খান বাহাদুর আঃ গনি মিয়া।

কবি-সাহিত্যিক : সূফি মোতাহের হোসেন, আন.ম. বজলুর রশীদ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, আ.ন.ম. আব্দুস সোবহান, সূফী আব্দুল্লাহ আল মামুন, আশরাফ আলী খান, এস.এন.কিউ জুলফিকার আলী, আবদুল লতিফ, রাজিয়া মজিদ, এনায়েত হোসেন, কমলেশ রায়, বাবু ফরিদী, আবু জাফর দিলু, আবদুস সাত্তার গুমানী, আনোয়ার করিম, চারণ কবি আবুবকর সিদ্দিক ভুঁইয়া।

সংগীত ও সংস্কৃতি : ফিরোজা বেগম, আবদুল আহাদ, আসাফউদ্দৌলা, মৃনাল সেন, গৌতম ঘোষ, মাহমুদুন্নবী, অজুত ঘোষ, আবুল খায়ের, আবদুল হক, অমল বোস, নূরুদ্দিন, মেঘু বয়াতি, কুটি মনসর, ফকির আলমগীর, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাদেক আলী, পাগলা বাবলু, পান্না আহমেদ, ফাহিম হোসেন চৌধুরী, কে.এম রব্বানী, মিহির কর্মকার, প্রাণবন্ধু সাহা, করুণাময় অধিকারী, কালিদাস কর্মকার, নাসির আল মামুন।

পির, সুফি ও সাধক ও আধ্যাত্মিক গুরু : শাহ আলী বোগদাদী, শাহ হানিফ, মো. দুদ্দু শাহ, সৈয়দ ওয়াজেদ আলী, সৈয়দ মোহাম্মদ মায়াদ পির সদস্য খাজা বাবা হাসমতউল্লাহ ফরিদপুরী, শাহ সুলতান আবুল ফজল নকশাবন্দী চন্দ্রপুরী, মওলানা এব্রাহীম মুজাদ্দেদী, মওলানা ইসহাক (ধলামিয়া) হেলালুদ্দিন দরবেশ শাহ, শামসুদ্দীন মুজাদ্দেদী, শ্রী শ্রী জগদ্বন্ধু সুন্দর, শ্রী শ্রী হরিদাস ঠাকুর।

বিশিষ্ট ব্যক্তি : এ এফ মুজিবুর রহমান, আবদুল আজিজ পাহলোয়ান, অ্যাড. রতন আলী চৌধুরী, আলম এম এ কবীর, কবিরাজ সন্তোষ কুমার সাহা, আকবর কবির, সুশীল বালা, ডা. কেশব লল সাহা, আবদুস সোবহান মোল্লা, শামসুল আলম নানা ভাই, ড. মো. আফতাজউদ্দিন, রোকেয়া হহমান কবির, ডা. আবদুস সালাম চৌধুরী, ডা. মোহাম্মদ জাহেদ, এসএম জামান, আবুল বাশার মিয়া, আবদুল করিম মিয়া, আবদুল রহিম মিয়া, আনিসউদ্দৌল্লাহ, মো. শামস-উল-হক, এ.টি.এম. শামসুল হক, মীর নাসির হোসেন, একে আজাদ, এম আজিজুল হক, অধ্যাপক এমএ সামাদ, অ্যাড. সিরাজুল হক, ড. এম এ সাত্তার মওলা, সাব্বির ইবনে ইউসুফ।

www.pathagar.com

ঝ. মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষপট

১৯৪০ সালের 'লাহোর প্রস্তাব' ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্বে'র ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়। প্রতিষ্ঠা লাভ করে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। যদিও বিভিন্ন বিষয়ে লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করায় 'পাকিস্তান' নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্মগত বিষয়ে ভুল থেকে যায়। যা পূর্ববাংলার বাঙালিদের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ করে। তাছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশের দুইপ্রান্তে অবস্থিত দুই অঞ্চলকে শুধু ধর্মীয় কারণে একত্রিত রাখার প্রস্তাবটিই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ধর্মীয় ঐক্য বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত শোষণ-নিপীড়ন আড়াল করতে সক্ষম হয়নি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রভাষা নীতি ও বাঙালিদের ভাষা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় এর নগ্ন প্রকাশ ঘটে। যে কারণে পাকিস্তানের শুরুতেই পূর্ববাংলার জনসাধারণ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে এবং পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর

'মুক্তিযুদ্ধ' বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরব-উজ্জ্বল ঘটনা। ১৯৭১ এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমেই মূলত সূচিত হয় সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক কর্মকাণ্ড, সেই উত্তাল দিনগুলোতে সারাদেশের মতো ফরিদপুর ছিল উদ্দীপ্ত। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভায় জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন। তার ভাষণে বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম" বঙ্গবন্ধু ভাষণের পর ফরিদপুরের অম্বিকা ময়দানে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। নেতৃবৃন্দ কর্মীদেরকে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। পালিয়ে আসা সেনাবাহিনী, ইপিআর এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক লোকদের খুঁজে এনে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বলা হয়। ফরিদপুর স্টেডিয়ামে প্রাক্তন সৈনিক মো. শাহজাহান ও গাজী আবদুল হালিমের নেতৃত্বে যুবক ছেলেদেরকে সামরিক ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নেতৃবৃন্দের নির্দেশে প্রত্যেক থানায় অনুরূপ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়।

২৬ মার্চ সকালে জাতীয় পরিষদ সদস্য ব্যারিস্টার সালাউদ্দিন আহম্মেদ ফরিদপুর জেলার আওয়ামী লীগের অফিসে আসেন। ইমামউদ্দিন আহমেদ, সামসুদ্দিন মোল্লা, মোশারফ হোসেন, এস এম নুরুন্নবী, হায়দার হোসেন, গোলজার আহমেদ দুলাল, নাসিরউদ্দিন মুসা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করেন এবং পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ান। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র সাইক্লোস্টাইল করে শহর ও থানায় থানায় প্রেরণের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া শহরময় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মাইকিং করে প্রচার করা হয়।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক কে এম ওবায়দুর রহমানের নেতৃত্বে জেলা সংগ্রাম পরিষদ ও প্রতিরোধ সমন্বয় পরিষদ সংগঠিত হয়। সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন আদেলউদ্দীন আহম্মদ, শামসুদ্দীন মোল্লা, ইমামউদ্দিন আহমেদ, মোশারফ হোসেন, সৈয়দ হায়দার হোসেন, এস এম নুরুন্নবী, গৌরচন্দ্র বালা, আমিনউদ্দীন আহম্মেদ, ডা. আফতাবউদ্দীন আহম্মদ, মজিবর রহমান খান, ফিরোজার রহমান, কাজী খলিলুর রহমান, লিয়াকত হোসন, আবদুল হাই, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, সফি প্রামাণিক, আয়নাল হক, বামপন্থী নেতা মোখলেছুর রহমান ও ননী মোল্লা।

প্রতিরক্ষা কাজে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মী হিসেবে ছিলেন বিভূতি ঘোষ, বদিউজ্জামান চৌধুরী, কে এম মামুনুর রশিদ, মনোরঞ্জন সাহা, শরীফ আফজাল হোসেন, নাসির উদ্দীন আহমেদ মুসা, শাহ মো. আবু জাফর, সৈয়দ কবিরুল আলম মাও, খন্দকার আতাউল হক, নাজমুল হাসান নসরু, সালাউদ্দীন আহমেদ, সমীর বোস, মোয়াজ্জেম হোসেন বেলা, আবু সাইদ খান, সুলতান উদ্দীন বকু, পীযূষ বন্দোপাধ্যায়, মনতোষ কর্মকার, গোসাই, এ টি এম সোলায়মান, জ্যোতিষ, বিনয়, তপন ও মজনু প্রমুখ এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেতা চিত্ত ঘোষ ও আতিয়ার রহমান। ছাত্রলীগ কর্মী ও সমর্থন গ্রুপের মধ্যে ছিলেন শাহরিয়ার রুমী, হায়দার আলী, খলিফা কামাল, বিপুল ঘোষ, আবুল ফয়েজ শাহনেওয়াজ, হাফিজুর রহমান, সুশান্ত সাহা, আবদুল হালিম, সাইফুল আহাদ সেলিম, সৈয়দ মাসুদ হোসেন, শহীদুল ইসলাম নিরু, মেজবাউদ্দীন নফেল, কাজী সালাউদ্দীন, আবুল হাসেম ও নির্মল। ঐ সময় ঝিলটুলী পাড়ায় শহীদ সুফী ক্লাবের একদল জঙ্গী যুবক যে কোন হামলাকে প্রতিরোধ করতে ছুটে যেত, তারা হলেন- গোলজার হোসেন দুলাল, আশরাফুজ্জামান মজনু, মোজাফ্‌ফর হোসেন মোজাম, খন্দকার সেলিম, মিলন, নিমাই দাস গুপ্ত, আবদুর রহমান বাবলু, রুশিদী, নূর আলম, কাজী মঞ্জু, আমু, আলাউদ্দীন, দীলিপ ও চরকমলাপুরের সেন্টু ও সেলিম। এছাড়া ফরিদপুরের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী, সাহিত্যিক ও ব্যবসায়ী তথা সর্বস্তরের জনসাধারণ প্রতিরক্ষা কাজে সবধরনের সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন। প্রথমদিকে জামাত, মুসলিম লীগ ও পিডিপির জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করে প্রতিরক্ষা কাজে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু পাকহানাদার বাহিনী ফরিদপুরে প্রবেশের পরে এরা পূর্বপথ ভুলে গিয়ে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা গ্রহণ করে।

পরবর্তীকালে যুদ্ধকালীন সময়ে ফরিদপুরের যে সকল ছেলেরা ভারতে গিয়ে এফএফ ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তারা হলেন সালাউদ্দিন মশি, মাসুদুল হক, ডা. রুনু, গোয়ালচামটের আবুল হোসেন, হরেন্দ্র নাথ মানিক, ভোলা মাস্টার, গোসাই, শামসুদ্দীন, আবু বকর, আবুল ফয়েজ শাহনেওয়াজ, মোশাররফ হোসেন, হায়দার আলী, জালাল কাজী, মনু, আনন্দ ও আজাহার আলী। উল্লেখ্য

www.pathagar.com

ঝিলটুলীস্থ জেলা পরিষদ ডাকবাংলায় বসে হাইপাওয়ার বোমা তৈরি করার সময় বিস্ফোরিত হয়ে হরেন্দ্রনাথ কর্মকার মানিকের দুটি হাতের কবজাই সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়।

মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর লোক হিসেবে যারা কাজ করেছেন তারা হলেন: কাজী মঞ্জু, সূর্য, ভদ্রনাথ, মাহবুব খান, মেজবাউর রহমান খান মিরাজ, রওশন, সোলায়মান, পাগলা বাবলু, বিনয় কুমার নাথ, খন্দকার গওহার ও রাজা। নগরকান্দার থানায় স্থায়ীভাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাদের নাম পাওয়া যায়- মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব, কবির, কালামুল্লাহ ও কাশেম, চাঁদহাট এলাকায় ডা. খলিলুর রহমান, চান ফকির, আছমত, খবির মোল্লা, আবদুল হাই প্রমুখ। এরা মুক্তিযোদ্ধা অধিনায়ক আবদুল আজিজ মোল্লার দলের সঙ্গে কাজ করেন।

পাকসেনাদের ফরিদপুরে প্রবেশ

২১ এপ্রিল ১৯৭১ মুহু মুহু মর্টারের শেল বর্ষণ করতে করতে হানাদার বাহিনী ফরিদপুর শহরে প্রবেশ করে। ফরিদপুর স্টেডিয়ামে ক্যাম্প স্থাপন করে। অফিসার ইনচার্জ ছিলেন মেজর বেগ। তারা শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকার হিন্দুবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, বহু লোককে নির্যাতন করে হত্যা এবং বহু মহিলা তাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন। তাদের নির্যাতনের কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করা হলো:

শ্রীঅঙ্গনের হত্যাকাণ্ড

২১ এপ্রিল পাকসেনারা ফরিদপুর শহরে প্রবেশের দিন শহরের প্রবেশ পথে শ্রীঅঙ্গনস্থ জগবন্ধু সুন্দরের আশ্রমে প্রবেশ করে। ইসহাক ও কালুসহ কয়েকজন বিহারী রামদা, ছুরি ও কিরিচসহ পাকসেনাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ঐ সময় আশ্রম প্রাঙ্গণে কয়েকজন সাধু নামকীর্তনে রত ছিলেন। পাকসেনারা তাদেরকে আশ্রমের চালতা গাছের নিচে নিয়ে আসে এবং আটজন সাধুকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। এরা হলো- ক্রীতনব্রত ব্রহ্মচারী, নিদান বন্ধু ব্রহ্মচারী, অন্ধকানাই ব্রহ্মচারী, বন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, ক্ষিতিষবন্ধু ব্রহ্মচারী, গৌরবন্ধু ব্রহ্মচারী, চিরবন্ধু ব্রহ্মচারী ও রবীবন্ধু ব্রহ্মচারী।

ঈশান গোপালপুর সরকার বাড়ি

২ মে পাকসেনারা ফরিদপুর সদন থানার ঈশান গোপালপুর গ্রামের সরকার বাড়ি প্রবেশ করে এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটায়। শিক্ষক তারাপদ ঘোষের বাবা জোগেশ চন্দ্র ঘোষ তার ভাই গৌর গোপাল ঘোষ, উমেশ চন্দ্র দাস, বাবলু ঘোষ, আশুতোষ সরকার, দয়াল কবিত্ব ও বাবলু সরকারসহ ৩৪ জনকে গুলি করে হত্যা করে। একসঙ্গে একই বাড়ির এতগুলো লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনা ফরিদপুরের অন্য কোথায় ঘটেনি।

করিমপুর ব্রিজের যুদ্ধ

ফরিদপুর জেলায় পাকসেনাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের মধ্যে সর্বাপ্রেক্ষা উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হলো করিমপুর ব্রিজের যুদ্ধ। কাজী সালাউদ্দিন এবং হেমায়েত তালুকদারের নেতৃত্বে

www.pathagar.com

তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যশোর সেনানিবাস থেকে আগত পাকসেনাদের করিমপুর ব্রিজের নিকট আক্রমণ করেন। কাজী সালাউদ্দিন ও নৌফেল পাকসেনাদের হাতে বন্ধী হয়ে শহিদ হন। এগারো জন মুক্তিযোদ্ধা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পাকসেনাদের সংখ্যা ছিল ষাট জন।

মোমিন খাঁর হাটের যুদ্ধ

১৪ ডিসেম্বর রাজবাড়ি থেকে পালিয়ে আসা কয়েকজন পাকসেনা ও অর্ধশতাধিক বিহারি চর এলাকা দিয়ে হেঁটে ফরিদপুর শহরের দিকে আসছিল। মুক্তিযোদ্ধারা এ খবর পেয়ে মোমিন খাঁর হাট এলাকায় তাদেরকে অতর্কিত আক্রমণ করেন। প্রায় দুই ঘন্টা উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ চলে, অবশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পাকসেনারা ও বিহারিরা সারেন্ডার করে। এই যুদ্ধে ইউনুছ নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। মিরোজ খান, মাহবুব খান, সোলায়মান, রওশন, মিরাজ ও কাসেমসহ প্রায় ২০ মুক্তিযোদ্ধা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

নগরকান্দা থানা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নগরকান্দা উপজেলায় কতিপয় ব্যক্তিবর্গের অবদান অনস্বীকার্য। তন্মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কে এম ওবায়দুর রহমান ও প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা আবদুল আজিজ মোল্লা এবং চাঁদহাট এলাকাটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছে।

২১ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পাকসেনা কর্তৃক ফরিদপুর শহর অধিকৃত হয়। ২২ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান আলীর নেতৃত্বে সহযোদ্ধা দীপক, দেলোয়ার, গোলাম রসুল, স্বেচ্ছাসেবক সেলিম ও অন্যান্যদের সহায়তায় নগরকান্দা পুলিশ ফাঁড়ি ভেঙ্গে অস্ত্র উদ্ধার করে। উদ্ধারকরণ অস্ত্রগুলি হলো, ২৫টি রাইফেল, ২৭ পেটিজ গুলির বস্তা, ১৬টি স্টিল হেলমেট, ১৪টি বেয়নেট ও কয়েকটি সিভিল গান। পর দিন আবদুল আজিজ মোল্লাকে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করে তার উপর দল গঠনের সব দায়িত্ব প্রদান করা হলো। বলা বাহুল্য আজিজ মোল্লা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন সৈনিক, ১৯৬৭ খ্রি. সেনাবাহিনী হতে অবসর গ্রহণ করেন।

৩০ এপ্রিল প্রায় ৭৫ জন পাকসেনা ভাঙ্গা থানার কতিপয় রাজাকারের সহযোগিতায় নগরকান্দা থানার চর যোশহরদী গ্রামে এসে নবদ্বীপ চন্দ্র কুণ্ডু, মাখন বৈরাগী, কল্যাণেশ্বর রায়, সতীশ্বর রায়, মলিন মাঝি ও রামকৃষ্ণের জামাতাকে গুলি করে হত্যা করে এবং বাবর আলী মাতুব্বরের বাড়িতে গচ্ছিত হিন্দুদের মালামালসহ বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুক্তিযোদ্ধারা এ খবর শুনে পাকসেনাদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে চরযোশরদী রওয়ানা করে। এদিকে পাকসেনারা দ্রুত এলাকাটি পরিবর্তন করায় এ যাত্রা তাদের আক্রমণ করা সম্ভব হয়নি।

৪ মে ৪০ জন মুক্তিবাহিনীর একটি দল নগরকান্দা থানা আক্রমণ করে এবং বিনাবাধায় থানা থেকে ২৫টি সিভিলগান, ১টি রিভালবার, ৩০৩ রাইফেলের গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পাক-দালাল বলে চিহ্নিত থানার সিআইকে গুলি করে হত্যা করা

www.pathagar.com

হয়। নগরকান্দা থানার চাঁদহাটে পাকসেনাদের সঙ্গে পর পর কয়েকদিন যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা ফরিদপুরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফ

২১ মে কিছু সংখ্যক মুজাহিদ বাহিনী জাফর, খোকনসহ কয়েক জন দালাল পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে বেশ কয়েকজন পাকসেনা চাঁদহাটের দিকে আসছে এমন খবর পেয়ে কমান্ডার আবদুল আজিজ মিয়ার নেতৃত্বে ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা ১টি চাইনিজ স্টেনগান মেশিনগান, ১০টি ৩০৩ রাইফেল নিয়ে অতর্কিত তাদের উপর আক্রমণ করা হলে পাকসেনারা মাটিতে শুয়ে পড়ে মেশিন গানের ব্রাশফায়ার করতে লাগলো কিন্তু কিছুতেই টিকতে না পেরে পিছু হটতে থাকে।এক সময় মুক্তিযোদ্ধারা তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। এ যুদ্ধে ৩০ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং প্রখ্যাত রাজাকার জাফরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

৩০ মে বিপুল সংখ্যক পাকসেনা সংঘটিত হয়ে নগরকান্দা এলাকার কোদালিয়া হতে শুরু করে ঈশ্বরদী, ছোট পাইককান্দি, চুড়িয়ার চর, বাগাট প্রভৃতি গ্রামে নিরীহ মানুষের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং হেলিকপ্টারে এসে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার করে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। বিশেষ করে কোদালিয়া গ্রামের জনৈক ছাত্তার মিয়ার পরিবারসহ ১৮ জন মহিলা শিশু প্রাণ দেন।

৩১ মে পুনরায় হানাদার বাহিনী অপারেশন শুরু করে। এ দিন তারা হেলিকপ্টার থেকে ৩ ইঞ্চি মটারের ফায়ার করে এবং হেলিকপ্টার থেকে নেমে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে থাকে। তারা গোয়ালদী, পাইককান্দি, দেলবাড়িয়া, বাগাট, চুড়িয়ার চর, রঘুদিয়া, ঈশ্বরদী, মেহেরদিয়া, পুড়াপাড়া, ঘোনাপাড়া, ব্রাহ্মণডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে। এছাড়া তারা চাঁদহাটস্থ বণিকপাড়া, মুক্তিক্যাম্প আক্রমণ করে এবং চাঁদহাট, কুমারদিয়া গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। এ সকল এলাকায় কয়েকজন নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করে। বলা বাহুল্য, মুক্তিযোদ্ধাদের গাবুরিয়া অপারেশনের প্রতিশোধ নেবার জন্য পাকবাহিনী তৃতীয় দিন নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও অগ্নিসংযোগ ঘটায়। তারা বাগাটে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্যযোগ্য হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ছিল। দু'দিক থেকে বিভক্ত দুটি দল

www.pathagar.com

এ গ্রামটি ঘিরে ফেলে এবং আক্রমণ করে। এ গ্রামের এত লোক মারা হয়েছিল যে, মৃত ব্যক্তিদের কবর দেয়ার মত একজন লোকও ছিল না। সে গ্রামে পথে ঘাটে, ঝোপ-ঝাড়ে শুধু মানুষের লাশ পড়ে ছিল। ৪টি গ্রামে শত শত মানুষ গৃহহারা ও স্বজনহারা হয়েছিল যা মুক্তিযুদ্ধকালীন ফরিদপুর জেলার অন্য কোথাও ঘটেনি। যতদূর জানা যায়, নগরকান্দা থানার অস্ত্র লুট, পুলিশ হত্যা এবং চাঁদহাট এলাকায় প্রত্যক্ষ যুদ্ধে ৩০ জন পাকসেনাসহ বেশ কয়েকজন রাজাকার হত্যাই পাকবাহিনী কর্তৃক অত্র এলাকার গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালানোর মূল কারণ ছিলো। চাঁদহাটের যুদ্ধের ফলাফলে বলা যায়, সুসজ্জিত পাকবাহিনী বুঝতে পারে মুক্তিবাহিনী বলতে একটি দল আছে, যাদেরকে সহজেই দমানো সম্ভব নয়। স্থানীয় জনগণ মুক্তিবাহিনীর উপর আস্থা অর্জন করে এবং অন্যান্য এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা এতে অনুপ্রাণীর হয়। এ যুদ্ধের কমান্ডার আবদুর আজিজ মোল্লার অসীম সাহসএবং বিচক্ষণতার পরি

তালমা অপারেশন

নগরকান্দা থানার প্রবেশমুখে তালমা বাজার যেখানে পাকসেনা সহযোগিদের ক্যাম্প ছিল। ঐ ক্যাম্প অপারেশনের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমান্ডার আজিজ মোল্লা অসুস্থ থাকায় তার ছোট ভাই আওয়ামী লীগ নেতা সোলায়মান আলীকে এ অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা নৌকাযোগে চাঁদহাট থেকে তালমার দিকে রওনা দেয়। ঐদিন তালমার হাটবার ছিল। বিকেল নাগাদ দুই দলে বিভক্ত হয়ে তালমা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আলতাফ, জাফর ও রশিদ এ দল পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, অন্য দলে ছিলেন হানিফ ও শাহজাহান। জাফর হাটে নেমে গিয়ে রাজাকারদের অবস্থান জেনে নৌকায় ফিরে আসে। মাগরিবের নামাজের শেষে মেশিন গানের সাহায্যে আক্রমণ করা হয়। প্রায় ২০ মিনিট সময় অপারেশন চলে। এ অপারেশনে ৮ জন রাজাকার মৃত্যুবরণ করে।

খান্দারপাড়া অপারেশন

তালমা অপারেশনের পর কমান্ডার আবদুল আজিজ মোল্লার নেতৃত্বে খান্দারপাড় এলাকার কুখ্যাত পাকসেনা সহযোগী খালেক মুন্সীর বাড়ি অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খালেক মুন্সীর বাড়িতে উপস্থিতি জেনে খান্দারপাড় হাটের দিন সন্ধ্যায় তার বাড়ি অপারেশন করা হয়। খালেক মুন্সী পালিয়ে প্রাণ রক্ষা পায়, পক্ষান্তরে তার অপর দু'জন সহযোগী নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা খালেক মুন্সীর বাড়ি জ্বালিয়ে দেন। এ অপারেশনের ফলে কুখ্যাত খালেক মুন্সী এলাকা থেকে পালিয়ে গোপালগঞ্জস্থ পাকসেনাদের ছাউনিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্থানীয় হিন্দু মুসলমান তার অত্যাচার থেকে রেহায় পায়।

নগরকান্দা থানা আক্রমণ ও দখল

পাকহানাদার বাহিনী ও স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় নগরকান্দা থানায় যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নগরকান্দা থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যদিও প্রথম দিকে থানা আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল

www.pathagar.com

না। কিন্তু থানার নিকটবর্তী মিরাকান্দা গ্রামে এক রাজাকার বাড়ি আক্রমণ করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান ধৃত হয় এবং থানায় নিয়ে দারোগার হুকুমে তাকে হত্যা করা হয়। ঈদ-উল-ফিতরের দিন মুক্তিফৌজ বাহিনী ঈদের নামাজ পড়ে কাইচাইল ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছিল এমন সময় খবর আসে পাকসেনারা কাইচাইল গ্রামের উত্তরপাড়ায় অগ্নিসংযোগ করেছে এবং নিরীহ মানুষদের হত্যা করছে। সঙ্গে সঙ্গে কমান্ডার আবদুল আজিজ মোল্লা তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকসেনাদের আক্রমণ করেন। দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়।

পাকিস্তানি সেনারা বেশিক্ষণ টিকতে না পেরে নগরকান্দা ফিরে আসে। জানা যায় পরবর্তীতে পাকসেনারা ফরিদপুর ফিরে যায়। এমতাবস্থায় কমান্ডার আলতাফ খান, হামিদ জমাদার, বাদশা ও বড় আবুর নেতৃত্বে দলটিকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায়, হাবিলদার মানিক কাজির কমান্ডে একটি দল উত্তর কাইচাইল, সুবেদার আবদুল জলিলের কমান্ডে একটি দল ঈশ্বরদী গ্রামে, হামিদ জমাদারের কমান্ডের দল লস্করদিয়া অবস্থান করে।

আলতাফ খান ডিফেন্সে থাকবে এবং কমান্ডার আবদুল আজিজ মোল্লা সঠিকভাবে দলগুলোকে দিক নির্দেশনা দেবেন। পাকসেনারা কুমার নদ পাড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই আফতাফ খানের দল মেশিগানের ব্রাশ ফায়ার চালায়। হঠাৎ আক্রমণ করায় কয়েকজন মারা যায় এবং বাকিরা নদীতে ঝাঁপ দেয়। কেউ কেউ সাঁতার কেটে নদী পাড় হয়ে গ্রামের দিকে গমন করে।

মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ঘিরে ফেলে। এ যুদ্ধে হাবিলদার আবদুল বারিক শহিদ হন। এরপর সন্ধ্যার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা নগরকান্দা থানা আক্রমণ করেন। দু'পক্ষের মধ্যে বিরামহীন যুদ্ধ চলে।

তিন চার ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। মুক্তিযোদ্ধারা ঐদিনের মতো ফিরে আসে। পরদিন রাতে পুনরায় সংঘটিত হয়ে থানা আক্রমণ করে পুলিশ ও রাজাকাররা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। দুপুরের দিকে আলতাফের দল পশ্চিম দিক থেকে থানায় ঢুকে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে থানার পুলিশ ও রাজাকাররা আত্মসর্মপণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা থানা দখল করে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। নগরকান্দা থানা দখলের পর পাকসেনারা ভাঙ্গা, সদরপুর, দিগনগর হতে ক্যাম্প গুটিয়ে ফরিদপুর চলে আসে। ফরিদপুর শহর, কামারখালী ও রাজবাড়ী ব্যতীত সমগ্র ফরিদপুর মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

নগরকান্দা থানার কোদালিয়া গ্রামে আবদুল সাত্তার মিয়ার বাড়ির হত্যাকাণ্ড

কোদালিয়া গ্রামে পাকসেনাদের প্রবেশ করার কথা শুনে গ্রামের পুরুষ লোকেরা অন্যত্র পালিয়ে যায়। এই গ্রামের আবদুস সাত্তার মিয়ার পরিবারের মহিলারা একটি জঙ্গলে পলায়নরত অবস্থায় পাকসেনাদের দ্বারা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। নিহতদের মধ্যে আকরামুনেছা, তৈয়বুন্নেছা, হেলেনা, রুবি বেগম, বেনু বেগম, ঝিলুর মা সহ ২১ জন মহিলা ছিলেন।

www.pathagar.com

ফরিদপুর জেলায় গণহত্যার উল্লেখযোগ্য স্থান

ধোপাডাঙ্গা, চাঁদপুরের দুর্লভ সাহার বাড়ি, কানাইপুরের শিকদারবাড়ি, ফরিদপুরের ডাঙ্গিভাঙ্গি গ্রামের হিন্দু বাড়ি, পিয়ারপুর গ্রামের হিন্দু বাড়ি এবং মাচ্চর ইউনিয়নের হিন্দু পরিবার চর যশোরদী, চর বালুধাম, ইশান গোপালপুর সরকার বাড়ি, ডাংগার জানদি গ্রাম, ইশ্বরদি, মালা, বোয়ালমারী ও মধুখালীর কিছুএলাকা।

আলফাডাঙ্গা থানা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার খবর ২৬ মার্চ আলফাডাঙ্গা থানার আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাবিবুর রহমান সর্দার থানাময় প্রচার করেন। এ খবর বিদ্যুৎ গতিতে আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যায় কিন্তু প্রথম এ খবর কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। অবশ্য ২৮ মার্চ রেডিও মারফত জানা যায় বাঙালিরা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

৫ এপ্রিল পুলিশের হাবিলদার কাজী আবুল খায়ের যশোরে হানাদার বাহিনীর রোষানল থেকে রক্ষা পেয়ে গোপালপুর প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শ'খানেক স্থানীয় যুবক শ্রেণিকে বাঁশের লাঠি ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে সামরিক ট্রেনিং দেন। তাঁর সঙ্গে আদম আহম্মেদ খান ও ওয়ালিয়ার রহমান খান এ ট্রেনিং এ নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে প্রতি গ্রাম এক একটা গেরিলা সেন্টারে পরিণত হয়। এ দিকে গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়া ক্যাম্প থেকে পাকসেনারা মাঝেমধ্যে আলফাডাঙ্গা থানার বিভিন্ন গ্রামে এসে অত্যাচার চালায় এবং হিন্দুবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় বোয়ালমারী থানার মাইটকুমরা গ্রামের জলিল বিশ্বাসের গ্রুপ আলফাডাঙ্গা থানা থেকে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আক্রমণ চালায়। থানার দারোগা আমজাদ হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়।

আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী, কাশিয়ানী ও লোহাগাড়া থানায় বিভিন্ন হাটবাজারে প্রচার করা হয় যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তিবর্গ, ইপিআর, পুলিশ, আনসার এর লোকজনকে লোহাগাড়া ক্যাম্পে অবিলম্বে যোগদান করতে হবে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে দলে লোকজন ক্যাম্পে আসতে থাকে। এ সময় যারা লোহাগাড়া ক্যাম্পে ছিলেন তাঁরা হলেন নুর মোহাম্মদ মিয়া, অধ্যক্ষ ওয়াহিদুর রহমান, শ. ম. আনোয়ার, আসাদুজ্জামান, রাধারমন বাবু, অজয় মজুমদার, শেখ ওয়ালিয়ার রহমান, ডা. সত্যেন আদিত্য, এ্যাড. মকদুল হোসেন প্রমুখ। ওয়াহিদুর রহমান ও অজয় মজুমদারের নেতৃত্বে নড়াইল ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ আনায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়। একজন আনসার এ্যাডজুটেন্ট ও সিআই তাদেরকে সহায়তা করেন। পাকসেনারা ওসিআইকে হত্যা করে। ভারত থেকে ৭ জনের একটি দল আলফাডাঙ্গার গোপালপুরে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগদেন। এ ৭ জনের মধ্য ছিলেন খান নবীর আহম্মেদ, তবিবুর রহমান, খান নাজির আহম্মেদ, মো. সেকান্দার আলী, মো. কাওসার রহমান, জাহাঙ্গীর আলম ও সিদ্দিকুর রহমান। এ দল সর্বপ্রথম নোয়াপাড়া উপেন স্বর্ণকারের বাড়ি আক্রমণ করেন। কেননা এ বাড়িতেই পাকিস্তান

www.pathagar.com

সমর্থক পিস কমিটির নাজেম, রাজবাড়ির নাসির, আলফাডাঙ্গার উকিল উদ্দিন ও নোয়াপাড়ার সরোয়ার মিয়া রয়েছে। মুক্তিবাহিনী প্রথমেই উকিলকে হত্যা করে। নাসির রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। সহস্রাইল রেল-স্টেশনে সরোয়ারজান মিয়াকে হত্যা করা হয়।

লোহাগাড়া থানার মাকড়াইল নিবাসী জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে ১০৪ জনের একটি দল ভারতে ট্রেনিং গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। অপর একটি দল হেমায়েত উদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে ভারত গমন করে।

মাসাধিককাল সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অস্ত্র গোলা বারুদসহ খান আবদুর হালিম, মনিরুজ্জামান, খান আসাদুজ্জামান এর নেতৃত্বে আলফাডাঙ্গা ফিরে আসেন। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে কাশিয়ানী থানার ভাটিয়াপাড়া থেকে পাকবাহিনীর এক বিশাল দল আলফাডাঙ্গা আক্রমণ করে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের না পেয়ে গ্রামবাসীদের প্রচণ্ড রকম মারধর ও লুটপাট করে। ঘিদহের সদানন্দ ভক্ত ও মনোহর ভক্তসহ বেশ কয়েকজনকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনী একত্রিত হয়ে একটি দল গঠন করা হয় এবং আলফাডাঙ্গার গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হেড কোয়ার্টার করে ৩টি সেক্টরে গঠন করা হয়। এ সেক্টর গুলো হলো ইউপি মেম্বার আবদুল হকের বাড়ি, পানাইল মাদবরের বাড়ি ও শুকরহাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এক এক সেক্টরে ৪৩ জন এবং হেড কোয়ার্টারে ৭২ জন ভাগ করা হয়।

ক্রমান্বয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পবন বেগের সেক্টরে কমান্ডার খান, আসাদুজ্জামান টুনু, পানাইল সেক্টরের কমান্ডার খান, আবদুল হালিম, শুকুরহাটা সেক্টর কমান্ডার তবিবর রহমান। দুই সেক্টর নিয়ে একটি জোন গঠিত হয়। জোনের চিফ কমান্ডার আবদুর রাজ্জাক মিয়া। জোন কমান্ডার আকরামুজ্জামান, হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার ও হামিদুর রহমান।

৬ সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী কর্তৃক লাহুড়িয়া নকশাল ঘাটি আক্রমণ করা হয় এবং নকশাল নেতা বাদশা জমাদারকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। পাকবাহিনী দুর্ভেদ্য ভাটিয়াপাড়াস্থ ওয়ারলেস ঘাটি ৫ নভেম্বর আক্রমণ করে প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হয়।

পাকিস্তানি বাহিনী তাদের নিশ্চিত পরাজয় জেনে তাদের বিমান বাহিনীকে খবর পাঠায়। অতর্কিতভাবে ২টি বিমান প্রায় ৪৩ বার ভারী মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে। এ যুদ্ধে ১৩ জন শহিদ হন, ১০ জন আহত হয়। শহিদ মুক্তিযোদ্ধারা হলেন জাফর (গোপালপুর), জাহাঙ্গীর (চরডাঙ্গা), রওশন ওরফে সামাদ (কমান্ডার) তবিবুর (কমান্ডার), মমিন (মহিষার ঘোপ), সোলায়মান (কৃষ্ণপুর), ঈমানউদ্দীন (বেড়াদি), তহিদুর (মধুখালী), হাসান (পানাইল জমিদান বাড়ির জামাতা)।

মুক্তিবাহিনী প্রতিশোধ নেবার জন্য ভারত থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা (লোহাগাড়া, কাশিয়ানী, আলফাডাঙ্গা) সম্মিলিতভাবে সুসংগঠিত হয়ে বিপুল উদ্যেমে ১১ নভেম্বর ভাটিয়াপাড়া ঘাটি দখলের চেষ্টা চালায়। আলফাডাঙ্গা থানার মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনায় দায়িত্বে ছিলেন ইপিআর নায়েক সুবেদার জসিমউদ্দিন জাকের (লোহাগাড়া নিবাসী)।

www.pathagar.com

দু'পক্ষের মধ্য বিপুল গোলাগুলি হয়। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে তা কেউ জানেনা। ১৮ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী লে. কমল ও ক্যাপ্টেন সিদ্দিকুর সম্মুখ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দু'পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। হঠাৎ রাতের অন্ধকারে একটি গুলি এসে কমলের চোখে লাগে তিনি মারাত্মক আহত হন। তাকে মিত্রবাহিনী ঘাটিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ক্যাপ্টেন সিদ্দিকুর রহমান মাইকিং করে পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ করতে ঘোষণা করেন। পাকসেনাদের কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেয়। অবশেষে আত্মসমর্পণ করে।

ভাঙ্গা থানা

১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর ভাঙ্গা থানায় অবস্থানরত পাকসেনাদের ক্যাম্প আক্রমণের জন্য মুক্তিফৌজ কমান্ডার আবদুল আজিজ মোল্লা এবং তার সহযোদ্ধাগণ ৬ ডিসেম্বর কাইচাইল ইউনিয়নের সুতারকান্দার শুকুর মোল্লার বাড়িতে এক পরামর্শ সভার আহ্বান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাঝিকান্দার কমান্ডার হামিদ জমাদার, ভাঙ্গার কমান্ডার বড় আবু, ফরিদপুর সদর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম নুরুন্নবী।

সিদ্ধান্ত হয় যে, নগরকান্দা থানার অন্যান্য মুক্তিফৌজ ও এফ এফ দল এবং ভাঙ্গার অন্যান্য এফ এফ কমান্ডার ছোট আবু, ছালাম ও ডেপুটি কমান্ডার আবদুল জব্বার, আবদুল খালেক ও সুবেদার আবদুল রাজ্জাক সিকদারের নেতৃত্বে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একযোগে ভাঙ্গা থানা চারদিক থেকে আক্রমণ করা হবে।

৮ ডিসেম্বর চারদিক থেকে ভাঙ্গা থানা আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে এমন সময় খবর আসে পাকসেনারা হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ পেয়ে তাদের ঘাটি গুটিয়ে ফরিদপুর চলে যাচ্ছে। বিনা রক্তপাতে মুক্তিযোদ্ধাগণ ভাঙ্গা উপস্থিত হন এবং বিজয় উল্লাস করেন। এরপর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারগণ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভাঙ্গা ডাকবাংলায় এক জরুরি সভায় বসেন।

কমান্ডার বড় আবুর প্রস্তাব এবং সকলের সমর্থনে এসএম নুরুন্নবীকে ভাঙ্গার এ্যাডমিনিস্ট্রেটর করে একটি প্রশাসনিক কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন সর্বজনাব এ আর ভূঁইয়া, এ্যাড. আসাদুজ্জামান, ডা. হাবিবুর রহমান, আবদুর রাজ্জাক সিকদার, কমান্ডার বড় আবু, কমান্ডার ছোট আবু ও আবদুর জব্বার।

ভাঙ্গা থানার জানদী গ্রামের হত্যাযজ্ঞ

১৯৭১ সালে হানাদার পাকসেনা কতিপয় রাজাকার বাহিনীর সমন্বয়ে ভাঙ্গা থানার জানদী গ্রামে নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ ঘটায়।

ভাঙ্গা থানার পার্শ্ববর্তী নুরপুর গ্রামে টনিক সেন নিজ গ্রামে নিরাপত্তার অভাবে পরিবার পরিজন, ভাই, ভাতিজাসহ পার্শ্ববর্তী জানদী গ্রামে এক হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ থানার কুখ্যাত রাজাকার এমদাদ কাজী, হারুন মেম্বার ও টনিক সেনের গাড়ির ড্রাইভার একদিন ১৫-২০ জন পাকসেনাসহ অতর্কিত ঐ বাড়িতে আক্রমণ করে বিমল সেনের বাবা ডা. উপেন্দ্র নাথ সেন, ফুটবলার সুকেশসহ ১৭ জন হিন্দু পুরুষ লোককে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে।

www.pathagar.com

যদিও বাড়ির মহিলারা তাদের বাঁচানোর জন্য পাকসেনাদের হাতে পায়ে ধরে জীবন রক্ষার জন্য আকুতি-মিনতি করেছিল কিন্তু পাকসেনারা এদিকে কর্ণপাত না করে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করে।

মধুখালী থানা

মধুখালী থানার চন্দনা বারাসিয়া নদীর পাশে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে পাকসেনা ও তাদের সহযোগী রাজাকার আলবদর বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ডেপুটি কমান্ডার নাজমুল হাসান নসরু এ যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবর আসে পাকসেনা ও রাজাকার আলবদর বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত ২০-২৫ জনের একটি দল মালামাল লুট করে চন্দনা-বারাসিয়া নদীর কূল ঘেষে কামারখালীর দিকে হেটে যাচ্ছে; তখন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল সংঘটিত হয়ে গুলির রেঞ্জের মধ্যে আসা মাত্রই এমবুস করে।

পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে থাকে। অপর দিকে মধুখালী থেকে আসা কয়েকজন মিলিশিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের শিকার হয়। উভয়ের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ গুলি বিনিময় হলে পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করে। তাদের নিকট থেকে মুক্তিযোদ্ধারা তিনটি চাইনিজ রাইফেল উদ্ধার করে। আফজাল নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি মিলিশিয়াকে দা দিয়ে কুপিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে চন্দনা-বারাসিয়া নদীতে ফেলে দেয়।

এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে মধুখালী ক্যাম্প থেকে বেশ সংখ্যক পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত করার জন্য ঘটনাস্থলে আসে কিন্তু কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে না পেয়ে স্থানীয় বাড়িঘর অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়। চন্দনা-বারাসিয়া যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন নাজমুল হাসান নসরু, আবুল হোসেন, নান্নু ও জয়পাশার সিদ্দিকসহ বারজন মুক্তিযোদ্ধা।

বোয়ালমারী থানা

১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর বোয়ালমারী থানার নতুবদিয়া বাজার ক্যাম্প আক্রমণের জন্য পাকিস্তানি সেনারা সেনারা আসছে, এ সংবাদ জানা মাত্র ৩৩ জন মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে আসে করিমপুর সেতুর দিকে। দুভাগে বিভক্ত হয়ে উক্ত ৩৩ জন মুক্তিযোদ্ধা দু'দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। এর একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন আলফাডাঙ্গা থানার হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার এবং অপর গ্রুপের নেতৃত্ব দেন ফরিদপুর শহরের কাজী সালাহ উদ্দিন।

ধোপাডাঙ্গা চাঁদপুর এলাকায় বেলা ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত দু'শতাধিক পাকিস্তানি সেনারা সেনার বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে কাজী সালাউদ্দিন শহিদ হওয়ায় ঐ মুহূর্তে দলের নেতৃত্ব দেন ডা. এমরান মজুমদার রুনু। যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর মেজর মফিজসহ ৪৯ জন পাকিস্তানি সেনারা সেনা মৃত্যুবরণ করে এবং ১১

www.pathagar.com

জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। এ যুদ্ধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সাতজন হলেন—কাজী সালাউদ্দিন, নওফেল, ওহাব, মজিবর, আউয়াল, সোহরাব ও আদেল। যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত অস্ত্রের মধ্যে ছিল ২টি টিএসএমজি, ৩টি টিএসএলআর, ১টি পিস্তল, ১টি বন্দুক ও ৮টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন, হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার, ডা. এমরান মজুমদার রুনু, শামসুদ্দিন আহমেদ, আমিনুর রহমান ফরিদ, ইদ্রিস মোল্লা, আতাহার হোসেন খান, কাজী ফরিদউদ্দীন, মেজর মাহতাব, নায়েক দেলোয়ার, আলী আকবর হোসেন, সোহরাব, মোবারক মোল্লা প্রমুখ।

বাখুণ্ডা সেতু ধ্বংস

ফরিদপুর-বরিশাল তথা দক্ষিণবঙ্গের মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ বাখুণ্ডা সেতু। এই সেতুটি কুমার নদের উপর ষাটের দশকে নির্মাণ করা হয় প্রথমবার এই সেতুটি ধ্বংস করার জন্য ৭৫ পাউন্ড বিস্ফোরণ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হন। পরে ২০ শে অক্টোবর দিবাগত রাতে মুক্তিযোদ্ধারা দ্বিতীয় বার চেষ্টা করে ব্রিজটি ধ্বংস করে। এবারে ১৫০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করা হয়। বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন এলাকার ৫জন মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। তবে ১৩ জন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নেতৃত্বে ছিলেন মীর আকতার ও মোহাম্মাদ আলী।

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

মুন্সি আবদুর রউফ (১৯৪৩-১৯৭১), বীরশ্রেষ্ঠ। সালামতপুর, মধুখালী, ফরিদপুর।

সাহাবইদ্দিন আহমেদ (১৯৪৮-) বীরউত্তম। চরকমলাপুর, ফরিদপুর সদরপুর ফরিদপুর।

খন্দকার নাজমুল হুদা (১৯৩৮-), বীর বিক্রম। কোদালিয়া নগরকান্দা ফরিদপুর।

মোহাম্মাদ আবদুল মান্নান (১৯৪০), বীর বিক্রম। চান্দড়া (চান্দ্রা), আরফাডাঙ্গা, ফরিদপুর।

শেখ আজিজুর রহমান (১৯৪২-) বীর প্রতীক। ডুমাইন, মধুখালী, ফরিদপুর।

সিপাহী আবদুল ওয়াহিদ (১৯৪৮) বীর প্রতীক। তেলজুড়ি, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

নজরুল ইসলাম (১৯৫১-) বীর প্রতীক। পানাইল, আলফাডাঙ্গা ফরিদপুর।

শহিদ ও হত্যাকৃতদের সংখ্যা শহিদ : ৫০ জন (ফরিদপুর বাসষ্ট্যান্ডের তালিকা)। হত্যাকৃত সংখ্যা : শ্রী অঙ্গন (ফরিদপুর প্রথম হত্যাযজ্ঞ) ৮, চরযশোরদী-৭, ঈশান গোপালপুর-৩৪, জানদি-৩১, বৈদ্যডাঙ্গী ও ভাংগী-ডাঙ্গী-২০০ (?), হাসাসদিয়া-৪, কানাইপুর শিকদার বাড়ি-১৮, খরসমৃতি গসাইলবাড়ি-৮, গুন. কামার গ্রাম,শিরগ্রাম,চতুল-৫০, গৃজনা-১৩, কোমারপুর-৩, মালাগ্রাম-৭, আলফাডাঙ্গা-৫০, চরবালুধাম-১৯, মাচ্চর-২০, ধোপাডাঙ্গা-৫, রথখোলা-২ করিমপুর ব্রিজ-৭, বারাশিয়া-৪, নগরকান্দা খেয়াঘাট-১, নওপাড়া-৩।

গণকবর : ফরিদপুর স্টিডিয়াম, গোয়ালচামট হাউজিং স্টেট।

www.pathagar.com

স্মৃতিফলক : ফরিদপুর স্টেডিয়ামের পাশে নির্মিত

www.pathagar.com

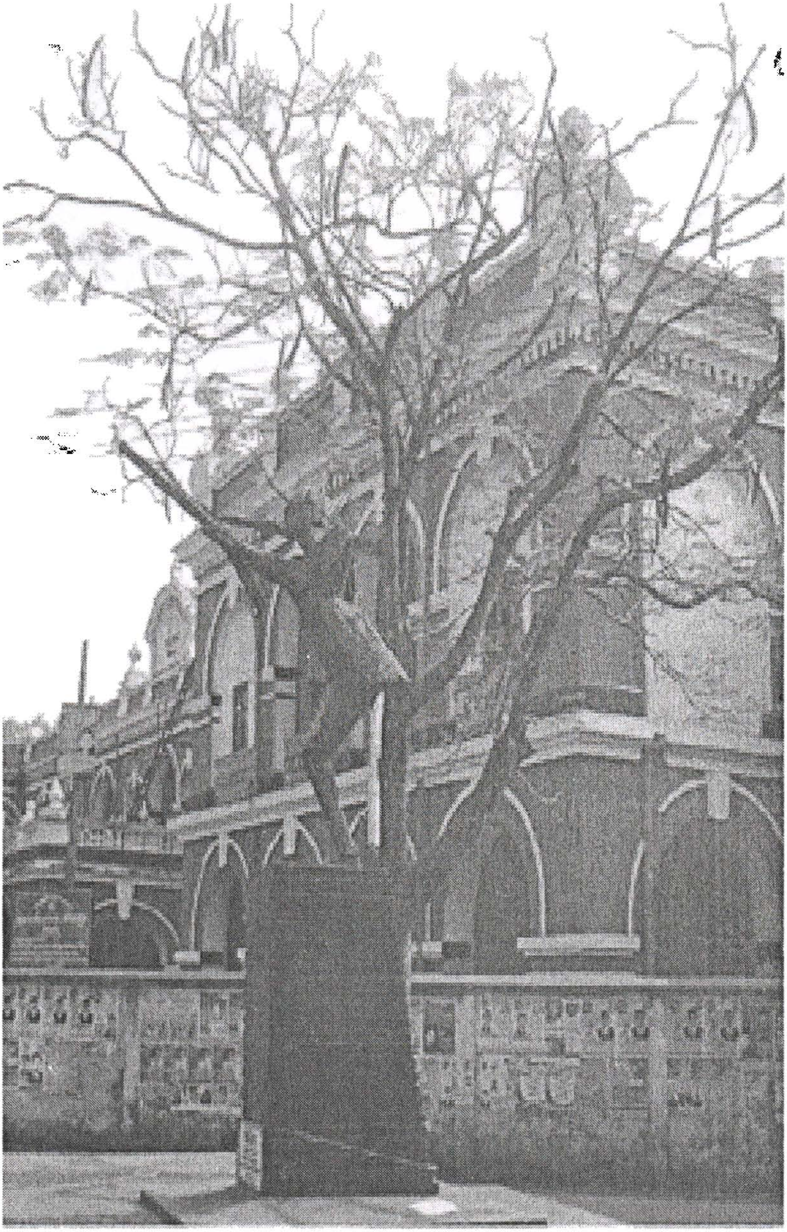

স্বাধীনতা ভাস্কর্য : ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার সামনের চত্বরে নির্মিত

www.pathagar.com

ফরিদপুর পাকিস্তানি সেনারা সেনাদের আত্মসমর্পণ

১৭ ডিসেম্বর ফরিদপুর পাকিস্তানি সেনারা সেনা মুক্ত হয়। ঐদিন মুক্তিযোদ্ধারা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বাখুন্ডা বাজারে উপস্থিত হয়ে মিছিল সহকারে বিজয় বেশে ফরিদপুর শহরে প্রবেশ করেন। ফরিদপুর পুলিশ লাইনে বিকাল ৪ টায় পাকিস্তানি সেনারা সেনারা লেফটেনেন্ট জামাল চৌধুরীর নিকট আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পন করে। উল্লেখ্য ফরিদপুর অঞ্চল ৮নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার দায়িত্বে ছিলেন এম এ মঞ্জুর পরে আবু ওসমান চৌধুরী।

মুজিব বাহিনী

বাংলাদেশকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে চার উপ-প্রধানের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা হয়। ফরিদপুরসহ বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও পাবনা জেলা তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে ন্যস্ত করা হয়। ফরিদপুরের মুজিব বাহিনীর প্রধান করা হয় শেখ শহীদুল ইসলামকে, উপ-প্রধান করা হয় শাহ্ মোঃ আবু জাফর ও মো. শাহজাহান সরদারকে।

ফরিদপুর সদর মহকুমার মুজিব বাহিনীর প্রধান ছিলেন সৈয়দ কবিরুল আলম মাও। তিনি ৬০ জনের একটি মুজিব বাহিনীর দল গঠন করেন। মুজিব বাহিনী গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল Politically motivated and educated cadre তৈরি করা এবং দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত সংগ্রহ করা ও দেশের অভ্যন্তর হতে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ফরিদপুরের কয়েকজন প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযোদ্ধা অধিনায়ক আবদুল আজিজ মোল্লা, শহিদ হাবিলদার আবদুল বারিক, কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন, শাহ্ মো. আবু জাফর, মো. সোলায়মান আলী, হাবিলদার আ. জলিল বিশ্বাস, লুৎফর রহমান, নূর মোহাম্মদ ক্যাপ্টেন বাবুল, নাজমুল হাসান নসরু, আবুল ফয়েজ শাহ্ নেওয়াজ প্রমুখ।

ফরিদপুরের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক

কে এম ওবায়দুর রহমান, সামসুদ্দিন মোল্লা, ইমামউদ্দীন আহমেদ, হায়দার হোসেন, এস এম নুরুন্নবী, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

ঞ. বিশিষ্ট লোককবি ও সাধক

মরমি সাধক মেছের শাহ

মেছের শাহ ফকির। পিতা মনিরুদ্দিন কারিকর। পিতামহ-ফেদুসা দেওয়ান। নিম্ন-মধ্যবর্তী পরিবারে জন্ম। মেছের শাহের জন্মস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য আজও অজ্ঞাত। তার পরবর্তী নিবাস ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানাধীন মাসাউজান গ্রামে। ফরিদপুর জেলা সদর থেকে এর দূরত্ব ১৮ কি. মি.। তার পূর্ব পুরুষের আদি নিবাস এই জেলার সদরপুর থানার কোনো এক চরে। সে স্থানটি পদ্মা আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গনে পতিত হলে মেছের শাহের পূর্ব পুরুষরা মাসাউজান গ্রামে স্থানান্তরিত হন।

www.pathagar.com

তাঁর জন্ম ১২৪৭ মতান্তরে ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুন। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে ১২৪৭ বঙ্গাব্দকেই ধরা হয়। তিনি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ৭৬ বছর বয়সে মৃতবরণ করেন। শৈশবে মেছের শাহ ধর্মপরায়ণ ও গীতিবাদ্যের অনুরক্ত ছিলেন। শৈশবে পিতার মৃত্যু হলে আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্শ্ববর্তী রামনগর গ্রামের বিশিষ্ট সাধক খোশাল চাঁদ দরবেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পিরের ছিলছিলার প্রথমেই হযরত মুহম্মদ (স.) পরে হযরত আলী (রা.) ও সর্বশেষ খোশাল চাঁদ দরবেশ। মেছের শাহ এই ছিলছিলার ৩১ অধঃস্তন পুরুষ। নিজ গ্রাম মাসাউজানের এক ভক্তের মেয়েকে প্রথম বিবাহ করেন। একপুত্র ও এক কন্যার জন্মের পর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। নারায়ণপুরে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এই ঘরে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তার পুত্রের নাম আনেচ আলী। যিনি চিশতিয়া তরিকাধীন একজন মরমি সাধক ও লোককবি হিসেবে এতদঞ্চলে পরিচিত ছিলেন। "তত্ত্বজ্ঞানভাণ্ডার" নামে তাঁর একখানি মরমিগানের পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। মেছের শাহের আখড়া ছিল নগরকান্দা থানাধীন কুমার নদের পশ্চিম তীরে রসুলপুর হাট সংলগ্ন মদন কারিকরের বাড়িতে। ফরিদপুর জেলা সদর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৭ কি. মি.। মৃত্যুাবধি মেছের শাহ এ বাড়িতেই পুত্র ও পুত্রবধূর সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর পর এখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। বর্তমানে আম কাঁঠাল বৃক্ষশোভিত বাগানে মেছের শাহের মাজার রয়েছে।

মেছের শাহ সাদা তহবন ও সাদা পাঞ্জাবি পরিধান করতেন। কাঠের বৈলাওয়ালা খড়ম পায়ে দিতেন। মাথায় পাগড়ি পড়তেন। একতারা বাজিয়ে আসরে গান গাইতেন। মাথায় লম্বা বাবরি চুল ছিল, মুখে ছিল শুভ্র দাঁড়ি।

অসংখ্য শিষ্য মুরিদানের মধ্যে জনৈক তাহের শাহ অন্যতম শিষ্য ছিলেন। শেষ বয়সে মেছের শাহ পিরের ভূমিকা গ্রহণ করে অনেককেই মুরিদ করেছিলেন।

পাঞ্জু শাহ, যাদু, বিন্দু শাহ, তিনু শাহ, আহম্মদ ফকির, পাঁচু ফকির, চাঁদ হায়দার শাহ, বাউল চাঁদ ফকির, কিতাব্দি ফকির, কোছেকাওড়া, মুন্সি বাছের, নৈমদ্দিন ফকির ও পরশ ফকির।

মেছের শাহ প্রায় পাঁচ শতাধিক গান রচনা করেছিলেন। তাঁর সত্যধর্ম মারুফতে এছলাম নামক মুদ্রিত একখানা কিতাব পাওয়া গেছে। তাঁর হস্তলিখিত দুটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়েছে।

বিখ্যাত পদ

১. মানব দেহের বেদ জেনে করো সাধনা।
২. সে যে চিন্ময় চৈতন্য স্বরূপ।
৩. মুর্শিদ বিনে জীবের গতি কি আছে।
৪. আকার ছাড়া জীবের ভজন কি আছে।
৫. দেখো হাতের কাছে আছে মানুষ।
৬. দিব্যজ্ঞানীর সাধ্যকর দেখবি মানুষ কোথায় রয়।
৭. ভক্তি না হলে মওলার দিদার কি মেলে।
৮. আশেক যারা খোঁজে বটে সাঁই দরদীর নিঝুম ঘরে।
৯. মূলছাড়া আছে মানুষ বেদ বিধির উপরে।
১০. কোন হরফে কি ভেদ আছে ডুবে দেখতে হয়।

www.pathagar.com

দীর্ঘতম পদ

১. একলা এলো মালেক সাঁই (১০০ লাইন)।
২. নড়িতে বেষ্টিতে দেহ জীবের শরীর (৯২ লাইন)।
৩. যে প্রেমের ভাব জেনেছে (৬১ লাইন)।
৪. পহেলা নাফ নফসের আদিস্থান (৪৩ লাইন)।
৫. গন্দম কাহারে বলে জানো কি কারণ (৪২ লাইন)।

সতীশ গোঁসাই

সতীশ গোঁসাই ১৮৮৬ সালে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার খামারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অগ্রগণ্য লোককবি ছিলেন। গ্রাম্য স্কুলে সামান্য লেখাপড়া শিখে ফরিদপুর শহরের টেপাখোলার কোনো এক সওদাগরি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মোহরীগিরি করতেন বলে জানা যায়। তিনি শৈশব থেকেই গান-বাজনার প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। যৌবনে তিনি লালন শাহের একজন শিষ্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অসংখ্য ভাবগান রচয়িতা হিসেবে সতীশ গোঁসাই পরিচিতি। তিনি ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আব্দুর রহমান চিশতি

আব্দুর রহমান চিশতি ১২৯৭ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জেলার সদর থানাধীন ঘনশ্যামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফরিদপুর জেলার অন্যতম মরমী সাধক ছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পরে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। শরিয়তপন্থী পির হিসেবে তাঁর সর্বাধিক পরিচিতি ছিল। এ ছাড়া তিনি বিশেষ কবিত্বের অধিকারী ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি অসংখ্য গজল ও গান রচনা করে ছিলেন যা বিশেষ সাহিত্যরসে সঞ্জীবিত।

আজিম শাহ

আজিম শাহ ফরিদপুর জেলার সদর থানাধীন গোয়ালের টিলা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ বা সাল অজ্ঞাত। কিশোর বয়স থেকেই তিনি আত্মভোলা ও সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। প্রায় অল্প বয়সে বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক ও লোককবি নাসির উদ্দিন ফকিরের সান্নিধ্য গ্রহণ করে দীক্ষা নেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি নিরক্ষর হলেও স্বীয় প্রতিভা বলে বহু সংখ্যক আধ্যাত্মিক গান রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর ভক্ত অনুসারিরা তাঁকে এজন্য দরবেশ বলে গণ্য করতেন বলে জানা যায়। তাঁর অসংখ্য গান লোক মুখে আজও প্রচলিত। তিনি ১৯৫৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

তাইজদ্দিন শাহ

তাইজদ্দিন ফকির বা শাহ ফরিদপুর জেলার সদর থানাধীন সদরদী গ্রামে এক মধ্যবৃত্ত তাঁতী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক সন ও তারিখ জানা যায়নি। তিনি ছেলেবেলা থেকেই সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন এবং গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়াতেন। যৌবনে তিনি মধুখালীর সন্নিকটে ব্রাহ্মনকান্দা গ্রামের দেওয়ান নবাব

www.pathagar.com

চাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁরই আশ্রয়ে লালিত পালিত হন। তিনি ব্যক্তি জীবনে ছিলেন নিরক্ষর। মুখে মুখে গান রচনা করতেন। তাঁর বেশিভাগ গানই মরমি গানের অন্তর্ভুক্ত ভজন (বিচ্ছেদ) গান। ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে এ সকল গান আজও প্রচলিত এবং বিচায় গানের আসরে গীত হয়ে থাকে।

আহম্মদ শাহ ফকির

আহম্মদ শাহ ফকির উনবিংশ শতাব্দীতে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার বিনিকদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত ভাব গানের রচয়িতা এবং গায়ক। তাঁর রচিত সহস্রাধিক শুধু মারফতি গানই আধ্যাত্মিক চেতনার প্রয়াস রূপে দীপ্তমান। তাঁকে মারফতি ও তত্ত্বগানের গুরু বলে আখ্যায়িত করা হয়। যে কোনো বিচার গানের আসরে আজও আহম্মদ শাহ ফকিরের গান গীত হয়ে থাকে। তিনি পনের শতাধিক জীব-পরম, কাম প্রেম, দেহতন্ত্র, মুর্শিদি ও শরিয়তি গান রচনা করেছেন।

কোরবার খাঁ

কোরবান খাঁ ১২৮০ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জেলার সদর থানাধীন ডিক্রিরচর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছবের খাঁ। কোরবান খাঁ প্রথম জীবনে মুন্সি আইনউদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মূলত ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধক ও লোককবি। তিনি বহু সংখ্যক উৎকৃষ্টমানের গান রচনা করেছেন। তাঁর রচনার উৎকৃষ্টতা যাচাই করে লোকে তাকে ছোট লালন ফকির বলে সম্বোধন করতেন। তিনি ছিলেন নিরক্ষর পল্লীকবি, তবে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল সুপ্রচুর। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কোনবান খাঁ 'দরবেশ' নামে খ্যাত। ১৩৮২ বঙ্গাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আনেচ আলী ফকির

আনেচ আলী ফকির ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানাধীন মাসউজান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ফরিদপুরের স্বনামধন্য মরমী সাধক মেছের শাহ। মূলত পিতাই তাঁর শিক্ষাগুরু। তিনি পিতার সঙ্গে কুমার নদ সংলগ্ন রসুলপুর গ্রামে অবস্থান করতেন অবশ্য পরবর্তী সময়ে তিনি তালমা এলাকা সংলগ্ন মানিকদহ গ্রামে স্থায়ী বসবাস করেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মানিকদহে তাঁর মাজার রয়েছে। তিনি পিতার ন্যায় অসাধারণ কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়া বিচার গানের গায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি শেষ বয়সে চিশতিয়া তরিকা গ্রহণ করে নামের সঙ্গে 'চিশতি' কথাটি সংযোজন করে আনেচ আলী চিশতি বলে পরিচিতি লাভ করেন। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি 'তত্ত্বজ্ঞান ভাণ্ডার' নামে একখানা ভাবসঙ্গীত পুস্তিকা রচনা করেন। প্রতি বছরে তাঁর মাজারকেন্দ্রিক ওরস অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে অসংখ্য লোকের সমাগম ঘটে।

ডা. হানিফা

ডা. হানিফা ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠ বাখুণ্ডা গ্রামে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম তমিজদ্দিন। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন। তিনি আধ্যাত্মিক,

www.pathagar.com

লোককবি এবং কবি গানের বয়াতি ছিলেন। তিনি জারি গানের পালা রচনা করেন এবং জারি গানের দলও গঠন করেন। তিনি নানামুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি 'অন্নবন্টন' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ এবং 'হাহাকার ব্যাপার' নামে একটি ভাঁট কবিতার পুস্তিকা প্রকাশ করেন (প্রকাশক-ওয়াফিজদ্দিন আহমেদ)। উল্লেখ্য যে, 'অন্নবন্টন' কাব্যগ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় সামাজিক উপন্যাস 'পল্লীকুসুম' এবং সামাজিক নাটক 'দুলালের বিয়ে' নামক দু'টি গ্রন্থের নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। পরে এ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। ডা. হানিফ পেশায় গ্রাম্য ডাক্তার ছিলেন। তার তৈরি বিভিন্ন রোগের 'মিকচার' এতদাঞ্চলে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল।

ছৈজদ্দিন ফকির

ছৈজদ্দিন ফকির ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার সদর থানাধীন বিলমাহমুদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন হানিফ বয়াতি। ছৈজদ্দিন ফকির সংসার বিরাগী সাধক ও একজন লোককবি ছিলেন। তিনি দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় 'বাউরা' মনে ঘুরে বেড়াতেন। এক সময় তিনি যশোরের মনসুর আল চিশতির নিকট বয়েত হন এবং স্বীয় নামের সঙ্গে চিশতি কথাটি সংযোজন করে ছৈজদ্দিন আল চিশতি নামে পরিচিতি লাভ করেন। জীবনের এক পর্যায়ে তিনি ফরিদপুর শহরের কমলাপুর মহল্লায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তিনি মূলত শরিয়তপন্থী সাধক ও লোককবি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর অসংখ্য ভাবগান সারাদেশে ছড়িয়ে আছে।

মহিন সাঁই

ফরিদপুরের অন্যান্য সাধকের মধ্যে মহিন সাঁই উল্লেখ্যযোগ্য। তাঁর পোষাকি নাম মহিউদ্দিন আহমেদ। তিনি মহিন রাজা, মন মহিন, মহিন বাঙাল ও মহিন সাঁই এইসব নানান নামে পরিচিত। তাঁর গানের ভণিতায় এই নামগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। মহিন সাঁই এর জন্ম মানিকগঞ্জ জেলার হরিবামপুরের হরিহরাদিয়া গ্রামে। তিনি ১৩১০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নদী ভাঙ্গনের ফলে তিনি পরবর্তীকালে ফরিদপুর শহরের কমলাপুর মহল্লায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতার নাম মঙ্গল ফকির। মায়ের নাম নসিরন নেছা। তিনি নিঃসন্তান বিধবা বিবি কাঞ্চনমালার কাছে মানুষ হন। পিতা মঙ্গল শাহ ছিলেন দীক্ষিত ফকির লালন শাহের শিষ্য দুদু শাহের ভক্ত। উত্তরাধিকার সূত্রে বাউল তন্ত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। লালন শিষ্য মনিরুদ্দিন শাহের একান্ত ভক্ত মঙ্গল শাহ তাঁর 'চক্ষুদানির গুরু'। তৎপূর্বে তিনি ঝিটকার হযরত কাওসার আলী শাহ আল চিশতির কাছে দীক্ষা নেন। মহিন শাহ নিজেকে লালন শাহ ঘরের চতুর্থ সিঁড়ির সাধক বলে মনে করতেন।

মহিন শাহের গানের গুরু ফরিদপুরের ফকির মেছের চান শাহ ও ফকির কছিম শাহ। এরা দু'জনেই ছিলেন তত্ত্বগানের ভাণ্ডারি। কবি জসীম উদ্‌দীনের ঘনিষ্ঠ সহচর্যে এসে মহিন শাহ গান রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। কবির প্রেরণায় রচনা করেন ধুয়া, জারি, সারি, পল্লীগীতিসহ আরো অনেক কবিতা ও গান। ভাবসঙ্গীত রচনার প্রেরণা পান সাধকগুরু

www.pathagar.com

ফকির কছিম শাহের কাছে। ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলে মহিন শাহের অসংখ্য ভক্ত শিষ্য রয়েছে।

মহিন শাহ স্বভাব কবি, তত্ত্বজ্ঞান সাধক, বাউল পদকর্তা ও গায়ক ছিলেন। মুখে মুখে পদ রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গান রচনা করেন। তাঁর গানগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে ও ভাব সম্পদে অসাধারণ। স্বদেশ ও সমাজ ভাবনা, রম্যরঙ্গ, প্রকৃতি বা নিসর্গ প্রেম এই সব বিষয়ে অসংখ্য পাঁচমিশালী গানও তিনি রচনা করেন। ব্রিটিশ যুগে স্বদেশীদের সাহচর্যে এসে তিনি বেশ কিছু উদ্দীপনামূলক ধুয়া, জারি রচনা করেন। পাকিস্তান শাসনামলে দুঃশাসন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে স্বদেশপ্রেমও দেশবন্ধনামূলক বেশ কিছু গান তিনি লিখেছেন।

আকমত বয়াতি

আকমত বয়াতি চল্লিশ দশকে ফরিদপুর জেলাপর নগরকান্দা থানার রামনগর ইউনিয়নে জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি গীতিবাদ্য প্রিয় ছিলেন। ফরিদপুরের অন্যতম সাধক কবি বিনিকদিয়া গ্রামে আহম্মদ শাহ ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। তিনি বিচার গানের তাত্ত্বিক এবং অন্যতম গায়ক হিসেবে সমধিক প্রিয় ছিলেন। স্বল্প শিক্ষিত আকমত বয়াতি অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় তাঁর বেশকিছু শিষ্য রয়েছে। তাঁর অধিকাংশ গানই ছিল দেহতত্ত্বমূলক।

আয়নাল বয়াতি

চল্লিশ দশকের শুরুতে বোয়ালমাতী থানার অন্তর্গত প্রেমতারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে ভাঙ্গা থানার পূর্বসদরদি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস। তিনি ফরিদপুরের অন্যতম বিচারগানের গায়কও রচয়িতা এবং বিচার গানের একজন তার্কিকও বটে। তিনি গানের আসরে দোতারা বাজিয়ে গান পরিবেশন করতেন।

www.pathagar.com

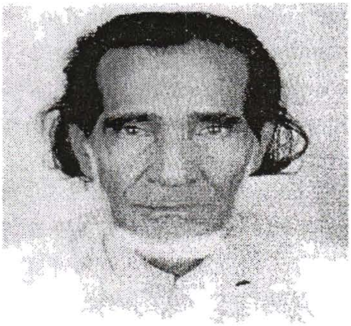

আয়নাল বয়াতি

কানাইলাল শীল

নগরকান্দা থানায় জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ দোতারা বাদক। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে দীর্ঘদিন দোতারা বাজিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন। বেশকিছু অসাধারণ লোকগানের তিনি শিল্পীও ছিলেন। বলাবাহুল্য তার প্রধানত বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে দোতারা বাজিয়ে স্বনামধন্য হয়ে আছেন।

হাজেরা বিবি

হাজরা বিবির জন্ম পৈতৃক নিবাস রাজবাড়ি জেলার সদর থানার বসন্তপুর ইউনিয়নের খাইলসা সোনাপুর গ্রামে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি একজন স্বনামধন্য লোকশিল্পী। পূর্বনাম ননীবালা। বাবার নাম রাজকুমার সরকার। মায়ের নাম শ্যামদাসী। প্রথম স্বামীর ক্ষিতীশ সরকারের মৃত্যুর পর লোকশিল্পী ফরিদপুরের ভাসানচরের লোক গায়ক আজাহার মণ্ডলের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবধ্য হন। নাম পাল্টিয়ে হাজেরা বিবি হন এবং ফরিদপুরের অম্বিকাপুরে স্থায়ী বসবাস করেন। স্বামী আজাহার মণ্ডলের মৃত্যু হলে চলাফেরার অসুবিধার কারণে মনিরুদ্দিন ফকিরের সঙ্গে পুনরায় বিবাহ হয়।

www.pathagar.com

পরবর্তী সময়ে পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের সংস্পর্শে আসেন এবং গানের জগতে প্রবেশ করেন। বলাবাহুল্য জসীমউদ্‌দীন তাকে কন্যাতুল্য মনে করতেন এবং হাজেরা বিবি তাকে পিতৃব্য বলতেন। হাজেরা বিবি 'আমার গুরু জসীমউদ্‌দীন' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, 'আমি নিজে গান লেহা শুরু করি ৪০-৫০ বছর বয়সে। আমি কিন্তু হাতে লেহিনা।

লেহাপড়া শিহি নাই। গান লেহি মুখে মুখে। আমার লেহা দুই-একটা গান কবি হুনতেন। প্রশংসা করছেন খুব। আব্বার (কবি) পছন্দ করা একটা গান এহনও মনে আছে– আমার ছেড়ে গেলা কোন অপরাধে পাখি/আবার এসো ফিরে। জসীমউদ্‌দীনের লেখনিতে আসমানী, রূপাই, গনিমিয়া, যেমন উল্লেখযোগ্য ঠিক তেমনি হাজরা বিবির নামটি অনন্যসাধারণ। মূলত হাজেরা বিবি ছিলেন একজন লোক গায়ক যিনি পরবর্তীকালে বেশিকিছু অমর সংগীতের সৃষ্টি বলেছেন।

হাজরা বিবি

শাহ সুফি মো. আব্দুল মজিদ আল চিশ্‌তি নিজামী

তিনি পঞ্চাশ দশকে ফরিদপুর জেলার সদর থানাধীন সাদিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বিএ (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করেন।

শৈশব হতেই লেখাপড়ার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। পরবর্তী জীবনে মানিকগঞ্জের ঝিটকা শরীফের পিরের মুরিদ হন এবং সুফি তথ্যের উপর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি অসংখ্য জীব-পরম, নবুয়ত-বেলায়েত, কাম-প্রেম এবং অন্যান্য বিষয়ে অসংখ্য গান রচনা করেন।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

বাঙালির ঐতিহ্যগত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। এ সাহিত্যের সৃষ্টি মূলত মৌখিক। মৌখিক হলেও খুবই সমৃদ্ধশালী এ সাহিত্য। অতীতের ঐতিহ্যগত হলেও তা বর্তমানেরও অমূল্য সম্পদ। লোকগল্প, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, ভাটকবিতা, লোককবিতা প্রভৃতি মুখে মুখে সৃষ্টি হলেও পরমপরাগতভাবে সমৃদ্ধ করেছে লোকসাহিত্যকে।

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

"এক যে ছিল রাজা, তার হাতিশালে হাতি এবং ঘোড়াশালে ঘোড়া" - এই বলে শুরু, তার আসল কাহিনি শুনে শ্রোতাদের অন্তর পুলকিত এবং আনন্দিত। লোকসাহিত্যে এগুলো লোককাহিনি, লোককথা, রূপকথা, কিংবা কিস্‌সা কাহিনি নামে পরিচিত। মানব সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়েছে লোকসাহিত্যের এই প্রাচীনধারা।

লোককাহিনিগুলো কোনো ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা লিখিত রচনা নয়। কবে থেকে এগুলো মুখে মুখে রচিত হতে আরম্ভ হয়েছিল তা জানা যায়নি। প্রচলিত লোককাহিনিগুলো সাধারণত রোমাঞ্চকর কাহিনি, বীর কাহিনি, স্থানিক কাহিনি, জীব জানোয়ারের কাহিনি, গীতিকাহিনি, হাস্যরসাত্মক কাহিনি ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। লোককাহিনি মানুষের গল্প হলেও কিছু কিছু কল্পিত, অপ্রাকৃত পশু-পক্ষি ও রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব উল্লেখ্যযোগ্য স্থান দখল করে আছে। পক্ষীরাজ, বেঙ্গমা-বেঙ্গমি ও শুকসারি লোককাহিনির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চরিত্র। লোককাহিনির রাজপুত্র-রাজকন্যারা এদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

লোককাহিনিতে জীব-জানোয়ারের মধ্যে শৃগালের ধূর্ততা, কুমিরের বোকামি, পাখিদের মধ্যে কাকের শঠতা ও কোকিলের স্বল্প বুদ্ধিতা আমাদের অনেক নীতিশিক্ষা দেয়। তেমনি রূপকথাভিত্তিক বীরকাহিনির মধ্যে দিয়ে নায়কের অদম্য সাহস, স্বপ্নদ্রষ্টা নায়িকার জন্য নায়কের দুর্গম পথে যাত্রা, পথে রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানবকে পরাভূত করা, রাক্ষসের গৃহে বন্দিনি রাজকুমারীকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে নায়কের অসীম বীরত্ব প্রদর্শন ইত্যাদি শ্রবণের মধ্য দিয়ে শ্রোতার অজ্ঞাতেই বীরত্বের গৌরব উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

লোককথার পশুপাখিকে কেন্দ্র করে যে সব কাহিনি গড়ে ওঠে এই সব পশুপাখি কিন্তু আদৌ আচরণে পশুপাখি নয়, এরা মানুষের মতোই আচরণ করে। মানুষের আচার-আচরণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই পশুপাখির প্রতীকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলার লোককথায় পশুকথার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

লোককথার মধ্যে রূপকথা আকারে খুবই দীর্ঘতম। আমাদের এই রূপকথা অনেকটা নিয়তি নির্ভর। এই নিয়তিই রূপকথার কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিকথা

www.pathagar.com

লোককথার আর একটি অংশ। রূপকথায় পরিরা সাধারণত খুব উপকারী এবং সরল প্রাণের অধিকারী। এরা থাকে দূর আকাশে মেঘের রাজ্যে।

বলা বাহুল্য অন্যান্য দেশ, জাতি ও জেলার ন্যায় ফরিদপুরে প্রচুর এবং চমৎকার লোককাহিনির সম্পদ আছে। উল্লেখযোগ্য লোককাহিনিগুলো হলোঃ মধুমালা, বেদের মেয়ে, জামাল-কামাল, গৌরচাঁদ মাঝি, চন্দ্রবানুর কিচ্ছা, হারমন ডাকাতের কিচ্ছা, মৃগপরির কিচ্ছা, দুর্লভ বাদশা, বগা-বগীর কিচ্ছা, বামন ছাপার কিচ্ছা, কাহা-কুহু পাখির কিচ্ছা, শ্রীআংটি ও ইঁদুর, হীরামন পাখি, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গামী, ডালিম কুমার, কাঞ্চনমালা, স্বর্ণকমল, চোরের গল্প, সুয়োরানি-দুয়োরানি, নদের চাঁদ প্রভৃতি। এ অঞ্চলে প্রচলিত কাব্যাকারে বর্ণনাত্মক দুটি কিস্‌সা উপস্থাপন করা হলো :

১. চারণ কবি প্রফুল্ল সরকারের 'নদের চাঁদ' সম্পর্কে লোককিস্‌সা

নদের চাঁদ কামাক্ষ্যায় গেল
যাদুবিদ্যা শিখে এলো হায়
প্রাণ গেল তার নারীর মন্ত্রণায় ॥

ইতিহাসে নাইরে কথা
পল্লির বুকে মর্ম ব্যাখ্যা
মধুমতি কূলের কথা
লেখা ঘাটের গায় ... ॥
ঘরের রমণী একদিন বলিলো তারে
কুমির যদি হতে পারো দেখাও আমারে
শাশুড়ি মা আজ বাড়ি নাই
এমন সুযোগ কভু না পাই
তোমার পায় ধরি মিনতি জানাই
ফেলোনা আমায় ... ॥

কুমির হতে চাইলো সে চাঁদ
বউকে বিশ্বাস করে
কুমির হয়ে গৃহে তব
চলে ধেয়ে ধেয়ে
ঘরের রমণী ভিরু
পা!লায় ভয় পেয়ে
তখন অভাগিনীর পায়ের ধাক্কায়
জল পড়ে যায় গৃহের আঙিনায় ... ॥

তখন চাঁদ কেঁদে বলে ও প্রাণ প্রিয়
তোমার হাতে আমার জীবন গো
আমি মানুষ আকার ধরবো আবার
এ জল দিলে গায় ... ॥

www.pathagar.com

কুমির হয়ে লুকালে আর
কদিন থাকা চলে
তিনদিন পরে নামলো সে চাঁদ
মধুমতির জলে
আর মায়ে ডাকিলে উচ্চস্বরে
খাবার খেতো কূলে এসে
শিকারি এক সাহেব এসে
মারলো গুলি গায় ... ॥

কুমিরও নাই সাহেবও নাই
গ্যাছে লোকান্তরে
নদের চাঁদের ঘাটের স্মৃতি
আজো বহন করে
প্রফুল্ল কয় গভীর নেশায় যদি কেউ সেই ঘাটে যায়
করুণ একটা সুর শোনা যায়
আয়রে নদে আয় ... ॥

২. চারণকবি মো. সিরাজুল ইসলামের 'নদের চাঁদ' সম্পর্কিত কিস্‌সা
নীরব হয়ে শুনুন আমার শ্রোতা বন্ধুগণ
নদের চাঁদের কিচ্ছা গেয়ে শোনাবো এখন ॥
শত শত বছর পূর্বে বাস করত সেথায়
আদিবাসী বলে তাঁদের ছিল পরিচয় ॥
নামটি তাঁহার ছিল সুভাষ সে বড় সরল
জীবনে বাঁধে নাই ভাইরে কারো সাথে গোল ॥
বড় সুখে ছিল সুভাষ মাত্র একটি ছেলে
পিতা মাতা ডাকতো তারে চাঁদ চাঁদ বলে ॥
পঞ্চ বছরের কালে খড়ি দিল হাতে
বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠায় পাঠশালায় পড়িতে ॥
পনের বছরে করে দশম শ্রেণি পাশ
আনন্দে ভরিল মাতা-পিতাজী সুভাষ ॥
একে একে বয়স যখন বিশ বাইশ হইলো
চাঁদের বিয়ের জন্য সুভাষ ঘটক পাঠাইলো ॥

ঘটক সেজে চলে শ্যামা রং লাগাইয়ে গায়েতে
কী আনন্দ চাঁদের বিয়েতে ॥
এদেশ ওদেশ যেয়ে শ্যামা ঘুরিতে বেড়ায়
হাফসি দেশে যেয়ে শ্যামা হইলো উদয় ॥
হাফসি রাজার কন্যা নামে তারামতি

www.pathagar.com

এক মুখে বলবো কতো রূপের সুরতি ॥
রূপে রূপে রূপবতী কন্যা সুন্দরী
তাহার রূপ দেখিয়া লজ্জা পায় কুকাপ শহরের পরি ॥
জোড়া ভুরু মাজা সরু নাকেতে নাক ফুল
পায়ে বাজে নূপুর তাহার কানে শোভে দুল ॥
অঙ্গেতে পরেছে সোনা পায়ে বাজে মল
বুকেতে শোভে যেমন ফোঁটা কমল দল ॥
গজেন্দ্র গমনেতে চলে বাঁকা হাসি হেসে
পুরুষ ভোলায় কন্যা মেঘবরণ কেশে ॥
বাঁশির মতো নাক দুটি তার কাশির মতো মাথা
সেই যে কন্যা বলে সদা পরাণ ভরা কথা ॥
দেখতে যেমন চপল তেমন নয়ন দুটি বাঁকা
বুকের পরে কমল কলি চাদর দিয়ে ঢাকা ॥
ডাগর চোখেতে যদি কারো পানে চায়
যুবা তো ভাই দূরের কথা বুড়ো পাগল হয় ॥
সেই যে কন্যার সাথে ভাইরে চাঁদের বিয়ে হলো
খুশি খুশালিতে দিন কাটিতে লাগিলো ॥

একদিন রাতের বেলা চাঁদ তার স্ত্রীকে কয়
মন্ত্র শিখতে যাবো আমি কামরুক কামাক্ষায় ॥
একথা শুনে তারামতি ধরে স্বামীর গলে
কামাক্ষাতে যাবে তুমি আমায় একা ফেলে ॥
এহেন বসন্তকালে যার স্বামী না রয় কাছে
বল দেখি অবলার প্রাণ কেমনেতে বাঁচে ॥
তোমাকে যে বিদায় দিয়া কেমনে রব ঘরেতে
অভাগিনি আমি জগতে ॥
পতিধন পতিমন পতি কুলমান
পতির পায়ের নিচে নারীর স্বর্গ স্থান ॥
স্বামী হারা হয়ে আমি কেমনে ঘরে রব
মনের ব্যথা উদয় হলে কার কাছে বলিবো ॥
চাঁদ বলে তারামতি থাকো ধৈর্য ধরে
অল্প দিনের মধ্যে আমি আবার আসবো ফিরে ॥
মধুর আলাপনে তাদের পোহাইলো নিশি
পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে বাজলো ভোরের বাশি ॥
দিন মনি উদয় হলো আসমানের উপরে
স্ত্রীকে ডেকে চাঁদ বলছে মধুর সুরে ॥
বিদায় দাওগো ও বিবিজান এবার আমি আসি

www.pathagar.com

বিদায় বেলায় দেখতে চাই তোমার মুখের হাসি ॥
তারামতি বলছে তখন ওগো প্রাণের স্বামী
হাসিমুখে বিদায় দিলাম যাত্রা করো তুমি ॥
বিদায় পেয়ে চাঁদ তখন মায়ের কাছে যায়
মায়ের পায়ের ধুলি তখন অঙ্গেতে মাখায় ॥
চাঁদ বলে বিদায় করো ওগো মা জননী
বিদায় নিয়ে যাবো এখন কামাক্ষাতে আমি ॥
তোরে বিদায় দিয়া ওরে নীল রতন
ঘরে রবো কেমন ॥
যেয়োনা যেয়োনা বাবা কামাক্ষায় যেয়োনা
কামাক্ষাতে গেলে মানুষ ফিরে আর আসে না ॥
তোমার মরণ কথা যদি আমি কানে শুনি
সর্বহারা হয়ে আমি হব পাগলিনী ॥
এক মায়ের এক পুত্র একা চাঁদ তুমি
তোমায় বিদায় দিয়ে কেমনে ঘরে রবো আমি ॥
চাঁদ বলে মাগো তুমি বিমর্ষ হয়ো না
তোমায় রেখে কামাক্ষাতে চিরদিন থাকবো না ॥
ঈশ্বরের নাম লয়ে চাঁদ হইলো বিদায়
বিদায় নিয়ে চাঁদ চললো কামরুক কামাক্ষায় ॥
হাটিতে হাটিতে চাঁদ ভারতে পৌছিল
কামাক্ষার নিকটে যেতে উপনীত হইলো ॥
সম্মুখে তাকাইয়া দেখে কামরুক অনেক দূর
সম্মুখে বাঁধিল তার এক অকূল সমুদ্র ॥
কিনারায় বসিয়া চাঁদ ভাবে মনে মনে
অকূল সাগর সামনে আমার পার হবো কেমনে ॥
শ্রী গুরু বলিয়া ধরিলাম পাড়ি
কে যাবিরে আয় তাড়াতাড়ি ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া চাঁদ দরিয়ায় ঝাপ দেয়
ঈশ্বরের দোয়ায় দরিয়া পার হইয়া যায় ॥
পার হয়ে চাঁদ তখন এদিক ওদিক চায়
অজানা অচেনা পথে যাইবে কোথায় ॥
ভাবিতে ভাবিতে চাঁদ হইলো পেরেশান
কেবা তারে দয়া করে দেয় পথের সন্ধান।

জগদ্বিশ্বর তাহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া
হঠাৎ এক দ্বীপংকর দূত দিলেন পাঠাইয়া ॥
কে তুমি বিদেশি ওগো এলে আমার দেশে

www.pathagar.com

অকারণে এসে কেন প্রাণ খোয়াবে শেষে ॥
চাঁদ বলে আমি এক অভাগা সন্তান
দয়া করে দিবে মোরে কামাক্ষার সন্ধান ॥
ইহা শুনে তাহার মনে দয়া উপজিলে
পৌছাইয়া দিলো তারে কামাক্ষার নাগালে ॥

নাজ্জাসী নামেতে এত মহা যাদুকর
মন্ত্র বলে ঘর উঠাইছে শূন্যের উপর ॥
চাঁদকে দেখিয়া তাহার আনন্দিত মন
শিষ্যরূপে চাঁকে সে করিলো গ্রহণ ॥
ওস্তাদ মিলে ঘরে ঘরে শিষ্য মিলা দায়
ধীরে ধীরে চাঁদকে সে মন্ত্র শিক্ষা দেয় ॥

দিনের পরে দিন চলে যায় মাসের পরে মাস
বছরের পর বছর যেতে পুরলো মনের আশ ॥
মন্ত্র বলে চাঁদ তখন হয়ে বলিয়ান
পরিশেষে হলো ওস্তাদের চেয়ে শেয়ান ॥
মন্ত্র বলে হতে পারে পশু পাখির রূপ
দেখতে শোভা মনোলোভা আহা অপরূপ ॥
মন্ত্রের কথা শুনলে তাহার মন রয়না স্থির
নিমেষে হইতে পারে জলের কুম্ভীর ॥
গাছের শাখায় বসে চাঁদ পঙ্খি হয়ে ওড়ে
শূন্যেতে উড়ে আবার গাছের উপর পড়ে ॥
একদিন চাঁদ তার গুরুর কাছে কয়
আপন দেশে যাবে গুরু বিদায় দেন আমায় ॥
আপনার আশির্বাদে আমি নিজ দেশে যাবো
মায়ের মুখ দেখিয়া আমার পরানটা জুড়াবো ॥
তখন নাজ্জাসী বলেরে চাঁদ আমার কথা ধর
দেশে যাবে তুমি বাবা একটু সবুর কর ॥
ইহা বলে নাজ্জাসী কী কর্ম করিল
মন্ত্র বলে চাঁদকে আটকাইয়া রাখিল ॥
বিদায় নিয়ে চাঁদ যখন বাড়ির দিকে যায়
দিনের শেষে চেয়ে দ্যাখে রইছি কামাক্ষায় ॥
এইভাবে অনেকদিন তার গুজারিয়া গেল
গাছের ডালে বসে চাঁদ শূন্যেতে উড়িল ॥
এমন সময় ওস্তাদ তার বুঝিতে পারিল

www.pathagar.com

তবু মায়ার বাঁধন কেটে চাঁদ বাড়িতে পৌছিল ॥
যখনেতে চাঁদ আপন বাড়ি যায়
আরশি পড়শি স্ত্রী মাতা কান্দে উভরায় ॥
তারামতি বলে প্রাণনাথ হেথায় দাঁড়াও তুমি
জন্মের মতো স্বামীরূপে দেখে লইবো আমি ॥
কোন পরাণে প্রাণের বন্ধু আমায় একা ফেলে
কোন রূপসীর মায়াজালে আমায় ভুলে ছিলে ॥
এমন সময় মা এসে তার জড়াইয়া ধরিল
কোথায় ছিলে বাবা তুমি কোথায় ছিলে বলো ॥
মায়ে বলে ওগো বাবা শোন আমার বাণী
তোমার বাবার কথা মনে হলে চোখে আসে পানি ॥
তোমার শোকে তোমার বাবা হলো ছন্নমতি
রোগে শোকে ভুগে হলো জীনব সমাপ্তি ॥
এখন আমি বেঁচে আছি আধা মরা হয়ে
আমার জীবন ধন্য হলো তোমায় ফিরে পেয়ে ॥

এইভাবে সুখ শান্তিতে কাটতে ছিল দিন
চাঁদকে ডাকিয়া মাতা বলতেছে একদিন ॥
কোথায় ছিলে বাবা তুমি বলো না আমায়
চাঁদ বলে গিয়েছিলাম কামরুক কামাক্ষায় ॥
সেখানে শিখেছি আমি মন্ত্র ভুরি ভুরি
বাঘ ভাল্লুক পশু পাখি সব হইতে পারি ॥
আর কথা বলে চাঁদ হইয়া গম্ভীর
হতে পারি মাগো আমি জলের কুম্ভীর ॥
এই কথাটি চাঁদ যখন মার কাছে বলিল
আড় পাতিয়া তারামতি সব কথা শুনিল ॥
তখন মায়ে বলে চাঁদ তুমি হইয়োনা অস্থির
জীবনে হইয়োনা বাবা জলেরও কুম্ভীর ॥
চাঁদের মাতা গেল একদিন দেখতে মামার ঘর
তারামতি বলছে তখন ওগো প্রাণেশ্বর ॥
একটি আবেদন তোমার চরণেতে রাখি
তুমি নাকি হতো পারো পশু আর পাখি ॥
তুমি নাকি হতে পারো জলেরও কুম্ভীর
দেখতে মোর মন হয়েছে অস্থির ॥

মধুমাখা বাণী শুনে চাঁদ করলো ভুল
দুনিয়াতে নারী জাতি সর্বনাশের মূল ॥
রাজা শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গাদেবী বলে

www.pathagar.com

একে একে সাতটি সন্তান দিল গঙ্গার জলে ॥
যেমন আদম হাওয়া মিলে দুজন বেহেস্তে আছিল
হাওয়ার ছলনায় আদম গন্ধব পিলাইলো ॥
নারাজ হয়ে খোদা তাদের করিল বাহির
তেমনি ভুল করিল চাঁদ হইয়া কুম্ভীর ॥
চাঁদ বলে তারামতি আমার কথা শোন
দুটি শরায় জল ভরিয়া আমার কাছে আনো ॥
প্রথম শরার জল যখন অঙ্গেতে ছিটাবে
জলের কুম্ভীর হবো আমি তুমি দেখতে পাবে ॥
দ্বিতীয় শরার জল যখন দিবে গায়
সাথে সাথে মানুষ আমি হবো পুনরায় ॥
এই কথা শুনে এনে দিল দুটি শরা পানি
মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিল চাঁদ গুণমনি ॥
প্রথম শরার জল যখন অঙ্গেতে ছিটালো
সাথে সাথে চাঁদ কুমির রূপ ধরিলো ॥
বিকট মূর্তি দেখে তারামতি মনে পেয়ে ভয়
দৌড় মারিল তারামতি বিদ্যুতের ন্যায় ॥
দ্বিতীয় শরার জল তার পায়ের আঘাতে
ভাগ্য দোষে সব জল পড়িল মাটিতে ॥
ভাগ্যের খেলা যায় না দেখা কেউ দেখতে না পায়
অনাহারে থাকলো চাঁদ কুম্ভীর অবস্থায় ॥
ক্ষুধার জ্বালায় চাঁদ থাকতে না পারে
একটি ব্যাঙ ধরিয়া চাঁদ অমনি আহার করে ॥
মানুষের মতো দেখায় তাহার চোখের পলক
প্রতিদিন দেখতে আসতো শত শত লোক ॥
এইভাবে কয়েকদিন তার গুজারিয়া গেল
একুশ দিন পরে চাঁদ জলেতে ঝাঁপ দিল ॥

কামার হেলা গ্রামের কোণ ঘেঁষে গেছে মধুমতি
আজো মানুষ দেখতে আসে নদের চাঁদের স্মৃতি ॥
সেই নদীতে থাকতো চাঁদ ভাসতো মাঝে মাঝে
হাজার হাজার মানুষ তারে দেখতো সকাল সাঝে ॥
চাঁদের দুখিনি মা ঘাটে দাঁড়াইয়া
প্রতিদিন সে ডাক দিতো আয় চাঁদ আয় চাঁদ বলিয়া ॥
দাঁড়াইয়া কাঁদতো মাতা চাঁদ চাঁদ বলে
আহারে দুখিনির ধন কেন কুম্ভীর হলে ॥
আর না দেখিবো আমি তোমার চন্দ্র মুখ

www.pathagar.com

চোখের জলে ভেসে যেত মা দুখিনির বুক ॥
এইভাবে কয়েক বছর কেটে তার যায়
হঠাৎ একদিন বিকাল বেলায় উঠিল ডাঙ্গায় ॥
ডাঙ্গাতে উঠিয়া চাঁদ আছে ঘুমাইয়া
ইংরেজ সাহেবের জাহাজ যাচ্ছে নদী দিয়া ॥
হঠাৎ এক জ্যান্ত কুম্ভীর দেখিল ডাঙ্গাতে
মারিল ঐ সাহেব তারে বন্দুকের আঘাতে ॥
শুনিয়াছি এইভাবে তার জীবন নাশ হইলো
তাহার নামে এলাকাটি নদের চাঁদ হইলো ॥
১৫ই ফাল্গুন সেথায় মিলতো বিরাট মেলা
গান বাদ্য নানাবিধ হইতো খেলাধুলা ॥
আছে সেথা পল্লি বাজার ফুটবল খেলার মাঠ
আজো মানুষ দেখতে আসে নদের চাঁদের ঘাট ॥
এই পর্যন্ত এই কিচ্ছা হইলো তামাম
সারা জীবন থাকবে মনে নদের চাঁদের নাম ॥

খ. কিংবদন্তি

অতীতকালের জনপ্রিয় ব্যক্তি, রাজা-বাদশা, পির-ফকির অথবা কোনো বীর পুরুষের কাহিনি নিয়ে লোকমুখে রচিত হয় কিংবদন্তি। লোকসমাজ মনে করে একদিন যা ঘটেছিল, সেই ঘটনা তাদেরই এলাকায় সংগঠিত হয়েছিল। তাই কিংবদন্তির মধ্যে ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্রের সন্ধান মিলতে পারে। কিংবদন্তি ইতিহাস নয়, যদিও তা অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের উৎস হিসেবে কাজ করে। কিংবদন্তির কাহিনি সত্য কোনো ঘটনাকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে, তবে সেই ঘটনার সঙ্গে জনশ্রুতি, লোককল্পনা ইত্যাদি যুক্ত হয়। আমরা দেখেছি, কিংবদন্তিগুলি সাধারণত জলাশয়ভিত্তিক, স্থানিক ও তীর্থাশ্রয়ীমূলক বিচিত্র কাহিনিতে ভরপুর।

ফরিদপুরের জনশ্রুতিমূলক কয়েকটি কিংবদন্তি হলো: মরিয়ম বিবির দিঘি, নইদ্যার চাঁদ, মজিদ গাইড়ার বিল, বিসমিল্লাহ শাহ, শাহ মান্দার, পরশউল্লাহ ফকির, দুগ্ধশাহ, শ্রী শ্রী জগবন্ধু সুন্দর, শাহ পাহলোয়ান, কুরাশীর দিঘি, মদদখার দিঘি, গেরদার শাহী মসজিদ, সাতৈর মসজিদ, মথুরাপুর দেউল, চার রশির কাঠের গুড়ি, কাইঠার কালীবাড়ি, ঢোল সমুদ্রের বাওর, নলীদবাবু, দরবেশের ফোল প্রভৃতি। ফরিদপুর অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি কিংবদন্তি নমুনা হিসেবে তুলে ধরা হলো:

ঢোল সমুদ্র

কিংবদন্তিগুলোর অধিকাংশই জলাশয়ভিত্তিক। যে সকল অঞ্চলে শত বছরের স্মৃতি বিজড়িত বিল-ঝিল, হাওর, কোল রয়েছে সেখানে কমবেশি কাহিনি ও উপকাহিনির সৃষ্টি হয়েছে। 'ঢোল সমুদ্রের বাওর' নামে শত বছর পূর্বে ফরিদপুর শহরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে

www.pathagar.com

একটি সুবিশাল জলাশয় ছিল। যেটি দৈর্ঘ্যে ১০ কি. মি. প্রস্থে ৫ কি. মি.। জলপ্রবাহে এটি ভরাট হয়ে বর্তমানে জনবসতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু শহরের দক্ষিণ পূর্বাংশে চাঁদমারির চক ও বিল মাসুদপুরের কিছু অংশ ঢোল সমুদ্রের কিঞ্চিৎ চিহ্ন আজও বহন করছে। এক সময় এই ঢোল সমুদ্রকে কেন্দ্র করে অপরাপর কিংবদন্তির জন্ম হয়েছে।

এখনো মানুষের মনের মনিকোঠায় নাড়া দিচ্ছে ঢোল সমুদ্রের গভীর জলে সোনার নৌকা, পবনের বইঠা বাওয়ার কথা। লোকশ্রুতি, গভীর রাতে চুপি চুপি এসে ঢোল সমুদ্রের গায়ে এসে দাঁড়ালেই দেখা যেত শত শত পরির দল মাঝি-মাল্লা সেজে সোনার নৌকা, পবনের বৈইঠা দিয়ে বাইচ দিচ্ছে। পরিদের সেই আনন্দ উৎসব সুবেহ সাদেকের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চলতো। কোন জনমানুষের সাড়া শব্দ পেলেই তারা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতো।

অতীতকালে বিয়ে-শাদী অথবা অন্য কোনো উৎসবের আয়োজনে অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য থালা-বাসনের প্রয়োজন হতো। তখন ঢোল সমুদ্রের বাওরের কাছে গিয়ে গলায় কাপড় জড়িয়ে গভীর জলাশয়কে উদ্দেশ্য করে চাইলেই ঢেউয়ের তরঙ্গে তা পৌঁছে দেয়া হতো। অনুষ্ঠান শেষে সেগুলো জলাশয়কে ফেরৎ দিতে হতো। লোকশ্রুতি আছে, একবার এক ব্যক্তি একটি থালা লুকিয়ে রেখে ছিল যার ফলে আর কোনো দিন এই জলাশয় থেকে থালা বাসন পাওয়া যায়নি।

পূর্বে ঢোল সমুদ্রে প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো। একবার এক জেলের জাল পানির মধ্যে আটকে গেলে সে জাল ছাড়ানোর উদ্দেশ্যে পানিতে ডুব দিয়ে দেখে তার জালটি একটি সুসজ্জিত মসজিদের চূড়ায় আটকে আছে। সে দেখতে পায় সাদা কাপড় পরিহিত একজন ব্যক্তি মসজিদ তদারকিতে নিয়োজিত আছে। তিনি জেলেটিকে দেখে এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে জেলেটি বিষয়টি তাকে খুলে বলে। তিনি জেলেটিকে ভবিষ্যতে এখানে আসতে বারণ করেন এবং যা দেখেছে তা যেন কাউকে না বলে, তাহলে তার ক্ষতি হবে। তবে গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রত্যহ একবার এসে এখানে জাল ফেললে সে মাছ পাবে তাতে তার সংসার চলে যাবে। লোকশ্রুতি আছে, জেলেটি প্রতিদিন এখানে এসে জাল ফেলতো এবং প্রচুর মাছ পেতো। এমনি করে রাতারাতি তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। একদিন জেলেটি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পুরো বিষয়টি তার স্ত্রীর নিকট বলে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু ঘটে।

মরিয়ম বিবির দিঘি

ফরিদপুর শহর থেকে ১০ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে কসবায় গেরদা নামে একটি গ্রাম রয়েছে। সে গ্রামে দশম হিজরিতে শাহ আলী বাগদাদী (র.) একটি পাথরের মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। যে মসজিদটি কালের সাক্ষী হিসেবে আজও টিকে আছে। এই মসজিদটির নিকটে একটি বিশাল দিঘির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এই দিঘিটি খননের উপর জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর এই জায়গাতে নগরপত্তন করেছিলেন। ঐতিহাসিক এই জায়গাটি নাকি সম্রাটের পছন্দ হয়েছিল। তিনি এখানে পিলখানা, ধোপাখানা নির্মাণ করেছিলেন। এ গ্রামের পার্শ্ববর্তী ফুলবাড়ি গ্রামে সম্রাটের সুন্দর একটি ফুলের বাগান ছিল। এই ফুল বাগান থেকেই পরবর্তীকালে এলাকাটির নাম 'ফুলবাড়িয়া' হয়েছে।

www.pathagar.com

লোকশ্রুতি আছে, পূর্বে এ অঞ্চলে প্রভাবশালী এক জমিদার ছিলেন। তিনি এখানে একটি দিঘি খনন করেছিলেন এবং তার স্ত্রী মরিয়ম বিবির নামানুসারে দিঘিটির নামকরণ করেছিলেন। যখন লোক-লস্কর দিয়ে দিঘিটি খনন করা হলো তখন দেখা গেল, পুকুরে এক ফোটাও পানি উঠছে না। জমিদার খুবই চিন্তিত হলেন। তিনি একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন, তার স্ত্রী মরিয়ম বিবি যদি দিঘির ভেতর নেমে ধান-দুর্বা দিয়ে দিঘিটিকে বরণ করেন তাহলে দিঘিতে পানি উঠবে। পরদিন জমিদারের স্বপ্নের বিবরণ অনুসারে জমিদার স্ত্রী মরিয়ম বিবি অপরাপর মাইলাদের সঙ্গে করে দিঘিতে নামে এবং ধান-দুব্বা দিয়ে বরণ করতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায় দিঘির মধ্যে পানি উঠতে শুরু করেছে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে দিঘিটি পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সঙ্গী-সাথিরা প্রায় সকলে দিঘি থেকে উপরে উঠে গেলেও কোথাও জমিদার স্ত্রী মরিয়ম বিবিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। লোকমুখে প্রচলিত আছে, এখনো গভীর রাতে দিঘিটির দিকে তাকালে দেখা যায় জায়নামাজে বসে একজন মহিলা নামাজ পড়ছে।

বিসমিল্লাহ শাহ

ফরিদপুর শহর থেকে ৪ কি. মি. দক্ষিণে ফরিদপুর বরিশাল মহাসড়কের পাশে বিসমিল্লাহ শাহের দরগা রয়েছে। ধারণা করা হয় বিসমিল্লাহ শাহ আলী বোগদাদি (র.) এর সমসাময়িক একজন কামেল পির। তাঁকে কেন্দ্র করে লোকমুখে একাধিক কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে।

লোকশ্রুতি, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী বিসমিল্লাহ শাহকে কলকাতা থেকে নিজ বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন এবং এই বাড়িতে তিনি কামলা হিসেবে কাজ করেন। একদিন চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী বিসমিল্লাহ শাহকে পাশ্ববর্তী কুমার নদ থেকে কলসিতে করে পানি আনতে বলেন। শোনা যায়, তিনি একই সঙ্গে সাতটি কলস ভর্তি করে পানি এনেছিলেন। ঐ সময় চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী দেখেন যে, কলসগুলি বিসমিল্লাহ শাহের মাথার উপর শূন্য অবস্থায় রয়েছে।

বিসমিল্লাহ শাহের একটি বিশালাকার ষাঁড় ছিল। একদিন 'ঢোল সমুদ্র' থেকে একটি দৈত্যকার ষাঁড় উঠে এসে বিসমিল্লাহ শাহের ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দেয়। এক সময় দেখা যায় দৈত্যাকার ষাড়টির একটি শিং ভেঙে গেছে এবং ষাড়টি ঢোল সমুদ্রের দিকে পলায়ন করছে। পরদিন দেখা যায় ভাঙা শিংটি সোনার তৈরি।

নদের চাঁদ

ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলায় মধুমতি নদীতে নদের চাঁদের ঘাট রয়েছে। এ ঘাটটি নদের চাঁদ নামক জনৈক ব্যক্তির নামানুসারে পরিচিত। লোকশ্রুতি আছে, নদের চাঁদ নামক একজন স্থানীয় যুবক মন্ত্রবলে কুমির হতে পারতেন এবং মন্ত্রবলে পাত্রে যে পানি রাখা হতো তা কুমিরের গায়ে ছিটিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ সে মানুষে পরিণত হতো।

নদের চাঁদ নামক নিম্নবর্ণের একজন যুবক হাফসি রাজার কন্যা তারামতিকে বিবাহ করেন। তাদের সংসার জীবন বেশ আনন্দে অতিবাহিত হচ্ছিল। একদিন নদের চাঁদ

www.pathagar.com

তার স্ত্রীকে বলেন কামরূপ কামাক্ষা গিয়ে তার মন্ত্র শেখার খুব সখ। কিন্তু স্ত্রী তারামতি তাকে বিদেশ-বিভূয়ে যেতে দিতে চায়না। অবশ্য একদিন নদের চাঁদ তার স্ত্রীকে বুঝাতে সক্ষম হয় এবং কামরূপ কামাক্ষার পথে পা বাড়ায়।

কামরূপ-কামাক্ষা গিয়ে নদের চাঁদ একজন সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হন যিনি মন্ত্র বলে পাখি ও কুমির হতে পারেন। সন্ন্যাসী নদের চাঁদকে মন্ত্র শিক্ষা দেন। নদের চাঁদ নিমিষেই পাখি অথবা কুমির হতে পারে। এইভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। সে ঠিক করে অচিরেই স্ত্রী তারামতির কাছে ফিরে যাবে। দেশে ফেরার জন্য সন্ন্যাসীকে বলে কিন্তু সন্ন্যাসী তাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। নদের চাঁদ চেষ্টা করে বাড়ি ফিরতে কিন্তু সন্যাসীর মন্ত্রে সে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সন্ন্যাসী একদিন তাকে ছেড়ে দিলে নদের চাঁদ বাড়ি ফিরতে উদ্যত হয় কিন্তু পরক্ষণেই দেখে সে কামরূপ-কামাক্ষার পাড়ে রয়েছে। এইভাবে অনেকদিন অতিবাহিত হবার পর একদিন সন্ন্যাসী অন্যান্য পাখি হয়ে উড়াল দেয় এবং স্ত্রী তারামতির কাছে ফিরে আসে।

নদের চাঁদ দেশে ফেরার কথা শুনে গ্রামের লোক তার বাড়িতে জড় হয় এবং সকল বৃত্তান্ত জানতে পারে। একদিন স্ত্রী তারামতি তাকে বায়না ধরে এবং কুমির রূপে দেখতে চায়। নদের চাঁদ জানায়, পাত্রে মন্ত্র বলে যে পানি রাখা হয়েছে, কুমির হবার পর ঐ পানি কুমিরের গায়ে নিক্ষেপ করলে সে পুনরায় মানুষে পরিণত হবে। একদিন নদের চাঁদ মন্ত্রবলে কুমিরে পরিণত হয় এবং স্ত্রী তারামতি তাকে কুমিররূপে দেখে ভীষণ ভয় পায় এবং দৌড়ে পালাতে চায়। এদিকে পালাতে গিয়ে তার পায়ের ধাক্কায় পাত্রের পানি মাটিতে পড়ে যায়। নদের চাঁদের পক্ষে আর মানুষে পরিণত হওয়া সম্ভব হয় না। এদিকে দু'দিন সে লুকিয়ে থাকে। এভাবে কতদিন চলে। তিনদিনের দিন পাশ্ববর্তী মধুমতি নদীতে চলে যয়। প্রত্যহ মা তাকে নদীর কূলে খাবার দিয়ে আসে। এভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। একদিন এক ইংরেজ সাহেব মধুমতি দিয়ে জাহাজযোগ যাত্রাপথে নদীর কূলে একটি কুমির দেখতে পায় এবং বন্দুক দিয়ে গুলি করে। কুমিররূপী নদের চাঁদের মৃত্যু ঘটে। সেই থেকে এই ঘাটটি 'নদের চাঁদের ঘাট' নামে পরিচিত, যা আজও বিদ্যমান।

গ. লোকপুরাণ

ওলাবিবি

ওলাবিবি বিখ্যাত লৌকিক দেবী। যার পূর্ণনাম ওলাওঠা বিবি। ওলাউঠা (কলেরা) রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে বিশ্বাসীরা একে পূজা করে এবং কলেরা রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁর কৃপা প্রার্থনা করা হয়। বলা বাহুল্য, জনশক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক হতে বাঘের দেবতা হিসেবে পূজিত দক্ষিণারায় ও শিশুদেবতা পঞ্চানন্দের পরই এই দেবতার স্থান।

ওলাবিবির মূর্তি বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকম। হিন্দু প্রধান অঞ্চলে সুশ্রী, গায়ের রং হলুদ, টানাটানা চোখ, নাক উন্নত, ঠোঁট সুন্দর, সমস্ত দেহাবরণে নানাপ্রকার

www.pathagar.com

অলংকারাদি, মাথায় মুকুট পড়ানো, এলোকেশী আকৃতি লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতো। দু'টি হাত প্রসারিত, কখনো দণ্ডায়মান, কখনো শিশুসন্তান কোলে করে আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। মুসলমান প্রধান এলাকায়, খানদানি ঘরে মুসলমান কিশোরীর মতো। জামা-পায়জামা, টুপি, ওড়না পরিধানরত, গায়ে নানা রকম গয়না, পায়ে নাগরা জুতো, এক হাতে আসাদণ্ড।

ওলাবিবিরা সাতবোন- ওলাবিবি, মোলাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদ বিবি, বহড়বিবি, ঝেঁটুনেবিবি ও আসানবিবি। লৌকিক দেবদেবীর মতো ওলাবিবির পূজা কোনো মন্দিরে বা কারো গৃহে হয় না। পল্লির বৃষতলে এর পূজা হয়। ওলাবিবিকে কলেরা এবং মোলাবিবিকে হাম-বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী বিশ্বাসে লোকেরা পূজা করেন। দেশে রোগ মহামারিরূপে দেখা দিলে প্রতিবেশীদের গৃহে গৃহে গিয়ে 'মাগুন' করে শস্য, অর্থকড়ি, ফুল, ফলমূল, সংগ্রহ করে প্রথমে প্রতিনিধিরূপ ওলাবিবির পূজা করা হয়। পল্লির গায়েনরা সারারাত উক্ত দেবীর মহাত্মগান করে থাকে। কারো 'মানত' থাকলে শনি, মঙ্গলবার তা দেয়া হয়। ওলাবিবির পূজায় কোনো মন্ত্র নেই। নৈবেদ্য হিসেবে সন্দেশ, বাতাসা, পানসুপারি কোথাও আতপ চাউল ও পাটালি দেখা যায়।

মাকাল ঠাকুর

মাকাল ঠাকুর পল্লি অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের উপাস্য একটি লৌকিক দেবতা। অধিক পরিমাণ মাছ পাবার প্রত্যাশায় মৎস্যজীবীরা মাকাল ঠাকুরের পূজা করে থাকে। মাকাল ঠাকুরের পূজার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান বা সময় নেই। মৎস্যজীবীরা কোনো জলাশয়ে মাছ ধরার আগে তার তীরে বা পাড়ে এর পূজা করে। এতে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত এবং মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার হয় না। দলের সর্দার নিজেদের ভক্তি ও কল্পনা অনুযায়ী পূজা করে।

নদী বা জলাশয়ের তীরে কিছু জমি পরিষ্কার সমতল করে তার মাঝখানে একটি ছোট বেদী তৈরি করে মাটি দিয়ে ঐ বেদীতে তিনটি থাক করা হয়। বেদীর ঠিক মাঝখানে প্রতীকস্তুপ বসানো হয়। কখনো কখনো প্রতীকের উপর একটি লাল রঙের চাঁদোয়া টাঙানো হয়। প্রতীকটির উপর অংশে সিঁদুর লেপে তার উপর ফলমূল ও তুলসীপাতা বা বেলপাতা রাখা হয়। সামনে একটি ঘট থাকে। পূজার সময় প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

মানিক পির

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মানিক পিরের পূজার্চনা করেন। মানিক পির পশুরক্ষক দেবতা বলে খ্যাত। মঙ্গলকাব্যে মানিকপিরের বহুবিদ মাহাত্ম্যগান বা কিচ্ছাকাহিনির সন্ধান পাওয়া যায়। মানিক পিরের মূর্তি বিরল। এর প্রতীক সমাধি বা ক্ষুদ্র স্তূপই বেশি ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বৃহস্পতি, শনি অথবা মঙ্গলবার মানিকপিরের হাজত হয়। দেশে গো-মোড়ক দেখা দিলে হিন্দু মুসলমান গৃহস্থরা সজলে বারোয়ারী পূজা-হাজত দেয়। চাষীরা মানিক পিরকে খুবই ভক্তি করে। গরু দুধ দেওয়া আরম্ভ করলে প্রথম দিনের দুধ মানিক পিরের নামে দেওয়া হয়। এছাড়া ওঝা বা কবিরাজ গ্রাম বন্ধ কলেরা অনেক মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক করে থাকেন।

www.pathagar.com

পল্লিবাসীদের বিশ্বাস, ওঁঝা ও ফকিরদের এই প্রক্রিয়ার জন্য তাদের গৃহপালিত পশুপাখি মহামারী বা মড়কের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবে।

মানিক পিরের নৈবেদ্য হিসেবে ফলমূল, মিষ্টান্ন, এলাচদানা প্রভৃতি এবং আটা-ময়দা বা চালের গুড়া দুধ (ক্ষীর), গুড়, কলা মিশ্রিত করে শিরনি করা হয়। কেউ কেউ গোলাপ পানি দেন। ইত্যাদি নৈবেদ্য থেকে কিছুটা মানিক পিরকে উৎসর্গ করা হয়। পরে ভক্তরা এগুলো গ্রহণ করেন। নৈবেদ্যর বিভিন্ন দ্রব্যাদি বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাগুন করা হয়।

জিন্দাপির

জিন্দাপির, বড়খাঁ গাজি বা গাজি সাহেব নামে অভিহিত। জিন্দাপির মূলত বনাঞ্চলে ব্যাঘ্রকুলের অধিষ্ঠাতা বলে প্রসিদ্ধ। ইনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদ্রায়ের অন্যতম লৌকিক দেবতা। চাষি, জেলে, বিশেষ করে বনজীবীর জিন্দাপিরকে ভক্তি সহকারে পূজা করে। ফরিদপুর জেলায় জিন্দাপির বা গাজিকে নিয়ে এক ধরনের পালাগান রচিত হয়েছে যা 'গাজির গান' নামে পরিচিত।

গৃহপালিত পশুপাখিদের কল্যাণ কামনা এবং বাড়ি থেকে উইপোকার বংশ ধ্বংস করতে কেউ কেউ বাড়িতে গাজির গানের আয়োজন করেন। যারা নিঃসন্তান, অপুত্রক তারা সন্তান কামনায় গাজির গান মানত করে থাকেন।

গাজি পিরের পূজায় নৈবদ্যে হিসেবে নিরামিষ, চিনির বড় বড় দল, বাতাসা, বীরখণ্ড, এলাচদানা, পাটালি, দুধ বা ক্ষীরের শিরনি দেয়া হয়। সাজি ভর্তি ফুল এবং 'চলন' হিসেবে ক্ষুদ্রাকৃত ঘোড়ার মূর্তি অনেকে দেন।

সত্যপির

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সত্যনারায়ণ বা সত্যপিরের পূজার্চনা করে থাকে। পল্লি অঞ্চলে রোগ মহামারিরূপে দেখা দিলে সত্যপিরের উপর বিশ্বাসী হিন্দু-মুসলমান পিরের দরগায় পূজা হাজত দেন, দরগার ফকিরের দেয়া পিরে প্রসাধনী, বাতাসা ও এলাচদানা গ্রহণ করেন। নতুন গাছে প্রথম ফল ধরলে অথবা গৃহস্থের গরুর বাচ্চা হবার পর দুধ দোহন করে সত্যপিরের থানে প্রদান করা হয়। রোগ নিরাময়ের কামনায় সত্যপিরের প্রসাদি, তেলপাড়া, পানিপড়া, টোটকা, ঔষধপত্র, কবচ, মাধুলি বিতরণ করা হয়।

ঘ. লোকছড়া

লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ বা ধারার নাম 'ছড়া'। মূলত মৌখিক আবৃত্তির জন্য মুখে মুখেই এগুলি রচিত। কেউ কেউ মনে করেন, "ছড়িয়ে আছে বলেই ছড়া।... ভাব ভাবনারা যখন স্পষ্ট দানা বাঁধেনি, ভাষা যখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে চলতে শিখতে কেবল অভ্যস্ত হতে চলেছে, জটিলতা যখন পর্যন্ত গ্রন্থি আঁটতে শিখেনি, সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের রশ্মি যখন মনকে দোলা দিচ্ছিল তখনই এই ছড়াগুলির প্রথম নিদর্শন।"

www.pathagar.com

ফরিদপুর জেলায় ছড়ার সংগ্রহ ব্যাপক। এ সকল ছড়াকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় - শিশু বিষয়ক ছড়া, খেলার ছড়া ও বিবিধ ছড়া। এর উপবিভাগ হলো : ছেলে ভুলানো ছড়া, ঘুম পাড়ানি ছড়া, দুধ খাওয়ানোর ছড়া, বিদ্রূপাত্মক ছড়া, ভর্ৎসনাসূচক ছড়া, ব্যবহারিক জীবনবিষয়ক ছড়া, উৎসববিষয়ক ছড়া, বিবাহবিষয়ক ছড়া, করুণা রসাশ্রিত ছড়া, বৃষ্টির ছড়া, ক্ষেপানোর ছড়া, আবোল-তাবোল ছড়া, হৃদয়বেদনা প্রকাশক ছড়া, প্রার্থনামূলক ছড়া ও কৌতুকপ্রদ ছড়া, খেলার ছড়া, ব্রতের ছড়া, মাছ ধরার ছড়া, গাশ্‌শির ছড়া, কৃষিবিষয়ক ছড়া, নীতিমূলক ছড়া, গোয়ালের ডাক ও গায়েনের ডাক।

ছেলে ভুলানো ছড়া (ঘুমপাড়িন ছড়া)

১.

ঘুঘু সই/তাপুত কই
মামা দিল এটা কেলা
তাও নিল চিলিতি
চিলির নাগাল পাইলাম না
দুধ-কলা খাইলাম না
ছোট তালগাছটা নড়ে চড়ে
বড় তালগাছটা ভাইঙ্গা পড়ে
ডিপ্‌পুস।

২.

তাই তাই তাই
কুটি আতের মোয়া খাই
মোয়া নিলো শিয়ালে
কি খাবানি বিয়ানে।

৩.

আটের ঘুম/ঘাটের ঘুম
ঘাটে বইসা কাঁন্দে
মা গ্যাছে ঘাটে
বাপ গ্যাছে আটে
আয় ঘুম আয়।

৪.

ধিনা ধিনা ধিনা
ছাগলে খাইলো ধান
কোথায় গেল নানাজান
নাচন কিনা আন

www.pathagar.com

বাগুন ক্ষেতে আটু পানি
নাচে আমার খোকামণি
বাগুন গেল ভাইস্যা
খোকা উঠলো নাইচ্যা।

৫.
সালমা নাচে আয় আয়
গুগরি কিনা দিবো পায়
কোন বিটারা আটে যায়
সালমার নাচন দেইহা যা।

৬.
আটের ঘুম ঘাটের ঘুম
ঘাট গড়াগড়ি যায়
আয়রে ঘুম তাইরে ঘুম
খোকার চোখে আয়।

৭.
আয়রে চান নইড়া চইড়া
ঠেংড়া মাছের ঘাড়ে চইড়া
গাই দুয়াইলি দুধ দিবো
বাড়া বানলি খুদ দিবো
চইড়া আইলে ঘোড়া দিবো,
আয় চান আয়
সালমার কপালে টিব দিয়া যায়।

পুতুল খেলার ছড়া

১.
আমতলা ঝামুর ঝুমুর
কাঠালতলা বিয়্যা
ঐ আসতেছে নন্দের জামাই
সেত্তইর গামলা নিয়া,
ও সেতই খাবো না
মেয়্যা বিয়া দিবো না
মেয়্যার মাথা লাম্বা চুল
কোথায় পাবো কুসুম ফুল
কুসুম ফুল ঝোলে

www.pathagar.com

জামাই আইস্যা ভোলে
জামাইর ঘরে নুয়া ধান
ঢেকুর ঢেকুর বাড়া বান।

২.
হিরু পিরু তালের রস
হিরুর বিয়া ভাদ্রমাস
সকিনার মারে পাঠায় দে,
সকিনার মা যাবি না
হিরুর বিয়া আবি না,
সকিনার মা যাবে
হিরুর বিয়া অবি;
পালকি যাবি কোনহান দ্যা
জরিনার মার গাবতলা দিয়া
গাছ ভার পাকা গাব
বিয়ার খরচ অবি একলাক।

৩.
একশো গাছে দু'শো ফুল
মামুর বিয়া বহুত দূর,
আয়না আনচো, কাহই আনছো
মিছরি আনচোনি?
ঝারন বাক্স ঘুচায় দেহো
মিছরির আহাল কি।

৪.
উস্তা কুটলাম চাক চাক
জামাই আইলো ঝাঁক্ ঝাঁক্
আইচে জামাই বসবার দে,
থান ধুইয়া নাস্তা দে
লাল মোরগটা জবা দিয়া
জামাইর পাতে দে,
ধামা ধামা পিঠা বানাইয়া
জামাইর পাতে দে।

৫.
এই ছেমড়া বেহায়া
বউ নিয়া যা দেহায়া
ভাঙ্গা ঘরে দিলাম বাড়ি
বউ হেলায় যা আমার বাড়ি।

www.pathagar.com

বৌছি বা ছি-বুড়ি খেলার ছড়া

১.

ছি ছি করবো কি
ঘন্টার আগে দৌড়াইছি
ঘন্টার আগ, বনের বাঘ
ফেওচ্যা মারি আঁক ঝাঁক।

২.

উত্তরে গুরুম গুরুম
পশ্চিমে বিয়া
নারকেল ভাঙ্গি জাতা দিয়া।

৩.

চি খুৎ কুৎ তাইরে নারে
ঘন্টা বাজে বারে বারে
এক ছি দুই ছি কচুর ডাটি
ধর্ম মাছের কর্ম কটি।

৪.

কঞ্চি কাটি
কলম কাটি
আর তো কাটি না,
আর বছর বিয়া করি
বউ তো আসে না।

৫.

গেছিলাম নল কাটিতে
পাইলাম একগাছ মালা
তোরা বউ বউ খেলা।

হাতটা বুটি খেলার ছড়া

একা নালী
বেকা নালী
কই গেলিরে কামার মাগী,
কামার মাগী ডুক ডুকানি
ঘরের মাচায় উঠলো পানি,
আপডুন ডাপডুন
করিমন ঠাকুর।

www.pathagar.com

রুমাল চুরি খেলার ছড়া

চান দোর চান দোর
কার জন্যি কাঁন্দ,
গুয়াইয়া হালার গরু আইছে,
কেমন গরু?
লাল কে লাল
শিং কেমন?
ঘোড়ার বাল্।
একটা গান গাও দেহি,
আতিল ডুকডুক
পাতিল চুরা
বাইড়ারে হিরু চুড়া।

দুক দুক খেলার ছড়া (হাডুডু খেলা)

১.
এ্যালহা আছি
উড়নে বাছি
দুই ঠ্যাং করাচি-করাচি-করাচি।

২.
আমার খেড়ু মারিয়া
কে যাবিরে সরিয়া
শিয়ালের খাল শকুনে খায়
গন্দে গন্দে পরান যায়।

ঝুল্লু খেলার ছড়া

১.
ঝুল্লুরে মিয়া ভাই
নাও ট্যালা দাও বাড়ি যাই
মা যদি থাকতো
ভোলা ধইর‍্যা কাঁনতো।

২.
মিয়া ভাই বাড়ি আয়রে
তাওই আইস্যাছে
নিহার কথা হুইনা ভাবী
নাচন উঠাইছে
মিয়া ভাই বাড়ি আয়রে।

www.pathagar.com

ওপেনটিবাইস্কোপ খেলার ছড়া

ওপেনটিবাইসকোপ
লাইন টানা তেইশ কোপ
সুলতানা বিবিআনা
লাটাবিবির বৈঠকখানা
লাট বলেছে যেতে
পান-সুপারি খেতে
পানের আগায় মরিচ বাটা
ইস্কাপনের ছবি আটা
হাত ছেড়ে দাও যাদুমনি
যেতে হবে অনেকখানি
কলতলা মাজাঘসা
বেল ফুলের চিরুণি
এমন খোপা বেঁধে দেবো এখুনি।

ঘুড়ি উড়ানোর ছড়া

১.
দিলাম কোপ মারলো প্যাচ
মাজনা সুতায় কাটলো ঘ্যাচ
ভৌম ঘুড্ডি কেনইয়া দে লাট
ভৌম লটকা পেট কাটারে আট।

২.
চিলা ভিলা কৌড়া করে বুকটান
পতেং লাট খাইয়া কয় ডোর আন।

জামাই মস্কারার ছড়া

১.
ইটিং বিটিং জামাই তিটিং
তাতে পর মাখন বিটিং
জামাইর ব্যাটা নড়ে চড়ে
সাত গণ্ডা ডিম পাড়ে,
ডিম লইয়া নগা ডগা
ফুল ফুটে থোকা থোকা,
ফুলের নাম কুঁড়ি
বাগুন তাগুন ভুইল্যা গেলি
নাককাটা ছুরি।

www.pathagar.com

২.
অলদি কটুলাম ঠুকুর ঠুকুর
মরিচ কুটলাম পায়
একখান অলদি ছিটা গেল
নন্দের জামাইর গায়,
নন্দের জামাই কে?
নথ গড়াইয়া দে,
নথের ভারে হাঁটতে পারি না
কান্দে কইরা নে।

অভিমানের ছড়া

আমার বুবুর চেকুন গলা
বাঁশি বাজে কদমতলা
কদমের ফুল ফুইটাছে
হাতের চুড়ি ভাইংগা চে,
হাটে যোনো যাওয়া অয়
চুড়ি যেনো আনা অয়;
আনবার কইচি রেশমি চুড়ি
আলা অইচে কাঁচের চুড়ি
কাঁচের চুড়ি নিবো না,
গেরস্থালী করবো না।

ক্ষ্যাপানোর ছড়া

১.
ঐ ছ্যামড়া তোর নাম কি বাংগাল
পুটি মাছের কাংগাল
গাংপাড় যাইস না
পুটি মাছ খাইস না।

২.
চেরাগ আলী দারোগা
বয়জা পারে বাবোড়া
বউ এর সাথে রাগ কইরা
আণ্ডা নিল ভাগ কইরা।

৩.
ঐ চ্যামরা তোর নাম কি
হ্যারিকেনের বাততি
ধাপুর ধুপুর নাত্তি ॥

www.pathagar.com

৪.
ঐ চ্যামরা তোর কানে ক্যাদা
ভূইয়া বাড়ির কুততে খ্যাদা।

৫.
ঐ চ্যামরারে ধর
কল্লা ভাজি কর
ত্যাল নাই নুন নাই
আল্লা-বিল্লা কর।

৬.
আদা পাদা ঘোড়ার নাদা
চরকি দিলো টান
আদার ভাতার ক্ষুইদ্যা মুসলমান।

৭.
আহান পিঠা পাহান পিঠা
তার মধ্যি নাই মিঠা চিঠা
আস্তা একটা ভাওয়া ব্যাং
তোর নানীর পাছা ঠ্যাং।

৮.
ল্যাংড়া গেল বাবুর বাজারে
তিন পয়সা দে কিনলো কাঁঠাল
ভোচকা ধইরা টান
আরও কয় আম কিনা আন।

৯.
আমার খালার চিক্কন গলা
বাঁশি বাজায় কদমতলা
খালাগো খালা তোর বড় গলা।

১০.
ন্যাংড়া দুলা ভাই কাইল আইল্যানা ক্যা
আসতে দিলাম তাড়াতাড়ি
বোড়ই গাছে চাঁদ মারি
ন্যাংড়া দুলা ভাই কাইল আইল্যানা ক্যা।

আবোল তাবোল ছড়া

১.
আদাটুনি পাদাটুনি দুক্কা টুনির ছাউ

www.pathagar.com

যে টুনিতে পাদ দিছ হাইস্যা কথা কও
হাসতে মানা নাই কাশতেও মানা নাই
আমিতো কথা কবো ভাঙ্গা নৌকায় চড়বো
মাচার তলে হেড়ডা ফুইলা উঠলো নাকডা
ডুপ্‌পস! ডুপ্‌পস! ডুপ্‌পস!

২.
কাওয়া বলে কা
মৃধা বাড়ি যা
মৃধা কইলো চুৎমারাণী
ভিক্ষা কইরা খা।

৩.
মাসি ক্যাদার তলে থাসি
কাদা ভুর ভুর করে
এইতো মাসি মরে।

৪.
ভুইয়া পথে পড়ে হুইয়া
খ্যাক শিয়ালে দেইখ্যা গ্যাল
কাথ্যা মুড়ি দিয়া।

৫.
আয় বৃষ্টি নইড়্যা চইড়্যা
ট্যাংরা মাছে ঘাড়ে চইড়্যা,
ট্যাংরা মাছ ভালো
ঝর মরাইয়্যা আইলো।

৬.
দক্ষিণা ছাড়িল বাউ
বানিয়া ছাড়িল নাও
দেউয়া তুমি ফির‍্যা যাও।

৭.
ইটা ক্ষ্যাতে ছিট্যা ম্যাঘ
ব্যাঙ কাশে খ্যাক খ্যাক।

৮.
ম্যাঘের মাথায় কাউয়ার বাসা
দেউয়া নাইম্যা ভেউয়া ডাসা।

www.pathagar.com

৯.
ওগো ম্যাঘা রাণী
শাক থুইয়া ফ্যালা পানি
কচু ক্ষ্যাতে হাটু পানি
পাট ধুইতে টানাটানি।

রোদ তোলার ছড়া

১.
কচুর পাতায় চিনা জোক
চিন চিনাইয়া রোদ ওঠ।

২.
রোইদের নাম অলদি
রোইদ ওঠেক জলদি।

মাছ ধরার ছড়া

১.
সকলের বড়শি ধলা কালা
আমার বড়শি সবরি কলা
টপ কইরা আইস্যা গিলা ফ্যালা।
ঠোক দিলে পোক পড়ে
গিলা ফ্যালাইলে প্যাট ভরে।

২.
আহার মাটি পুড়া ছাই
বড়শি বাইয়া বাড়ি যাই
যার যে মাছটা ধরে
খইস্যা খইস্যা পড়ে।

৩.
থুরি বড়শি পদ্মাজল
গলগল তল কর
টিপ দিলে দিব টান
বাইজা উঠলি বোয়ালহান।

গাশশির ছড়া

১.
গাশশি জাগো জাগো
ভালো কইরা জাগো

www.pathagar.com

আশ্বিনে রান্ধে কার্তিকে খায়
যে বর মাঙ্গে সেই বর পায়।

২.
গাশশি জাগো জাগো
ভালো কইরা জাগো
আশ্বিনে রান্ধে কার্তিকে খায়
যে বর মাঙ্গে সেই বর পায়।
গাশশি জাগো জাগো
অলদি জাগো, তুলসী জাগো
কলা জাগো, চালুন জাগো
নারকেল জাগো
ভালো কইরা জাগো।

হাস্যরসাত্মক ছড়া

১.
চললো গাড়ি
বোয়ালমারী
টিকিট কর তাড়াতাড়ি।

২.
আমরা দুটি ভাই
কপি তামুক খাই
ছিটকি ডালে পুটকি থুইয়া
বিহরা বাজাই।

৩.
মামু বাড়ি তালগাছ
কাটতে লাগে ছয় মাস
মামু তুমি সাক্ষী
পানির তলে পক্ষী
উঠায় আনো দেহি, ফোঁটা দেই
কন্যা আনো বিয়্যা দেই।

৪.
বাশকোড়ালি
কুটি কুটি সোয়ারী
মা কয় যাও বাপ কয় যাও
আমার মনতো টলে না
ফুপুরে উঠায় দাও।

www.pathagar.com

৫.
ছাই মাটি জ্বললো
জল পুতুলের বিয়া
আমি ছেমরি জানি না
আমার ননদের বিয়া।

ঙ. ভাটকবিতা

১.

পালিয়া তোরা যাবি (কোথোয়)

রচনা : কবি আবদুল গফফার

পালিয়ে তোরা যাবি কোথায় ঘরের দরজায় আজরাইল,
তোদের জন্য হয়েছে মৃত্যু বানার বিলাসীর।
দ্বিতীয় বিয়ে কেউ করো না উপদেশ পাড়া পড়শির
তোদের জন্য হয়েছে মৃত্যু বানার বিলাসীর।
রচনা : কবি আবদুল গফফার

পয়ার সুর

শোনেন ভাই[২] বলে যাই সত্যি এক ঘটনা, এই ঘটনা শুনলে পরে মনে মানে না। চোখে আসে পানি ২ আমরা জানি ফরিদপুর জেলায় আলফাডাঙ্গার ঘটনা ভাই ঘটেছে ঢাকায়। গ্রাম রুদ্রবানা ২ আমার জানা তথায় বসত করে মোমিন উদ্দিন নয় মেয়ে একটি তাহার ছেলে মেয়ে বিলাসী। মেয়ে বিলাসী ২ মেধাবী চেহারা কম নয় দশ ক্লাসে পড়ার সময় বিয়ে হয়ে যায়। গ্রাম ধুলজোড়া ২ কপাল পুড়া রুস্তম আলী নাম, তার ঘরে জন্ম নয় রাজিব জল্লাদ। সেদিন ভালবেসে ২ শখ করে পিতায় বিয়ে দিল, একে একে কয়েক বছর কাটে তার সাথে। সুখের সংসার তার ২ কি বলব আর চলে যায় ঢাকায়, একে একে তাহার ঘরে দুটি সন্তান হয়। তার বড় মেয়ে ২ হয় রজনী ছোট আলামিন, এদেন রেখে বিয়ে করে কুলাঙ্গার রাজিব। নাম আফরিন ২ সুরের বীণ বাজে তালে তালে রূপ দেখিয়ে রসিক ভ্রমর পাছে পাছে ঘোরে। মাথায় লম্বা কেশ ২ দেখতে বেশ খোপায় গোলাপ ফুল তাই দেখে কেন্দে মরে হারেজ আর জহুর। মাথায় ক্লিপ আটা ২ আপসেট আটা আপচুন দিয়ে ভাই সব সময় সাজিয়া থাকে হিন্দুদের গোসাই। চোখে কাজল মাখা ২ যায়গো দেখা মৃগ আখির মত বুক তার উঁচু উঁচু আর বলিব কত। নাকটি হইছে খাঁড়া ২ দেখছে যে জন মুখে তার মুক্তার মালা ফটিকের মতন। ঠোঁটে রং লাগায় ২ যায় চলিয়া মেয়ে আফরিন নাইট ক্লাবে দেখা দুষ্ট রাজিব। প্রথমে পরিচয় অভিনয় শেষে যাহা হলো। এই ডাইনির কথামত বিলাসীকে জ্বালাতো। দিত যৌতুকের চাপ ২

কোন অভাব ছিল না কো তার, স্বামী রাজিব চাকরি করতো সাপ্লাই নাইট গার্ড। দিত জ্বালাতন ২ নির্যাতন আর সহিব কত সব কথা খুলে বলত শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে। তাদের সাফ জবাব ২ করবেনা মাপ যৌতুক নাই বা পেলে বিলাসীর খাবার না দিয়ে বেঁধে রাখতো খাটে। এমনি কত কি ২ ভণ্ডামি করতো তাহার সাথে তবু বিলাসী কেন্দে কেঁন্দে স্বামীর পায়ে দরে। করে এই মিনতি ২ হয় পরিণতি হায়গো দয়াময়, এখন আমি কি করি যাইবো কোথায়। বলে বাবার কাছে ২ খবর আসে জানায় সব ঘটনা, স্বামীর ঘর করতে হবে দেয় তারে সান্ত্বনা। কিন্তু আর পারে না ২ আর সহে না সইতে নির্যাতন আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত সে করে গ্রহণ। ভাবে এক মরি ২ আর করবো কি সন্তানদের-ই রেখে বড় হলে দুঃখ পাবে সৎ মায়ের কাছে। তাইতো একই সাথে ২ ভর দুপুরে ঘরের দরজা দিয়ে, ছাদের উপরে চলে গেল সংগে তাদের নিয়ে। নিল কেরোসিন তেল ২ হয়তো ডিজেল সাড়া অঙ্গে মাখে প্রথমে আগুন ধরায় রজনীর গায়ে, রজনী কেঁন্দে কয় ২ শোন আম্মায় কি করছো গো তুমি, আগুন দিলে তুমি মাগো পুড়ে মরবো আমি। কথা বলতে বলতে ২ একই সাথে আগুন ধরায় দেয় দাও দাও জ্বলে আগুন নিভাবার কেউ নাই। তাদের চিৎকার শুনে ২ ফ্লাট থেকে আগুন দেখতে পায়, এই সাথে পুড়ে ভাইরে মরছে তিন জনায়। তারা উপর থেকে ২ ছুড়ে মারে কলসীর যত জল তাকে কি আর নিভে আগুন মরে যায় রায়হান। বাকি দু'জনারে ২ হাসপাতালে চিকিৎসা করতে নেয়, একদিন বেঁচে থেকে রজনী মারা যায়। বলি অন্য সুরে।

ধুয়ার সুর

টাকা ভাইরে দেখতে গোল, টাকায় বাঁধায় গোণ্ডগোল, টাকায় লোকের শত্রুতা বাড়ায়। দুর্বা বনের বড়ার কাঙ্গাল মহাসুখে নিদ্রায় যায়, টাকাওয়ালার মহাচিন্তা ও সুখ হয় না দোতলায়।

ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে, বিলাসীকে চিকিৎসা করে, ডাক্তারগণ শুনে কেন্দে কয় কিভাবে করছে নির্যাতন, সেবাকারা সেবা দেয়। বুঝে না তাদের অবুঝ মন তিন দিন পর যায় বিলাসীর জীবন।

সারা দেশে পত্রিকা যত, ছাপে তারা মনের মত, বিস্তারিত ছাপে বোয়ালমারী বার্তায়। ২ টাকা দিয়ে এই কবিতা কিনে নেন ভাই সকেলায় জানতে পারবেন সব ঘটনা - ও ভাই কি ঘটছে বানায়।

লাশ আসার কথা শুনে, হাজার হাজার জনগণে, গ্রামে ভিড় জমায়। সন্ধ্যার পরে কফিন আসলে ঘিরে ধরে জনতায় ভীড় সামলাতে হিমশিম খাইলো, ও খাইলো ঐ বাড়ির সবাই।

নয়নে সবার অশ্রু ধারা, হয়ে সবাই পাগল পরা, বেশি কাঁদছে বৃদ্ধ বাবায়। জড়িয়ে ধরে চিৎকার দিয়ে কানছে মাতা মনোয়ারায়। ধীরে ধীরে বাড়ির পাশে - ও তার কবর দেয়া হয়।

নিয়ম নীতি আছে যতো, ইসলামী শরিয়াত মতো, দাফন কাফন শেষ করা হয়। কুলখানী হয় নিজ এলাকায় ছেলে-মেয়ের দাফন হলো ধুলজোড়ায়, যোগিবরাট গোরস্থানে - ও সেই পিতার এলাকায়।

www.pathagar.com

হায়রে আমার নিষ্ঠুর পিতা, বিদায় বেলা হলো না দেখা, শরীক হলো না জানাযায়। এমন পিতার নাইকো দরকার বলছে সকল জনতায়, ধুয়ার সুর বাদ রাখিয়া - ও ভাইরে অন্য সুরে যায়।

ভাটিয়ালি সুর

পালিয়ে তোরা যাবি কোথায় ঘরের দরজায় আজরাইল
তোদের জন্য হয়েছে মৃত্যু বানার বিলাসীর।

১. বিলাসীর একমাত্র ভাই সেলিম তাহার নাম,
বাদী হয়ে মামলা দিয়ে সারছে এবার কাম।
শ্বশুর-শ্বাশুড়ি হয় আসামী - ২
আরো হয়েছে আফরি
তোদের জন্য হয়েছে মৃত্যু বানার বিলাসীর।

২. রাজিব আলী হয় গ্রেফতার কারাগারে রয়,
ধুকে ধুকে মরছে বেটা যৌবন হচ্ছে ক্ষয়।
আগে তো বুঝতে পারে নাই - ২
ঘরের দরজায় আজরাইল,
তোদের জন্য হয়েছে মৃত্যু বানার বিলাসীর।

৩. থানা থেকে মামলা এবার চলে গেছে কোর্টে,
উকিল মোক্তার পাইক পেয়াদা পয়সার জন্য ছোটে।
রায়ের দিন ঘোনায়ে আসছে - ২
আদেশ যেন হয় ফাঁসির
তোদের জন্য হয়েছে মৃত্যু বানার বিলাসীর।

৪. আসামীদের পক্ষ থেকে হুমকি বার বার,
মামলা তুলে না নিলে করবে ছাড় কার।
এই হুমকিতে কাজ হবে না - ২
জিডি করছে ভাই সেলিম
তোদের জন্য হয়েছে মৃত্যু বানার বিলাসীর।

৫. নামটি আমার আব্দুল গফফার আপনাদের জানাই,
বসত ভিটা চাপলডাঙ্গা বোয়ালমারী থানায়।
কোরবান আলী দিচ্ছে বলে - ২
উঁচু করে চলো শির,
তোদের জন্য হয়েছে মৃত্যু বানার বিলাসীর।

www.pathagar.com

২

ইরাকি নেতা সাদ্দাম হোসেন

রচনায় : কবি আবদুল গফফার শেখ

বিছমিল্লাহির রহমানের রাহিম

১. আমরিকানদের মনের আশা পুরা হইল এই ধরায়।

২. সাদ্দামেরে দিল ফাঁসি তাইত জেলেখানায়
পহেলাতে শুরু করি বিছমিল্লা বলিয়া
তাহার পরে নবির পায়ে ছালামও করিয়া
তার পরে ছালাম জানাইলাম পিতা মাতার পায়
এ ভুবন দেখিলাম আমি যাদের ওছিলায়।
তারাই হল সন্তানের পির বলছে নবী মোস্তফায়। ঐ

৩. তারা যদি ছোট কালে, না দেখিত মোরে
একটা দিনও বাচিতাম না এই দুনিয়ার পরে
জীবন ভরে যদি কেহ ঘোরে কাধে লইয়া
একদিনের হক পুরা হয়না নবি গেছেন কইয়া
কপাল তাহর পুড়ে যাবে সেই মাকে যেকষ্ট দেয়। ঐ

৪. তারপরে ছালাম জানাইলাম শ্রোতা বন্ধুগণ
সাদ্দামের কাহিনি কিছু শোনেন দিয়া মন
সিংহপুরুষ ছিল তিনি বিশ্ব জোড়া নাম
যাহার হাকে কেঁপে উঠত কাফেররা তামাম
ইরাকেতে জন্ম তাহার ছালাম জানাই তার রওজায়। ঐ

৫. ১৯৩৭ সালের ২৮শে এপ্রিল
আওয়াজা গ্রামে এল সারা মায়ে কোলে
হুসাইন আল মজিদ ছিল তাহার পিতার নাম
পেপার পড়ে এ সব কথা জানতে পারিলাম
ছোট কাল হইতেই তাহার গজ্জন ছিল বাঘের ন্যায়। ঐ

৬. তাইত তাহার বাপ চাচারা বলত গর্ব করে
তার বয়সের সকল ছেলে ভয়েতে পালায়
শিক্ষকরা কয় এমন ছেলে বিশ্বটারে করবে জয়। ঐ

৭. লেখাপড়া যাহা কিছু করিয়াছেন তিনি
মাস্টারেরা ভালবাসত পেপার পড়ে জানি
২০ বছর বয়সে তিনি হইল বড় নেতা
তাহার সামনে মাথা তুলে কয়না কেহ কথা।
১৯৫৮ সালে বার্থ পার্টির সে প্রধান হয়। ঐ

www.pathagar.com

তার পরে সে বার্থ পার্টিরে আনছে চালাইয়া
ইরাককে বড় বানাইল ক্ষমতায় বসিয়া
১ দিন নহে ২ দিন নহে ২৫ বছর ধরে
ইরাকের সে প্রধান ছিল দেখলাম হিসাব করে
শিয়া নামে আর ১ জাতি আছিল তার এলাকায়
সাদ্দামেরে দিল ফাঁসি কেমন জেলখানায়। ঐ

৮ শিয়া যারা ছিল তারা সাদ্দামের বিরোধী
ইহুদী বেদীনদের সাথে চলে নিরবদি
ওদের ছিল চলা ফেরা ইহুদীদের সাথে
দেশের যত গোপন খবর লাগিল বলিতে
জানতে পেরে সাদ্দাম তাদের আটকাইল জেলখানায়। ঐ

৯. সাদ্দামের ফাসি দিল কেম জেলখানায়
সাদ্দাম হোসেন বলে দিল দেশবাসির তরে
দেশের কথা যদি কেহ বাইরে তুলে ধরে
রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হবে পাবেনা রেহাই
ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হবে তাহার ক্ষমা নাই
ঔ কারণে কিছু শিয়া মরেছিল সে সময়। ঐ

১০. নিজের আইন বাস্তবায়ন করে গেছে তিনি
জামাইকেও মৃতদণ্ড দিয়া ছিল যিনি
অন্যের বেলা যাহা করছে নিজের বেলাও তাই
ন্যায় বিচার করিত তিনি হিসাবে যা পাই
বেদিনেরা সুযোগ খোঁজে ধরব ওরে কোন কায়দায়। ঐ

১১. এভাবেতে সাদ্দাম যদি আইন চালু করে
ইসলামি আইনে যাকে দুই জাহান ভরে
আমাদের এ শয়তানি চাল খাটাইব কোথায়
যেভাবে হোক আনবো তারে হাতেরও মুঠায়
কুয়েতের আমির সাহেবকে সুন্দরী রমণী দেয়। ঐ

১২. দেখি নাই নয়নে আমি শুনিয়াছি কানে
সত্য মিথ্যা সকল কিছু আল্লাপাকে জানে
কুয়েতের আমিরের নাকি ৩৬টা বউ
বুশের বংশ থাকতে পারে ওর ভিতরে কেউ
যার কারণে পালাইয়া গিয়াছিল আমেরিকায়। ঐ

১৩. এক জায়গাতে বাস করিলে দুটি জমিদার
মধ্য মাঝে কিছু কথা হতে পারে তার
সেরকম ঘটনা হল ইরাক আর ইরান
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল ২ দেশের প্রধান
বড় শয়তান আমেরিকানরা বাতাস দেয় সাদ্দামের গায়। ঐ

www.pathagar.com

১৪. ইরানেরা বন্ধু তোমার বেশি কথা বলে
তাইত আমি কান্দি বন্ধু বুক ভিজাইয়া জলে
ইরানেরে হামলা কর সর্বশক্তি দিয়া
যাহা লাগবে দিব তোমার ঘরেতে পৌছাইয়া
তখন সাদ্দাম পড়েছিল ঐ শয়তানের ছলনায়। ঐ

১৫. গোলা বারুদ বোমা দিল ইরানকে মারবার
আমেরিকানরা দাবি করল তেল দেবে আমার
সাদ্দাম সেদিন বলে ছিল আমেরিকানের তরে
চুক্তির বিনিময় তেল দিব আমেরিকান বাজারে
যুদ্ধ যখন শুরু হইল চলেছিল বছর নয়। ঐ

১৬. অস্ত্র দিল আমেরিকানরা মারতে মুসলমান
চুক্তি ছাড়াই তেল নিল তার মনেরও মতন
দেশের সম্পদ চলে গেল পাবনারে কূল
তারপর যখন বুঝল দুই দেশ কী হইতেছে ভুল
দেশের সম্পদ চলে গেল পাবনারে কূল
৮/৯ বছর চলার পরে শেষে যুদ্ধ বন্ধ হয়। ঐ

১৭. কত ক্ষতি হইয়াছিল ঔ যুদ্ধের সময়
সকল কথা লেখলে আমার খাতায় ধরার নয়
ধনি দেশ বলিয়া তারা আবার হইল পুরা
মোদের মত গরবি হলে হাতে থাকত খুরা, (তাল)
৭১ কথা ভাবলে সকল কিছু বুঝা যায়। ঐ

১৮. উল্টা চাপ দিতে লাগিল সাদ্দামকে আবার
চুক্তিমত তেল দাও তুমি বলছি বারে বার
সাদ্দাম বলে চুক্তির চেয়ে নিয়া গেছ বেশি
তাই শুনিয়া বুশ শয়তানের মুখে নাইরে হাসি
মধ্য মাঝে দূরের থেকে সাদ্দামেরে ভয় দেখায়। ঐ

১৯. ইরাকে আসিয়া বুশ দেখতে ভাল করে
কুয়েত ইরাক ইরান আছে দুনিয়ার তেল ভরে
কেমন করে এ দেশ গুলা দখল করা যায়
আমার দেশের মাটির তলে কিছু নাহি হয়
হিরা মুক্তা সোনাদানা মুসলমানের পার তলায়। ঐ

২০. সাদ্দাম হোসেন বলে আমার কথা ছিল যাহা
সকল কিছু তোমার সাথে পুরা করছি তাহা
আরপরেও নানান ভাবে চাপ দেয় সাদ্দামেরে
সাদ্দাম ভাবে মাথা নত করি কেমন করে
কুয়েতের আমিরসাব তখন বুশকে জায়গা দিতে চায়। ঐ

www.pathagar.com

২১. এই ঘটনা সাদ্দাম যখন জানিতে পারিল
সাথে ২ কুয়েত দেশটা দখল করে নিল
কুয়েতের আমির পালাইল যাইয়া আমেরিকায়
কুয়েতটা ইরাকের অংশ আলাদা দেয় নয়
খবরের কাগজে পড়ে সকল কথা পাওয়া যায়। ঐ

২২. সেদিন যদি আরব দেশের সকল নেতা মিশে
কুয়েত ইরাক সমাধাটা করত সবাই বসে
তাহা হইলে হারাতাম না এমন ১ জন বীর
ইসলামের লাগিয়া কে আর উচু করবে শির
এখনও ডুবে নাই বেলা বেদীনের দল দাও তাড়ায়। ঐ

২৩. ওদিক যখন আমির সাবা গেছে আমেরিকায়
জর্জ বুশ বলে ধরব ওরে এইটার ও ছিলাম
বড় ২ কয়েকটা দেশ ১ বারে আসিয়া
ইরাকে হামলা করছিল দেখছিলাম ভাবিয়া
ছয় লক্ষ টন বোমা শুনি ফেলেছিল সে সময়। ঐ

২৪. তাতেও সাদ্দাম টিকে ছিল ৩ মাস যুদ্ধ করে
পরাজয় হইয়া তারা দেশে গেল ফিরে
ইরাক ইরান যুদ্ধ করল ৮ বছর দিন রাত
তা নাহলে ঐ কাপেরদে হইতো কুপোকাত
সাদ্দামেরে বাবা কইয়া পালাইত সব চোরায়। ঐ

২৫. ইরাক ইরান ৮ বছরে সে ক্ষতি হইছিল
৩ মাসের যুদ্ধেতে তাহার অনেক বেশি হল
তারপর আবার কোনভাবে সাজাইল সংসার
জর্জের ছেলে বুশ শয়তানে ঘাড়ে লাগল তার।
রাসায়নিক অস্ত্র আছে এই বলে ধুয়া ছড়ায়। ঐ

২৬. সাদ্দাম বলে এমন কিছু আমার কাছে নাই
বুশ বলে আমি সেটা বিশ্বাস নাহি পাই
অবশেষে লোক আসিল দেখিবার লাগিয়া
মিথ্যা রিপোট দিল তারা বুশের কাছে যাইয়া
বুশের কাছে ঘুষ খাইয়া এসেছিল মনে হয়। ঐ

২৭. সাদ্দাম তখন এ কথাটা করল অসিকার
কোন কথাই কাম হলনা ধরলো আবার তার
২০০৩ সালে মার্চ আবার হামলা করে
সবগুলি দেশ নিষেধ করল বলে বারে বারে
এবারে করিলে হামলা হবে তা বড় অন্যায়। ঐ

www.pathagar.com

২৮. সৌদি আরব ঘাটি দিল কুয়েত দিল ঘাটি
বোমার উপর বোমা ফেলে পুড়ায় দেশের মাটি
তারপরেও টিকে ছিল ১০ মাসের উপরে
বেঈমানি করিল তাহার নিজের কমান্ডারে
অর্থের লোভে গোপনেতে হাতের অস্ত্র ছেড়ে দেয়। ঐ

২৯. সাদ্দাম যখন বুঝতে পারল এ সকল কারবার
ছিল যারা ছেলে মেয়ে সংসারে তাহার
বলল তোমরা যার যার মত যেথায় মনে চায়
যাও চলিয়া আমি গেলাম আমারও রাস্তায়
এই বলিয়া আত্মগোপন হইল যাইয়া ১ জায়গায়। ঐ

৩০. দুটি ছেলে মরা গেল বিমানের হামলায়
ইন্নালিল্লা পড় আমার মুসলিম ভাই সবায়
মা ও মেয়ে আছেন বেচে অন্য দেশে যাইয়া
বাঁচিতে পারলোনা সাদ্দাম গর্তে লুকাইয়া
৫ কোটি টাকার লোভে তার বড়ি গার্ডে কইয়া দেয়। ঐ

৩১. ৬ হাত লম্বা, ৪ হাত আড়ে ঐ গর্তের ভিতরে
না খাইয়া ৩ মাস ধরে ছিল কেমন করে
টাকার লোভে যে বডি গার্ড ধরাই ছিল তারে
টাকা পায় নাই জেলের ভিতর রাইখা দিছে তারে
অমানসিক নির্যাতন চালাইল যখন ধরা পায়। ঐ

৩২. এ দিকেতে ইরাক যখন দখল করে নিল
তেল সহ ইরাকের সম্পদ চুরি শুরু হল
যাদুঘর আর রাজ প্রসাধে যাহা কিছু ছিল
আমেরিকান ঐ সেনারা তা গাট্টি বেধে নিল
কিছু ২ পড়ছে ধরা দেখেছি তা পত্রিকায়। ঐ

৩৩. অনেক দিনের আশা ওদের পুরা হইয়া গেল
সাদ্দামের কি হইল তাহা শোনেন ভাই সকলে
ঠিকমত তার খাইতে দেয়না করে অত্যাচার
মধ্য মাঝে আদালতে দেখা যায় আবার
তখনও সে বলে ওঠে আমি তোদের চিনি নয়। ঐ

৩৪. আদালতে আছেন যারা বুশেরই গোলাম
তাদের কথা সাদ্দামেরে ফাঁসি দেওয়ার কাম
অবশেষে দুজাইলের গণ হত্যার দায়
সাদ্দামের হইবে ফাঁসি দিয়া দিল রায়
সাদ্দাম হোসেন বলে ছিল এই রায় আমি মানি নয়। ঐ

www.pathagar.com

৩৫. বিশ্বনেতা শুনে কথা দিল তারা বাধা
কারো কথা মানিলনা এ মালিকি গাধা
২০০৬ ডিসেম্বরে ৩০ তারিখ ভোরে
ঈদের দিনে দিল ফাসি বল কেমন করে
ফাসির কাষ্টে সাদ্দাম হোসেন সবার সাথে কথা কয়। ঐ

৩৬. মুখে যখন কালো কাপড় দিতে গেল তার
সাদ্দাম বলে ঐ সমস্ত কিছু নাই দরকার
গিলাপ দিয়া মুখটি যখন ঢাকতে গেল তার
সাদ্দাম বলে মৃত্যুর জন্য ভয় নাইরে আমার
লা ইলাহা কলেমা তখন নিজের মুখে পড়ে লয়। ঐ

৩৭. পা দুই খানা বাধা ছিল ফাঁসি দেওয়ার কালে
ওদের একটা ভয় ছিল যে লাথি মারবে গালে
ফাঁসি যারা দিয়াছিল তাদের মুখটি ঢাকা
ওরা ভাবছে এই দুনিয়ার মানুষগুলি বোকা
আমাদেরে চিনে যদি আমরা তবে বাঁচবো নয়। ঐ

৩৮. এই ভাবেতে সাদ্দামেরে দিল শেষ বিদায়
এখন শুনি ইরানেরে হামলা করতে চায়
টুইন টাওয়ার ধ্বংস হইল খোদার গজব পড়ে
খালি ২ পায় পেচাইয়া ধরল আফগানেরে
মিথ্যা বাদি আমরিকানদের উচিৎ শিক্ষা দাও সবায়। ঐ

৩৯. মাঝে মাঝে দুই এক কথা কোরিয়ারে কয়
সাথে ২ কোরিয়া তার পাল্টা জবাব দেয়
চারিশত ক্ষেপণ অস্ত্র উত্তর কোরিয়ার
আমেরিকার দিক রেখে দিছে জানা আছে তার
তারপরেও সেদিক যায় না কারণ সেতার জাতের ভাই। ঐ

৪০. নবি আমার বলে ছিল হাদিসের পাতায়
যদি কোন মুসলমান ভাই অন্যের দুর দশায়
অল্প একটু আগাইয়া যায় করতে উপকার
১০ বছরের এতেকাফের সমান সওয়াব তার
কাফেরেরা মানে সেটা আমরা কেন মানি নয়। ঐ

৪১. এই পর্যন্ত শেষ করিলাম সাদ্দামের কাহিনি
আঃ গফফার নামটি আমার শোনেন ভাই ভগিনি
চাপলডাঙ্গা গ্রাম আমার বোয়ালমারী থানা
ফরিদপুর জেলার অধীনে সর্বলোকের জানা
দুর্বল ১টা ঈমান নিয়া বেঁচে আছি দুনিয়ায়
সাদ্দামেরে দিল ফাঁসি কেমনে জেলখানায়।

www.pathagar.com

৩. অহংকারের পরিণতি

রচনায় : কবি আবদুল গফফার

১। প্রথম বিছমিল্লা ২ ওগো আল্লা করুণার কান্ডারি, শেষের সময় ঈমান নিয়া যাইতে যেন পারি। তারপর দ্বীনের নবি ২ যাহার ছবি ভাসে সব সময়। দয়া করে তার দরবারে নিয়ো গো আমায়। এখন শুরু করি ২ ধৈর্য ধরি শোন মেয়েগণ স্বামীকে জানিও তোমরা অমূল্য রতন। স্বামী জীবন সাথী ২ নারীর গতি স্বামী যে জীবন, স্বামী না থাকিলে নারীর সবি অকারণ। ২। যাহার স্বামী নাই ২ দেখতে পাই ঘুরিয়া বেড়ায় মাঝি ছাড়া নৌকা যেমন ধাক্কা গুতা খায়। স্বামী না থাকিলে ২ সাজ সকালে চাইবে খোদার কাছে, তোমার জন্য তার দরবারে ভাল কিছু আছে, যিনি স্বামীর সাথে ২ দিবারাতে সদ ব্যবহার করে। গায়েবি রহমত আল্লাহ পাঠায় সে সংসারে। আবার অকারণে ২ স্বামীর মনে যদি দুঃখ দেয়, একের পর এক গজব আসবে বুঝতে পারবে সবে। ৩। শোনেন এক কাহিনি ২ দেখলে পানি আসতো সবার চোখে, না দেখিয়া মিথ্যা কথা ভাববে হয়ত লোকে। বাবায় কৃষাণ বেচে ২ পড়াইয়াছে বিএ করছে পাস, বড় লোকের মেয়ে নিয়া হইল সর্বনাশ, তাহার ব্যবহারে ২ পানি জরে স্বামীর দুটি চোখে। গালি দিয়া বলে কথা শ্বশুর শাশুড়িকে ৪। স্বামী বেতন পাইয়া ২ ঘরে যাইয়া না দিলে বউর হাতে, দিন দুপুরে আমাবশ্য দেখায় ঐ বউয়েতে। বন্ধ, রান্নাবান্না ২ নাকে কান্না ভুতুম ২ করে, কতায় ২ খোটা দিয়া গালি দেয় স্বামীরে, স্বামী কষ্ট পাইয়া ২ হাত উঠাইয়া বলে পরোয়ার, এত বড় জালিম ছিল নছিবে আমার। দোয়া কবুল হইল ২ গজব আইল মাত্র কদিন পরে। আচমকা ধরিল তারে বাত বেদনা জ্বরে ৫। জ্বর ভাল হল ২ নিয়া গেল অনেক ডাক্তারখানা, অচল অঙ্গ ভাল করতে কেহ পারিলনা খাইত খাদ্যখানা ২ হাত দুখানা উপরের টা ভাল, নিচের অংশ লোহার মত শক্ত হইয়া গেল। বুকে ভর করিয়া ২ বাকাইয়া দোড়াসাপের মত অনেক কষ্টে দেহটাকে টানিয়া চলিত যাইতো একে বেকে ২ পায়খানাতে বসতে পারত নয়। দাসি বান্দি রেখে দিল তার ধনি পিতায়, কিন্তু কাজ হল না ২। ৬। বন্ধুগণা দুইতিন দিন থাকিয়া ঘৃণা করে চলে যায় লেংড়িরে ফেলিয়া। যত পাড়া পরশি ২ প্রতিবেশী দুরু দুরু করে, তাই শুনিয়া লেংড়ির এখন চোখের পানি ঝরে বলে হায়গো খোদা ২ মান মর্যাদা কিছুই নাই আমার। এভাবেতে বেঁচে থাকার নাই কোন দরকার। এমনি দুঃখ কষ্টে ২ গেল কেটে বছর আটেক নয়, সন্ধ্যার সময় সেদিন তাহার বাবা আইসা কয়, মর তুই বিষ খাইয়া (২) ৭। ২টা মাইয়া আরো আমার আছে, অর্থ সম্পদ চলে গেল তোর একার পাছে বলছে মা জননী ২ মর এখনি মুক্তিদে আমারে, সাতবার বমি করছি আজ যাইয়া পুকুর পাড়ে। সবাইকে মারিয়া তুমি মরবি শেষ বেলায় তার আগেই মর ২ রক্ষা কর আমাদের জীবন নিজ চোখে দেখিয়া আমি শান্ত করি মন ৮। লেংড়ি মরেও না ২ সারেও না সবার চোখের শুল, দশ বছর পর আজকে ওদের ভাঙ্গলো একটা ভুল, গেলাম কতখানে ২ দিনে দিনে দিন গেল চলিয়া কেউ বলতে পারল না গজব কিসেরও লাগিয়া মোরে মাদ্রাসায় ২ আসবে হায় আমাদেরই পির, তাহার কাছে নিচে এবার মন হল স্থির। নিয়া লেংড়িরে ২ পিয়ের

দরবারে উপস্থিত করিল, দেখিয়া পির সাহেব তারে রাগ হইয়া গেল ৯। বলল হারামিকে ২ সামনে থেকে যাওগো নিয়া দুরে খোদার গজব নাজেল হইছে হারামির উপরে কারণ রাগ করিয়া ২ ভাত বাড়িয়া পায় ঠেলিয়া থাল স্বামীকে খাইতে দিছিল ফুলাইয়া গাল ধরছে সেই পোপেতে ২ কোন মতে ক্ষমা নাই তাহার এই শুনিয়া লেংড়ি তখন কান্দে ঝারে ঝারে বলে মিথ্যা নয় ২ কি উপায় মুক্তি পাব আমি পা ধরিয়া বলে আমায় ক্ষমা কর স্বামী তখন দয়া হল ২ ক্ষমা করলো স্বামীটা তাহারে ১০। বহুজুরে কয় ক্ষমার মালিক আশে পরোয়ারে তুমি করলে দোয়া ২ হয়ত তাহা কবুল হতে পারে স্বামীর পাও ধোয়াইয়া পানি খাওয়াইবা তারে শোনেন অন্য সুরে, ভাটিয়ালি সুর ১। স্বামীর সেবা করনারী খোদার হুমুক ভুলো নয়। স্বামীর সেবা করে কয় জনায় ২। আদমকে করিতে সেবা হাওয়া তৈরি হয়। এই কথাটা আলেম গণে সবার মাঝে কয়। স্বামীর জন্য নিজের জীবন যদি চলে যায়। আখেরাতে তাহার মত সুখী পাওয়া দায়। স্বামীর জন্য কত নারী কান্দিয়া জীবন কাটায়-ঐ ৩। স্বামীর জন্য কত নারী ছাড়ে বাবার বাড়ি। তারা একদিন হয়গো সুখী প্রমাণ আছে তারি। অনেক কষ্ট করেছিল বিবি রহিমায়। আবার তারে সুখ দিয়াছে দয়াময় আল্লায়। আরেক সুখী ছিল মোদের নবীর বেটি ফাতেমায়-ঐ ৪। এবার বলি আসল কথা লেংড়ির বিবরণ। খোদার গজব লেংড়ির উপর আসে কি কারণ। বড় লোকের মাইয়া স্বামী গরিব ঘরের ছেলে। বিয়াই সাবের বিয়ায় যাবে তাই স্বামীকে বলে। সবার চেয়ে বড় কিছু দিতে হবে এই বিয়ায় ৫। স্বামী বলে মায়ের অসুখ ঔষধ আনতে হবে। যে মায়ো ঔছিলায় আমি আসিয়াছি ভবে। ঘুমাইতে পারেনা মায়ে নাই তাহার মশরী। আব্বাজানের নাইকো জামা শোন খেয়াল করি। বিয়া বাড়ি এত টাকা কেমনে করি অপব্যয়-ঐ ৬। ঝামটা মেরে বলে তখন না খাইয়া থাকিব, তোর কপালে ঝাটা মেরে আগুন ধরায় দিব। সকল কিছু চলে তোমার আমার বেলায় ফাঁকি। সরমে লজ্জাতে এখন চলি যে মুখ ঢাকি। ছোট লোকের ঘরে এসে পরছি বেড় বেকায় দায় (২) ৭। চাকরি দিছে আমার বাবা, মাসের বেতন পাইয়া। এটা সেটা কর তুমি বাবা মার লাগিয়া। স্বামী তখন অল্প একটু প্রতিবার করছিল, বিষের ছোয়া সারা গায়ে ছড়াইয়া পড়িল। ভাত বাড়িয়া পায় ঠেলিয়া থিল সেই বিষের জ্বালায় ৮। ঐ কারণে লেংড়ির উপর গজব নাজিল হয়। ডাক্তার ওঝা বৈদ্য কোন কাজে লাগে নয়, বছর দশেক ভোগার পরে পিরের কাছে যায়, তাহার কাছে গেলে গজব কেন নাজেল হয়। সকল কথা শুনে লেংড়ি কেন্দে ধরে স্বামী পায় (২) ৯। সকল রাগ ভুলিয়া স্বামী ক্ষমা করে তারে। পীরে বলে এখন আল্লাও ক্ষমা করতে পারে। স্বামীর পা ধোয়াইয়া পানি বছর ভরে খাও, তাহার পরে খোদার কাছে আরো ক্ষমা চাও, তবে যদি আল্লাপাকে গজব সে তুলিয়া নেয় ঐ ১০। সেদিন হতে লেংড়ি তখন স্বামী ভক্তি করে, সকাল বিকাল পা ধোয়াইয়া সেই পানি পান করে। পিরের দেওয়া কথা যখন লেংড়ি পালন করে। লেংড়ির দেহ ভাল হইল ছয় মাসের ভিতরে। শ্বশুর আর শ্বাশুড়ির পায়ের ধুলা লেংড়ি চেটে খায় ঐ ১১। বর্তমানে কিছু নারী দেখতে পাওয়া যায়, ইচ্ছা মত হাট-বাজারে ঘোরে বে পর্দায়। স্বামী যদি ভুল দেখিয়অ নিষেধ করে তারে। সাথে সাথে নাকে কান্দায় ভাঙ্গিয়া সে পড়ে, কথায় ২ নাকে কান্দে এই রমনী

www.pathagar.com

ভাল নয়-ঐ ১২। পুকুর পাড়ে নদীর ঘাটে পানি আনতে যেয়ে সাত গ্রামের খবর রাখে যে সমস্ত মেয়ে, কলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে কলসি কাখে নিয়া। স্বামী তাদের নয়গো সুখী দিতেছি জানাইয়া। ঐ নারী বেহাইয়া যাহার গল্প করে সময় যায়-ঐ ১৩। স্বামীর সুখে সুখি হইও নিও দুঃখের ভাগ, স্বামীর সাথে কেউ কখনো করনা দেমাগ, স্বামীর সাথে মুখে ২ তর্ক করলে তার কপালে কষ্ট হয়-ঐ ১৪। অন্যায় যদি করে স্বামী গালি নাহি দিবে। স্বামীর কাছে বলবে যখন আরামে বসিবে, হঠাৎ নাশিল করে কেহ অঘটন ঘটায়, আবার কেহ তাবিজ করে মন পাবার আশায়, মনে ২ না মিশিলে তাবিজে কি আসে যায়-ঐ ১৫। স্বামী যদি রাগ হয় কবু বলি সে কারণ। তোমার অন্যায় না হলেও ধর তার চরণ, ক্ষমা চাইয়া আগে স্বামীর শান্ত কর মন। তার পরে বুঝাইয়া বল সময় হয় যখন, তোমার ইজ্জত বাড়বে তাতে অপমান বোধ কর নয় ১৬। কাপড় চোপড় সদাই যাহা তোমার জন্য আনে। যদি সেটা কবু তোমার নাহি লাগে মনে, তবুও স্বামীর পছন্দে করবে ব্যবহার, বুঝিতে দেবেনা ভাল লাগে নাহি তোমার। হাসি মুখে চাইবে তোমার যখন সেটা মনে চায়-ঐ ১৭। আবার কিছু নারী লোকের এমন আচরণ, কলকৌশলে স্বামীর টাকা করিয়া গোপন। শাড়ি গয়না কিনে বলে দিছে আমার বাপ, এই ধরনের মিথ্যা কথা মস্তবড় পাপ, হিসাব করে দেখ তোমরা স্বামী কারো বাবা নয়-ঐ ১৮। খাবার বসে যেই মহিলা বাজে গল্প করে, জিব্বা বাড়াইয়া যদি বড় লোকমা ধরে, মাথার কাপড় ফেলে যদি কোন খাবার খায়, শয়তান বলে ঐ নারীরা আমার সমান হয়, যত্ন করে খানা খাইলে সেই খানাতে বরকত হয়-ঐ ১৯।

যেই নারী চাউল ঝাড়ে দক্ষিণ মুখি হইয়া, দক্ষিণ মুখি হইয়া রান্নার চাউল লয় মাপিয়া, আর যারা রান্না করে স্বামীর আগে খায়, একদিনে কয়েক দিনের বরকত চলে যায়। দিনে দিনে ঐ সংসারে দেনার বোঝা বেড়ে যায়-ঐ ২০। স্বামী বাড়ি নাই খাওয়ার সময় চলে যায়, স্বামীর খাবার রেখে দিয়ে পরে খাওয়া যায়, আরো যদি সংসারেতে থাকে ছেলে মেয়ে, স্বামীর আগে খাওয়া যায় তাদেরকে খাওইয়ে। পাঁচ টাকা দাম এই বই খানা কিনে নিয়ে পড়েন ভাই-ঐ ২১। চুল ছাড়িয়া পা মেলিয়া বসে বিছানায়, লক্ষীতো ভাই দুরের কথা অলক্ষ্মী ভয় পায়, নতুন কাপড় পর যারা তাকায় মাঝার দিকে, মলিন হয় কপালের শশি খায় সে স্বামীকে। অকালে স্বামী মরিয়া ঔ নারী বিধবা হয় ২২। নারী লোকের চুল আছড়াইয়া ছেড়া চুল যা হয়, গুজে যদি রাখে চালে অথবা বেড়ায়, দিনে দিনে স্বামী তাহার ব্যাধি গ্রস্ত হয়, আবার যদি কাপড়ের পানি চিপে ফেলে পায়, জানিয়া রাখিও তোমার ডানের কপাল গেল বায়-ঐ। নারী যদি স্বামীর দিকে নেক নজরে চায়। আল্লাহ পাকে তাহার উপর বড়ই খুশি হয়। চোখ রাঙ্গায়া বললে কথা স্বামী দুঃখ পাবে।

আল্লাহ পাকে তোমার উপর গজব চাপায় দিবে। এই কারণে বলি আমি এমন কাজ কেউ করো নয়। ঐ এই পর্যন্ত করি ক্ষান্ত কবিতার কাহিনি। মা বোনেগো শোনাইবেন পড়ে এই বই খানি। আব্দুল গফফার নামটি আমার চাপলডাঙ্গা বাড়ি। ফরিদপুর জেলার অধিনে থানা বোয়ালমারী। বিদায় নিলাম, সালাম দিলাম ফের আবার হব উদয়, স্বামীর সেবা করে কয়জনায়।

চ. পুথিপাঠ ও পুথিসাহিত্য

হযরতের ওফাতের বয়ান (পুথিপাঠ)

নূর নবি মোহাম্মদ কুফরে করিয়া জব্দ রহে নবি খোসালিত হইয়া।
আল্লার তামাসা যাহা কে বুঝিতে পারে তাহা ছফর চাঁদ পৌছিল আসিয়া।
ছফরের চাঁদ আইল রছুলের তলব হৈল আজার হইল রছুলের।
তাপ যে হইল গায় বিবিকে ডাকিয়া কয় দেখ বিবি তাপ হৈল মোর।
আপে নবি পয়গম্বর আয়েসার জানু পর শুইলেন ছের লাগাইয়া।
বরই তাপের জোর দুই আঁখি হৈল ঘোর কহে নবি বিবিকে ডাকিয়া।
তাপ হইল মোর গায় রছুল বিবিকে কয় তাপে বড়া করিল জহমত
আখিতে নাহিক সোঝে কি জানি খোদায় মুঝে ভেজে বুঝি দিলেন মওত
শুন বিবি কহি আমি সেতাবি করিয়া তুমি বোলাইয়া আনহ ইয়ার
জীউ শুকাইয়া যায় আরাম নাহিক হয় মওত পৌছিল এইবার
বারেক ইয়ার সাত করি আমি মোলাকাত তাগিদ বোলাও সবাকারে
সেই দিন জুমাবার ইয়ার তামাম আর পৌছে সবে নামাজ খাতিরে
মসজিদের বিচে গিয়া দেখে রাহা তাকাইয়া রছুল আসিবে কতক্ষণে
নামাজের বেলা হৈল রছুল নাহিক আইল নবির গাফেলি হৈল কেন
সবে দেলে করে কয় বেলালের তরে কয় শুন মর্দ্দ বেলাল খবর
সেতাবী খবর আন নবি না আইল কেন নামাজের ওক্ত বরাবর
আর আর দিন পর আগে আইসে পয়গম্বর নামাজেতে কভু না গাফিল
সেতাবী চলিয়া যাহ তাকিদ খবর লেহ না জাতি কি হইল মুস্কিল
বেলাল হুকুম পাইয়া সেতাবি চলিল ধাইয়া যেই স্থানে নূর মোহাম্মদ
দেখিল বেলাল গিয়া আজারে রছুল শুইয়া তাপ জোর বড়ই দরদ
ছাতি পরে হাতি জোড়া কহেন বেলাল খাড়া শুন নবি আলায়হেচ্ছালাম
আজ হৈল জুমা বার নামাজ খাতির পর জমা হৈল ইয়ার তামাম
খবর জানিতে মুঝে তোমার ইয়ার ভেজে দেখি তুমি তাপের আজরে
নবি বলেন বেলাল দেখ মেরা এই হাল যেয়ে কহ সবার হুজুরে
এবার আজার জোর জ্বলন হৈয়াছে মোর দুই আখ হৈল মেরা ঘোর
ছটফট করে জিয়া দরদেতে হইল হিয়া কি জানি গতিক হয় মোর
রছুলের আজার দেখি বেলাল হইয়া দুঃখি খবর কহিতে চলে যায়
গাজীর হুকুম পাইয়া একিদা সাবদু হইয়া অধনি ফকির কবি গায়
বেলাল চলিল দেখে রছুল আজার
তামাম ইয়ারে গিয়া দিল সমাচার
শুন বাই রছুলের ইয়ার তামাম
রছুলের আজার বড় নাহিক আরাম

www.pathagar.com

আমাকে ভেজিল নবি কহিতে খবর
নেহাত আজেজ আছে নবি পয়গম্বর
এয়ছাই শুনিয়া সবে বেলালের মুখে
হায় হায় করে সবে হাত মারে বুকে
তাকিদ চলিয়া গেল তামাম ইয়ার
দেখিল যাইয়া নবি বড়ই আজার
তামাম ইয়ার পুছে কহ হকিকত
আপনার হার কহ কেমন হযরত
রছুল কহেন ভাই নাহি যায় কহা
আজার বড়ই মুঝে এলাহির চাহা
তাপের জ্বালাতে মোর সব অঙ্গ জ্বলে
এমন আজার নাহি হয় কোন কালে
তোমা সবাকার সাথে করি মোলাকাত
মওত পৌছিল বুঝি নাহিক হায়াত
তামাম ইয়ার মেরা শুন দেল দিয়া
পড়হ নামাজ সবে মসজেদে যাইয়া
রছুলে দেখিয়া সবে দেল পেরেশান
হায় হায় করে সবে হইয়া হয়রান
নামাজের ওক্ত গেল হইয়া আখের
লাচারে চলিল নবি নামাজ খাতের
ইয়ারের কাঁধ পরে হাত লাগাইয়া
নামাজ খাতেরে যান মসজিদে চলিয়া
বহুত কোশেষে নবি গেলেন মসজিদে
খাড়া হইতে নবি নাহি পারেন সাবুতে
আবুবকর ছিদ্দিকেরে করিয়া এমাম
নামাজ পড়িয়া তবে নবি ডেরে যান
মসজিদ হইতে নবি চলে গেলেন ঘরে
ইয়ারের কাঁধে হাত দিয়া ধীরে ধীরে
বহুত কোশেসে ডেরে আইল মোহাম্মদ
রোজ রোজ বাড়ে তাপ হইল প্রমাদ
এক রোজ মোহাম্মদ কহে বেলালেরে
মওত হইবে আলবত্তা এইবারে
এক বাত কহি আমি শুন দেল দিয়া
শহর বাজারে যাও সেবাত করিয়া

www.pathagar.com

হাকিয়া কহিবে ভাই এই হকিকত
রছুল আজারমন্দ বড়ই জহমত
দাবিদার কেহ যদি থাক তার পর
আগে হয়ে লেহ ভাই শুনহ খবর
বেলাল শুনিয়া চলে নবির ফরমান
শহরে হাকিয়া কহে আজার দেওয়ান
কারো দাবি থাকে যদি রছুলের ঠাই
যাইয়া বুঝিয়া লেহ শুন সবে ভাই
বেলাল শহর বিচে বহুত হাকিল
ভাল বুরা বাত কেহ কিছু না কহিল
ঘড়ি বিচে এক মর্দ্দ নামেতে আক্কাছ
কহে মেরা দাবি আছে রছুলের পাছ
বেলাল কহেন চলো রছুলের আগে
আক্কাছ চলিয়া আইল নবির মসজিদে
বেলাল খবর দিল রছুলের পাছ
দাবিদার আইল এক নামেতে আক্কাছ
রছুল কহেন ভাই শুনহ আক্কাছ
কোন দাবি রাক তুমি লেহ মেরা পাছ
আক্কাছ বলেন তব শুন পয়গম্বর
যখন তুড়িতে যাও ওহুদে কুফর
তোমার ঘোড়ার কাছে আমি ছিনু খাড়া
ঘোড়াকে মারিতে মোর গায়ে লাগে কোড়া
কি জানি সে বাত মেরা না ছিল এয়াদ
খবর পাইয়া তার লিতে আইনু দাদ
শুনিয়া রছুল কহে বেলালের তরে
রাখা আছে সেই কোড়া ফাতেমার ঘরে
তাকিদ বেলাল গিয়া আনহ চাবুক
আমাকে মারিয়া দাদ আক্কাছ লউক
শুনিয়া বেলাল গেল যেখানে ফাতেমা
তছলিম করিয়া বাত কহে শুন মামা
কোড়া নাকি আছে মাতা তোমার দহলিজে
রছুল লইতে তাহ ভেজিলেন মুঝে
এক কোড়া দাবি রাখে নামেতে আক্কাছ

www.pathagar.com

লইবে কোড়ার দাওয়া রছুলের পাছ
শুনিয়া ফাতেমা বিবি হেল পেরেশান
বেলাল লইয়া কোড়া নবি আগে জান
হজরত ফাতেমা বিবি কান্দিয়া চলিল
বেলাল রছুল আগে যাইয়া পৌছিল
তামাম ইয়ার শুনে আইল সেই ঘড়ি
ছিদ্দিক আব্বাছ আগে কহে হাত জুড়ি
দশ কোড়া মার তুমি উপরে আমার
মাফ করে যাহ তুমি রসুলের খোদার
নজরে দেখিলে নবি কেমন বেহাল
আমাকে মারিয়া ছাড়া দাদের খেয়াল
আব্বাছ কহেন মিয়া কহি তেরা আগে
একজনের দাদ কোথা আর জনে লাগে
নাহক কহিলে বাত আমার হুজুরে
বিশ কোড়া মার তুমি আমার উপরে
কহেন ওসমান ফের শুন দেল দিয়া
মার তুমি ত্রিশ কোড়া আমাকে খেচিয়া
আব্বাছ কহেন কেন তোমাকে মারিব
যাহার উপরে দাওয়া তার ঠাই লিব
তারপর আলী কহে আব্বাছের সাথে
চল্লিশ চাবুক মুঝে মার খুব তাতে
মারহ চল্লিশ কোড়া একের বদলে
মাফ করে যাহ তুমি হযরতের হালে
হাসান হুসেন কহে শুনহে আব্বাছ
আমা দোন পরে মার চাবুক পঞ্চাশ
দেখ নানাজান মেরা তাপের আজারে
কেমনে মারিবে কোড়া দৰ্দ্দ নাহি তোরে
আব্বাছ কহেন বাত নাহি দিলে দাদ
আল্লাহর হুজুরে লিব শুনহ সংবাদ
বুঝিয়া রছুল কহে আব্বাছের তরে
দাদ লেহ মেরে কোড়া আমার উপরে
শুনিয়া আব্বাছ কহে রছুল হুজুরে
গায় জামা কিরূপে চাবুক তার মারে
যখন আপনি কোড়া মারিলে আমায়

www.pathagar.com

খালি অঙ্গ ছিল জামা নাহি ছিল গায়
এয়ছাই শুনে নবি জামা খুলে দিল
আব্বাছ যাইয়া কাছে পিঠ তাকাইল
পিঠের উপরে ছিল আল্লাহর মোহর
দেখিল আব্বাছ তাহা করিয়া নজর
আল্লাহর নিশান যে মোহর নবুওতে
সেতাবি চুমিয়া মর্দ্দ লিলেক তুরিতে
তছলিম করিয়া মর্দ্দ কদম উপরে
হাতে ছিল কোড়া যে ফেলিয়া দিল দূরে
রছুলের পায় মর্দ্দ গিরিল আসিয়া
মাফ কর বেআদবি কহেন কান্দিয়া
হুজুরের পিঠে ছিল আল্লাহর নিশান
খোওয়াব দেখিয়াছেন শুনহ দেওয়ান
বাহানা করিনু আমি দেখিতে মোহর
মাফ কর গোনাহ মেরা আপে পয়গম্বর
সাত পোস্তানে মেরা গোনা হৈল মাফ
বড় গোনাগার আমি দোয়া কর আপ
রছুল কহেন ভাই তুমি নেক বক্ত
করিলে দুনিয়া পরে বড়া কাম শক্ত
মোহর নবুওত আছে আমার পিঠেতে
দেখিবে দুনিয়া বিচে আক্কেল হইতে
তোমা হইতে হবে মেরা উম্মতের কাম
মোহর নবুওতে ধেয়ান করিবে মোদাম
মোহর নবুওতে যে দেখিবে নজরে
গোনাহ মাফ হইয়া যাবে বেহেস্ত ভিতরে
আব্বাছ বিদায় হৈল ছালাম করিয়া
অধীন ফকির কহে আল্লা ধেয়াইয়া
যার নাম শাহাদুদ্দি আল্লাহর ফকির
ভাটির সোলতান গাজি বড়খান পির
আব্বাছ বিদায় হৈয়া ঘরেতে পৌছিল
যাইয়া নূর নবি বড়ই আজার,
সেই রাত স্বপনেতে দেখেন
সকলেতে ছল যত নবির ইয়ার।
খাব দেখে সবাকায় আসিয়া

www.pathagar.com

রছুলে কয় নবি তার শুনি খবর,
তামাম ইয়ার সাত কহিল
স্বপন বাত বয়ান করিয়া বরাবর।
সবে পেরেশান দেলে রছুলের তরে
বলে কি খাতেরে রব দুনিয়ায়,
অনাথ করিয়া যাবে আর নাহি দেখা
হবে কান্দে সব বলে হায় হায়।
জিয়ের আরাম তুমি ছেড়ে যাবে
এই জমি আর নাহি দেলের আরাম,
কহে সবে এই বাত ছের পরে
মারে হাত জারে জার হইল এমাম।
আন্তহার মক্কর যত বুঝিতে পারিব
কত বুঝি আল্লাহ বড় বেদরদ,
এয়ছা নিয়ামত দিয়া ফের লেয় ছেনাইয়া
ছেড়ে যাবে দীন মোহাম্মদ।
আর কি আরামে রব ফকির হইয়া
যাব উদাসিনী হইয়া দিগেদিক,
ঘরে আর কাম নাই মুকে লাগিব ছাই
দেশে দেশে মেঙ্গে খাব ভিক।
তামাম ইয়ার াকন্দে বুক তারা নাহি বান্ধে
দেখে নবি কহে সবাকায়,
আমার যে এই হালে ছবর করিয়া দেলে
রহ সবে ভাবিয়া খোদায়।
তামাম ইয়ার শুন জার জার কান্দ কেন
কেন সবে হইয়াছ উতালা,
একে একে আগে পিছে সবাই দুনিয়া
বিচে গিয়ে এল মউতের পেয়ালা।
হাজার হাজার নামি গেছে ছেড়ে
এই জ মি পয়দা হৈয়া দুনিয়া ভিতরে,
আর নাহি কান্দে কেহ এলাহির নাম
লেহ মরন নাহি কারে।
তামাম ইয়ারে কহে নবি পয়গম্বর
পড়িবে কোরান দেলে রাখিয়া খবর
নামাজ পরিবে আর রাখিবেক রোজা

www.pathagar.com

এই তিন চিজ দেখ এলাহির ভেজা
দোজখ উপরে শাকো রাহা বড় দুর
এয়ছাই শাকোর ধার যেন তেজ ক্ষুর
বড়ই আন্দার সেই শাকোর নজদিক
আমবস্যা রাত হৈতে জানিবে অধিক
সেই শাকো পার হইতে হইবে সবার
নামাজের উজালা বিনে গতি নাহি আর
নামাজের উজালাতে পার হৈয়া যাবে
নামাজ বড়ই ধন আলবত্তা জার্নিবে
মা বাপের তরে সবে করিবে খেদমত
তাহার দোয়ায় বেহেস্ত পাইবে আলবত
আলেম ওস্তাদ লোকে করিবে তাজিম
খোসালে খেলাবে খানা দেখিয়া এতিম
এতিমের খোসালিতে মাপ হবে গোনা
নছিহত কর সবে আওরতে আপন
নেক রাহা আওরতে শিখাবে ভালা বুরা
আওরতের গোনাতে খছম যাবে মারা
এইরূপে রছুল করেন নছিহত
তামাম ইয়ারে মানে শুনে এই বাত
তার পরে পুছ বাত রছুলের ঠাঁই
তোমার পিছেতে কেবা করিবে বাদশাই
রছুল বলেন যদি পুছিলে আমারে
আবুবকর বাদশা হইবে মেরা পরে
তারপরে উমর যে করিবে বাদশাই
ওছমান তাহার পিছে শুন সবে ভাই
এই তিন বাদে যে দুয়ারে খাড়া আছে
হইবে বাদশাই তার শুন মেরা কাছে
দুয়ার উপরে খাড়া আলী মর্দ্দ ছিল
আলীকে দেখিয়া নবি এবাত কহিল
আলীর পিছেতে খাড়া আছিল মাবিয়া
হইল ঝগড়া কাম বাদশাই লাগিয়া
পিছেতে কহিব যত হকিকত তার
দীন মোহাম্মদ হইল বড়ই আজার
খেচিয়া কহেন বাত রছুল দেওয়ান

www.pathagar.com

বেঠেকানা শুনে বাত বড় পেরেশান
সেই ঘড়ি হযরত নবি কহে ধীরে ধীরে
শুন ভাই মেহতের জিবরাইল তুঝে কই
দুনিয়ার আসিবে কতবার আমি বই
শুনিয়া জিবরাইল কহে হযরত রছুলে
আসিব যে দশবার তুমি চলে গেলে
দশবার দশ চিজ উঠাব দেওয়ান
এয়ছাই আমার পরে আল্লাহর ফরমান
পহেলা আসিয়া যে বরকত উঠাইব
দোছরাতে আওরতের সরম লিয়া যাব
তেছারাতে উঠাইব ছাখাওতি কাম
চাহরামে এহছান কাম উঠাব তামাম
পঞ্চমে তাজিম আমি লিব উঠাইয়া
সশমে তওবার ঘর যাবে বন্ধ হইয়া
তওবা করিলে এবে পাপ দূরে যায়
সাত বারে উঠাইয়া লিব যে তাহায়
অষ্টম বারেতে লিব লোকে ইমান
নয়বারে নিয়ামত উঠাব নিদান
খোসবোয় নিয়ামত উঠাইয়া লিব
দেলের মহব্বত হেথা কিছু না রাখিব
দশবারে উঠাইব আল্লাহর কোরান
তবে জান নজদিগে কেয়ামত নিদান
শুনিয়া রছুল বাত জিবরাইলের মুখে
খবর কহেন নবি ইয়ার সবাকে
আইল ফাতেমা বিবি রছুল হুজুরে
বাপের আজাব দেখে কাঁদে জারে জারে
কান্দেন ফাতেমা বিবি করে হায় হায়
বড় নেয়ামত মেরা বাপ মরে যায়
কেহ মেহেরবান নাই বাপের সমান
আর কে খবর মেরা লিবেকে মোদাম
আর কে পুছিবে বাত মেহের করিয়া
বাঁচিবে আমার জান কাহাকে দেখিয়া
হায় হায় আল্লাহ তায়ালা লিখেছে নিদান
এয়ছা দরদমন্দ বাপ মেরা চলে যান

www.pathagar.com

দেলের দরদ হায় কব কার ঠাঁই
বাপ বিনে আমার যাবার জায়গা নাই
ঘড়ি এক থাকিব বাপের মুখ চাইয়া
আখেরে মরিব আমি জহর খাইয়া
বাপকে ধরিয়া বিবি ফাতেমা রহিল
মেহের করিয়া নবি কহিতে লাগিল
শুনগো ফাতেমা মাতা না কান্দিও আর
ছয় মাসের পিছে পাবে দেখা যে আমার
আমি হোজারিলে তুমি ছয় মাসের পিছে
আলবত্তা যাইয়া যে পৌছিবে মেরা কাছে
শুনিয়া ফাতেমা বিবি ছাড়িল কান্দানা
অধীন ফকির কহে গাজীর ভাবনা
যেই ঘড়ি বাহিরেতে আওয়াজ হইল
আপনার কানে নবি আওয়াজ শুনিল
হযরত কহেন বাত ফাতেমার ঠাঁই
বাহিরে খবর লেহ কার হাঁক পাই
শুনিয়া ফাতেমা বিবি বাহিরে তাকিল
বড়ই বিকট এক সুরত দেখিল
সুরত দেখিয়া বিবি দেলে ডরাইয়া
বেহুস হইয়া পড়ে জমিনে গিরিয়া
থর থর বিবি আপে লাগিল কাঁপিতে
রছুল হুজুরে বাত লাগিল কহিতে
বাবাজিউ পয়গম্বর শুন মেরা বাত
বাহিরে দেখিনু এক মুস্কিল সুরত
আসমান জমিন বরাবর একজন
এমন বিকট ছবি না দেখি কখন
দেখিয়া তাহাকে মেরা গায়ে আইল জ্বর
না জানি কে বটে মর্দ্দ শুনিয়া ভিতর
রছুল কহেন বেটা নাহি ডর তায়
আজরাইল বটে সে বোলাও উহায়
আজরাইল আইল তবে রছুলের পাশে
দূরে খাড়া রহে মর্দ্দ নজদিকে না আসে
রছুল কহেন আজরাইল বলে যেয়ছা হুকুম আল্লাহর
তেয়ছা ভাতি খাড়া আছি হুজুরে তোমার

www.pathagar.com

তোমার হুকুম যদি হয় মেরা পরে
তবে পাক জিউ লিব বেহেস্ত ভিতরে
এয়ছাই হুকুম লিয়া আসিয়াছি আমি
এখন হুকুম যেয়ছা আপে কর তুমি
রছুল কহেন ভাই বইস মেরা পাশ
যেথা পাও কর মেরা জানের তল্লাস
আজরাইল শুনিয়া হাত ছাতি পরে দিল
আল্লা আল্লা বলে নবি হাঁকিয়া উঠিল
আসমান চাপিল যেন ছাতির উপর
এমন পৌঁছিল ভার কহে পয়গম্বর
রছুল কহেন বাত আজরাইল তরে
এমনি কহর হাত ডাল মেরা পরে
যে হউক সে হউক ভাই কহি যে তোমারে
যে কিছু কহর থাকে করে লেহ মোরে
আমার উম্মত রোক বড়ই লাচার
সহিতে না পারিবে তোমার আজার
আজরাইল কহে নবি শুন দেল দিয়া
তোমার হুকুম যেই চলে বাজাইয়া
হুকুম মানিয়া তেরা যেই করে কাম
তার জীউ লিয়া যাব করিয়া আরাম
হামেসা আয়েতল কুরছি পরে যে এনছান
নেকালিব জান তার করিয়া আছান
আল্লা ও তোমার হুকুম যেবা নাহি মানে
বহুত আজাব পাবে মউত নিদানে
শুনিয়া হুকুম যেবা নাহি মানে
বহুত আজাব পাবে মউত নিদানে
শুনিয়া রছুল কহে শুন আজরাইল
আপনার কাম তুমি কর না হাসিল
আজরাইল রছুলের হুকুম পাইয়া
পাক জিউ সেই ঘড়ি লিল নেকালিয়া
পাক জিউ চলে গেল ধর পড়ে রয়
দেখিয়া ফাতেমা বিবির দম নাহি রয়
হায় হায় বরে বিবি জমিনে গিরিল
তামাম ইয়ার তবে রছুলে দেখিল

www.pathagar.com

যাইয়া দেখিল জিউ ধরে নাহি তার খালি ধর
পড়ে আছে বিছানা উপর
হইল বহুত সোর কান্দনার জারি
হেন বুঝি কেয়ামত হইল আখেরি
তামাম আলেম কান্দে আরব্ব শহর
আর না হইবে এয়ছা দীন পয়গম্বর
আসমান জমিন কান্দে দরিয়া পাহাড়
দুনিয়ার পশু কান্দে খাইয়া আছাড়
ওফাত করিল নবি আল্লাহর রফিক
অধীন ফকির কহে কেতাব মাফিক ॥

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

ইংরেজি Handicraft-Hand and craft শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে লোকশিল্পের উৎপত্তি। লোকশিল্প হচ্ছে কারুশিল্প, হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, প্রত্নশিল্প, প্রাচীনশিল্প, প্রাগৈতিহাসিক শিল্প, উপজাতীয় শিল্প, ইংরেজিতে যাকে বলে 'মাইনর আর্ট'। গঠনশৈলীতে বা স্টাইলে, বিষয়বস্তুতে উৎপাদন ও নির্মাণকৌশলে লোকজরূপ দেখা যায় বলে তা 'লোকশিল্প' বলে Folklore-এর শাখা রূপে পরিগণিত করা হয়।

লোকশিল্পের উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণ। (ক) মাটি, কাঠ, পুরনো কাপড়, সুতা, ধাতবদ্রব্য, পাতা, বাঁশবেত, শোলা, তাল ও খেজুর পাতা, কাগজ; (খ) লালমাটি, খড়িমাটি, শস্যাদির গুড়া, নীল, আবীর, সিঁদুর, কাঠ-কয়লা প্রভৃতি।

বাংলাদেশের লোকশিল্পের ভুবন বিস্তৃত। লোকচিত্র, নকশিকাঁথা, নকশিপাখা, শীতলপাটি, নকশি শিকা, খেলনা পুতুল, মাটির কলাচিত্র, শোলার কাজ, কারুশিল্প, বাঁশবেতের কাজ, ভেলকি, লোক অলংকার, লোকবাদ্যযন্ত্র, নকশি পিঠা, নকশি চাঁচ প্রভৃতি।

১. মৃৎশিল্প

ফরিদপুরের মৃৎশিল্প মূলত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এদেরকে কুমার বা কুম্ভকার বলে। এদের উপাধি হলো 'পাল'। এরা যে পাড়ায় বসবাস করে তাকে কুমারপাড়া বলা হয়। এরা ফরিদপুর অঞ্চলের দরিদ্র অনুন্নত সরল ধর্মে বিশ্বাসী প্রাকৃতজন। ধর্মীয়ভাবে মৃৎশিল্পে নিয়োজিত কারিগর সকলেই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এ পেশায় নিয়োজিত কোনো মুসলমান কারিগর এখানে নেই।

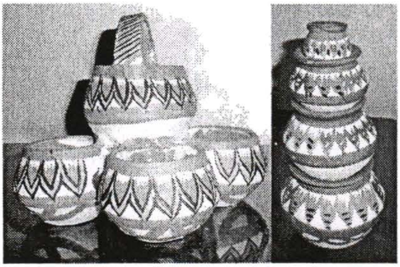

জোড়খুঁটি

শখের হাঁড়ি

বিসিকের সূত্র মতে, বাংলাদেশে প্রায় ৬৬৬ কারুপল্লীতে আঠারো হাজার পরিবারে প্রায় ছিয়াত্তর হাজার কারিগর মৃৎশিল্প কাজে নিয়োজিত আছে। ফরিদপুরে ৫৪টি

www.pathagar.com

কারুপল্লিতে ৯৫২ পরিবারের ৪৪৪৩ জন কারিগর মৃৎশিল্প কর্মে নিয়োজিত। এই জেলার মৃৎশিল্প সামগ্রী প্রধানত চারভাবে বিভাজন করা যায়।

ক) **ধর্মীয় আচার উপাচারে ব্যবহৃত মৃৎশিল্প:** দেবদেবীর মূর্তি, পুতুল, শখের হাঁড়ি বা হাঁড়িচিত্র, মঙ্গলঘট, লক্ষ্মীঘট, লক্ষ্মীসরা, মনসাবারি, শীতলঘট, নাগঘট, তুলসী মঞ্চ ইত্যাদি।

খ) **স্থাপত্যকর্ম:** পোড়ামাটির ফলক বা মন্দির অলংকার, মাটির ভাস্কর্য, পূজারত ব্রাহ্মণ, শবর ও শবরী, নর্তক ও নর্তকী, কিন্নরী ইত্যাদি।

গ) **লোকায়ত জীবনে গৃহস্থালির তৈজসপত্র:** শখের হাঁড়ি, মৃন্ময়পত্র, মাটির হাঁড়ি, কলসি, জলপাত্র, পিঠার ছাঁচ, মালসা, ফসল রাখার মটকা, দই রাখার পাত্র, কুপি, প্রদীপ, দীপাধার ইত্যাদি।

ঘ) **আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মৃৎশিল্প:** টালি, গ্লেজ দেয়া চায়ের কাপ-পিরিচ, পেয়ালা, এ্যাসট্রে, ফুলদানি, বাসন-কোসন ইত্যাদি।

মনসাঘট: ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী, বাহিরদিয়া, ভবনন্দপুর এবং ডাজনডাঙ্গায় মনসাঘট প্রসিদ্ধ। এসব অঞ্চলে মঙ্গলঘট, শীতলাঘট, লক্ষ্মীঘট, নাগষ্ট, বা মনসাঘট বা আর্যনাগ ঘট তৈরি হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরের দরজায় সিঁড়ির গোড়ায় মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। সিদুঁর ও পিঠালি দিয়ে এটি চিত্রিত করা হয়। লক্ষ্মীঘটে আলপনা আঁকা থাকে। চিত্রিত ঘটের মধ্যে নাগ বা মনসাঘট সর্বাধিক অলঙ্কৃত। এক থেকে দশটি মাটির তৈরি সাপ এ ঘটে সংযোজিত থাকে।

ফলক চিত্র: মথুরাপুর দেউল ইটের তৈরি। ইটের সারির ফাঁকে ফাঁকে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি উৎকীর্ণ। পাত্রাইল মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালে পাঁচটি মেহরাব সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত।

ছাঁচপুতুল: ফরিদপুরের বিভিন্ন মৃৎশিল্প কারুপাড়ায় ছাঁচপুতুল আবার কোথাও টিপাপুতুল তৈরি হয়।

লক্ষ্মীসরা: ফরিদপুরের সরাতে লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি সর্বদা লক্ষণীয় এবং প্রধান কারণ হচ্ছে লক্ষ্মী হিন্দুদের জনপ্রিয় দেবী। মন্দিরে এ দেবীর পূজা হয় না। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজিত হয়।

লক্ষ্মীসরা

www.pathagar.com

দেবদেবীর মূর্তি: লক্ষ্মী, সরস্বতি, কার্তিক, গণেশ অবতার, দুর্গাপূজার মূর্তিগুলো ফরিদপুরের ভবনন্দপুর, বাহিরদিয়া এবং ভাজনডাঙ্গায় তৈরি হয়। এ অঞ্চলের মূর্তিগুলো অত্যন্ত মানসম্পন্ন এবং চিত্রিত।

উল্লেখযোগ্য মৃৎশিল্প: পিঠার ছাঁচ (মুনসুরাবাদ, ভবনন্দপুর) ফসল রাখার মটকা (ফুলবাড়িয়া), দেবদেবীর মূর্তি (ভবনন্দপুর, বাহিরদিয়া, ভাজনডাঙ্গা), লক্ষ্মীসরা (বোয়ালমারী), ছাঁচ পুতুল ও টিপা পুতুল (ভবনন্দপুর), ফলফলাদি (ভবনন্দপুর), হাঁড়িচিত্র (বোয়ালমারী), মনসাঘট (ভাজনডাঙ্গা, বোয়ালমারী, বাহিরদিয়া)।

লোকগহনা শিল্প: গহনা নৃতাত্ত্বিক শিল্প। অঙ্গের শ্রীবর্ধনই অলংকার পরিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; ধর্মীয় বিশ্বাস, অপদেবতা ও অশুভ নক্ষত্রের প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য নারী-পুরুষ অঙ্গে অলংকার ধারণ করে। শরীরের আটটি অঙ্গ-মাথা, নাক, গলা, বাহু, হাতের কব্জি, কোমর ও পায়ে আট অলংকার পরার রীতি রয়েছে। লোকগহনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সিঁথিপাটি, টিকলি, টায়রা, মাপা, কুন্তন, মাকড়ি, ঝুমকা, কানপাশা, হীরামঙ্গল, কাড়ি, বালি, কর্ণফুল, লটকন, নবরত্ন, নাকফুল, নখ, বোলাক, ত্রোলক, বেশর, ফুরফুরী, হাঁসুলি, সাতনরী, টাকার ছড়া, মোহনমালা, রত্নহারা, পুষ্পহার, গ্রীবাপত্র, সীতাহার, চম্পাকলি, নওরত্ন, বাগানহার, মুক্তার মালা, অঙ্গদ, তাগা, কেয়ূর, মাদুলি, বাজুবন্দ, মৌলান,

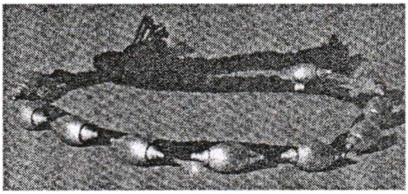

ধান তাবিজ

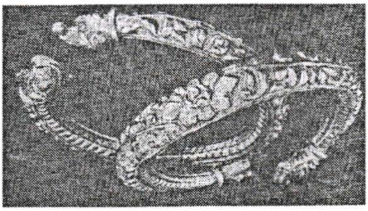

স্বর্ণের বালা

তাবিজ; বালা, বাহুতি, কঙ্কন, চুড়ি, পাত্রী, কড়া, মান্তাশা, পাঁইচি, রত্নচূড়, গাহিয়া, হসপদু, আরশী, ছলা, আঙ্গুষ্ঠার, শাহলামী, আনওয়াজ, গণরত্নের আংটি, বিদা,

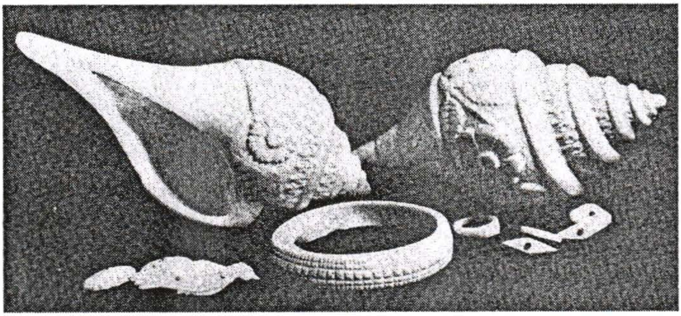

শঙ্খ শিল্প

www.pathagar.com

নকল গহনা: ব্রোঞ্জ, পিতল, তামা ও সিলভার সমন্বয়ে নকল গহনা তৈরি হয়। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার জলিরপাড়, রাজৈর এলাকায় কয়েক হাজার পরিবার নকল গহনা শিল্পে নিয়োজিত। এ সকল কারুশিল্পীরা নকল গহনার পাশাপাশি ঝিনুক, শঙ্খ, ও শামুকের গহনাদি উৎপাদন করেন।

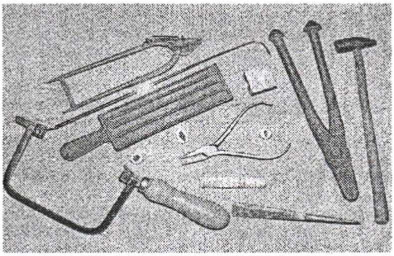

গহনা শিল্পের যন্ত্রপাতি

২. আলপনা

আলপনা হচ্ছে মঙ্গলচিহ্ন। বিয়ে-শাদি, ব্রত, পূজা-অর্চনায় ঘরের মেঝে, উঠোন ও বারান্দায় এ লোকচিত্র অঙ্কিত হয়। কোনো কোনো এলাকায় রান্নাঘর, খামারবাড়ি ও ছাদে আলপনা আঁকা হয়। এছাড়া চিত্রিত হয় বিয়ের পিঁড়ি। সাধারণত চালের গুঁড়োর সাথে পানি মিশিয়ে একপ্রকার আঠালো পেস্ট তৈরি করা হয় এবং হাত দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। কখনো কখনো ডালের গুঁড়ো, পোড়া তুষ, ইটের গুড়ো, চক, খড়ির হাড়া অথবা ফলের রস দিয়ে আলপনায় বৈচিত্র্য আনা হয়।

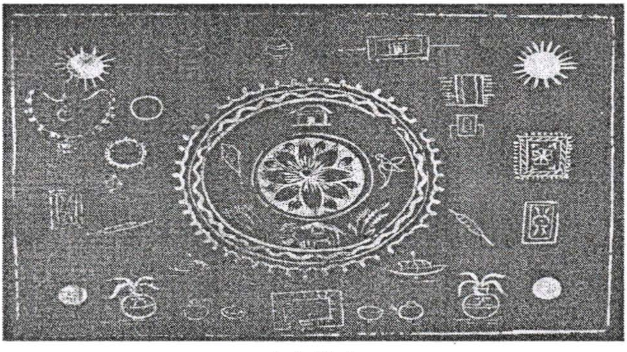

আলপনা

পৌষ সংক্রান্তিতে ফরিদপুর জেলায় পুখুরিয়া'র আলপনা আঁকা হয়। ঘর-গৃহস্থালিতে আলপনা অঙ্কনসহ গরু-বাছুরের গায়ে কলিকা দিয়ে আলপনার ছাপ দেওয়া হয়। এ জেলা বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, বিয়ে-শাদি, ভাইফোঁটা, ভাতমুখি, নবান্ন ইত্যাদিতে ঘরের মেঝে, উঠোন ও বারান্দায় আলপনা আঁকা হয়। বিভিন্ন মাঙ্গলীয় অনুষ্ঠানে আলপনা

www.pathagar.com

আঁকার হিড়িক পড়ে যায়। এই সব আলপনার মধ্যে লক্ষ্মীপেঁচা, ধানছড়া, পদ্ম, কলমিলতা, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পৃথিবী, আকাশ, শঙ্খ-সিঁদুর, আয়না-চিরুনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিবাহ অনুষ্ঠানে কুলা, পিঁড়ি, হাঁড়ি, বৈড়ি, সরা, শখের হাঁড়ি ইত্যাদিতে আলপনা দেয়া হয়।

৩. নকশিকাঁথা

ফরিদপুর লোকশিল্পের মধ্যে নকশিকাঁথা উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলে বিভিন্ন মটিফের নকশিকাঁথা তৈরি হয়। পাইড় ও মটিফের সংমিশ্রণে মধুখালী, বোয়ালমারী অঞ্চলে কাঁথা তৈরি হয়। কাঁথার মাঝখানে বড় আকারের সহস্রদল, পদ্ম, জমিনের পাড়, কোনে কলকা, পান প্রভৃতি মটিফ। বোয়ালমারীর নকশিকাঁথা পাইড়ের নাম ভাগতারা, আসমান তারা, নয় কোঠা। কাঁথার মাঝখানে লম্বালম্বি এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত আঁকা গাছ বা জীবনবৃক্ষ। গবেষকগণ ফরিদপুর অঞ্চলের নকশিকাঁথা সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, এ অঞ্চলে সুন্দর রুচিসম্মত পাইড়কাঁথা তৈরি হয়। যদিও কাঁথার ফোঁড় যশোরের ন্যায় সূক্ষ্ম নয়। রঙও একটু বেশি।

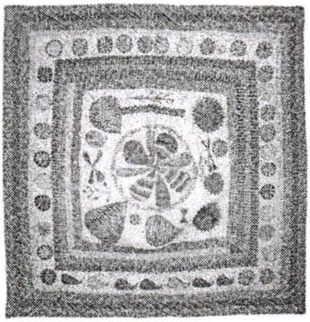

নকশি কাঁথা

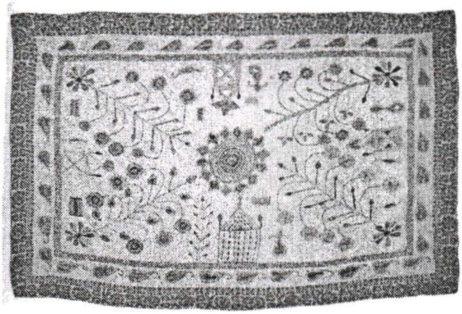

নকশি কাঁথা

৪. নকশিপাখা

কথায় আছে, 'তালের পাখা শীতের দিনে দেওনা দেখা, গরমকালে প্রাণের সখা' অথবা 'শীতে তুমি লুকিয়ে থাকো গরমে দাও দেখা, আদর করে নাম রেখেছি তাইতো তোমায় পাখা'। ফরিদপুর অঞ্চলে তালপাতা, বিন্না, গমের ডাটা, মুরতা, বাঁশ-বেত ও কলার খোলার শুকনা বেতির পাখা তৈরি করা হয়। কখনো শোলার পাখা চোখে পড়ে। পাখার চিত্র বা নকশা আলপনা চিত্র প্রভাবিত; তবে পাখার সীমিত পরিসরে চিত্র বা নকশা বৈচিত্রের অবকাশ কম। তাই পাখায় সাধারণত লতামণ্ডল সম্ভব হয় না। সচরাচর পাখার নকশায় থাকে তারা ফুল, ছিটাফুল, পাখি, গাছ, পাতা, মাছ, হাতি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

চিত্ররূপ অনুযায়ী পাখার বিভিন্ন নামকরণ করা হয়। যেমন: ভালোবাসার কাকর জ্বালা, গুরুপাতা, পালং পোষ, সুজনিফুল, বলদের চোখ, শঙ্খলতা, কাঞ্চনমালা, ছিটাফুল, জবাফুল, মনবিলাসী, মনবাহার, মানসুন্দরী, বাঘবন্দি, ষালোকড়ির ঘর, সাগরদিঘিহাতি, ফুল মানুষ ও লেখা পাখা ইত্যাদি। বাণিজ্যিকভিত্তিতে ভাঙ্গা, নগরকান্দা, বোয়ালমারী প্রভৃতি অঞ্চলে তালের পাখা, বিন্নডাটার পাখা, বাঁশবেতের পাখা তৈরি হয়। ফরিদপুরের পাখাকে 'পাঙ্খা' পাহা বলা হয়।

৫. দারুশিল্প

আবহমান বাংলার নৃতাত্ত্বিক শিল্পের মধ্যে দারুশিল্প (কাঠশিল্প) অন্যতম। এই শিল্প লোকায়ত সমাজ থেকে আগত সুতার বা সূত্রধর সম্প্রদায়ের বৃত্তি। উল্লেখযোগ্য দারুশিল্পগুলো হলো: পৌরাণিক কাহিনি সম্বলিত চিত্র উৎকীর্ণ কাঠের বেড়া, ঘরের খিলান, ঘরের কাঠের বীমের মাথায় সিংহ, হাতির মুখ, পদ্ম ঠাকুরের সিংহাসন, বৃষকাষ্ঠী, পাঠ ঠাকুর, অঙ্কিত রথ, পালঙ্ক, পালঙ্খের পায়া, ময়ূরপঙ্খি ও টিয়ার ঠোঁট সম্বলিত নৌকা, চিত্রিত নৌকার গলুই, পিতলের চোখ বসানো গলুই, হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, বাঘ, লতাপাতায় অঙ্কিত সিন্ধুক, আসবাবপত্র, পিড়ি, খঞ্চা, বারকোষ, পিলসুজ, পেটেরা, চারা-চাইরা, বাটি ইত্যাদি তৈজসপত্র; হুক্কার নল, ছুরির বাঁট, কোটা, পুতুল, খুঁটি, দরজা-জানালার পাল্লায় খোদিত লতাপাতা, ফুল, পদ্ম ইত্যাদির আলপনাচিত্র ও জ্যামিতিক ছক।

ফরিদপুর জেলায় দারুশিল্পের প্রাচীনতম নির্দশন পাওয়া যায় কাঠের তৈরি ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, লতাপাতা সম্বলিত নকশা করা কাঠের সিন্ধুক, বাঘের সম্বলিত পালঙ্ক, কারুকার্যময় কাঠের বেড়া একদা ফরিদপুরে জনপ্রিয় শিল্প ছিল। হিন্দু এলাকায় মৃতব্যক্তির স্মরণে বৃষকাষ্ঠ স্থাপন রীতির প্রচলন ছিল। পাঠঠাকুরে অঙ্কিত হতো দশ অবতার। এছাড়া হিন্দু বাড়িতে কাঠের বেড়া ও দরজায় উৎকীর্ণ থাকত শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের বস্ত্রহরণ, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, সিংহ ও লতাপাতা। অবস্থাসম্পন্ন হিন্দু-মুসলমানদের বাড়িতে ব্যবহৃত হতো হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, পদ্ম ও লতা-পাতা অঙ্কিত সিন্দুক। এ অঞ্চলে বিচিত্র ধরনের কাঠের নৌকা চোখে পড়ে। বিশেষ করে বাইচের নৌকায় বিভিন্ন ধরনের চিত্র অঙ্কন করা হতো।

৬. পটশিল্প

কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর প্রভৃতির কাহিনি, লৌকিক পির গাজির জীবনালেখ্য, গাজি-কালু-চম্পাকলীর উপাখ্যান মূলত পটশিল্পের উপজীব্য। যারা পট শিল্পের ছবি আঁকতেন তারা পটুয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। হিন্দু পটুয়ারা হিন্দুধর্ম ও মুসলমান পটুয়ারা মুসলমান রীতিতে ছবি আঁকতেন। এ দেশে চৌকিপট আর বহুপট বা দীর্ঘপট নামে দুই ধরনের পট প্রচলিত ছিল। এক শ্রেণির লোক এই পট দেখিয়ে এবং গাজির গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফরিদপুর জেলায় সর্বাধিক 'গাজির পট' প্রচলিত ছিল।

www.pathagar.com

৭. বাঁশবেত

বাঁশবেত শিল্পের সঙ্গে বাংলার লোকালয় শিল্পগোষ্ঠী জড়িত। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বাঁশবেত শিল্পকর্ম প্রধানত ডোম, চাঁড়াল, বাগদী ইত্যাদি অন্ত্যজ বর্ণের পেশা। ফরিদপুরে এদেরকে ঋষি সম্প্রদায় বলা হয়। তাদের তৈরিকৃত পণ্য সামগ্রী হলো: বাঁশের চাঁই, চাটাই, খাঁচা, ডুলা, ডোল, ঝুড়ি, মাছ ধরার ফাঁদ, কোঁচ, হোচা, আওড়া, পালো, চালনি, কুলা, ডালা, বাঁশের বেড়া, ঝাঁপ, ভেলকি, হাতপাখা, ছড়ি, লাঠি, মাথাল, কারুকার্যখচিত ঘর এবং শৌখিন হস্তশিল্পের মধ্যে ফুলদানি, ছাইদানি, দোলনা, ডোর, স্ক্রিন, ল্যাম্প, ওয়াল ম্যাট, টেবিল ট্যাম্প, বইপত্রের তাক, মোড়া ইত্যাদি। বিসিক সূত্র মতে, বাংলাদেশ এ শিল্পে ৪২ হাজার শিল্প ইউনিটে একলক্ষ বাইশ হাজার লোক নিয়োজিত। ফরিদপুর জেলায় ৯৯টি কারুপল্লীতে ৯৭৬টি পরিবারে ৩৩৯৬ জন লোক নিয়োজিত।

বাঁশবেতের সামগ্রী

৮. পূজার চিত্র

ফরিদপুরে হিন্দুসমাজে বিভিন্ন পূজা উপলক্ষে বাড়ির আঙিনা চিত্রিত করা হয়। মাঘমঙ্গলব্রত, তারাব্রত, সূর্যপূজা, হ্যাচড়াপূজা প্রভৃতি পূজায় আলামাটি দিয়ে বাড়ির আঙিনা লেপে পিঠালি দিয়ে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করা হয়। মাঘমঙ্গলব্রত ও তারাব্রতে নক্ষত্রমণ্ডল চিত্রিত করা হয়।

উল্লিখিত লোকশিল্প ছাড়াও ফরিদপুরে খেঁজুরের পাটি শিল্প, পাটের শিকা, মাটির ফলকচিত্র, শোলার তৈরি শিল্প, মাধুলিশিল্প, ছাতা শিল্প, কাঁসা পিতল শিল্প, পিঠার ছাঁচ

www.pathagar.com

কাঠের খেলনা ও সিন্দুরের কৌটা, মাছ ধরার ফাঁদ প্রকৃতি লোকশিল্প ফরিদপুরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে।

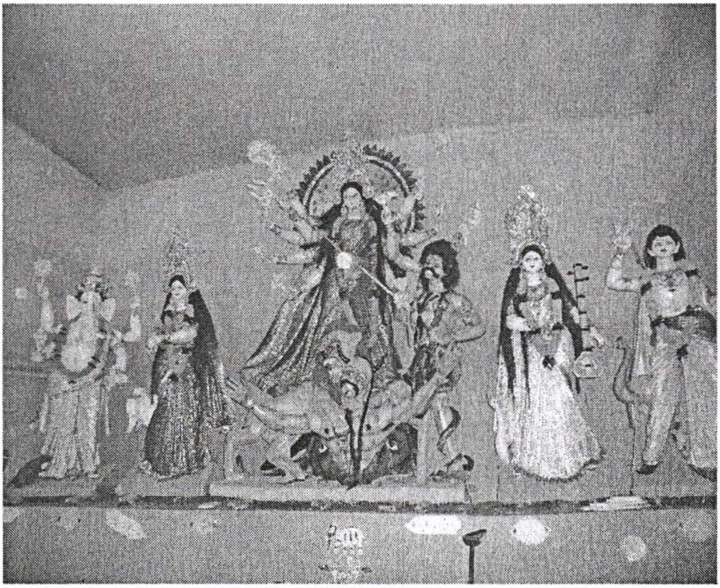

দুর্গাপূজার চিত্র

৯. পিঁড়িচিত্র

অন্নপ্রাশন, বিবাহ ও পূজা পার্বণে হিন্দু সমাজে পিঁড়ি চিত্রিত করার প্রথা রয়েছে। পিঁড়ি চিত্র মূলত আলপনা ধর্মী। পিঁড়ির চারপাশে দোলানো লতার মাঝে পদ্মা, প্রজাপতি, একবৃন্তে দুইটি ফুল, অন্নপ্রাশনের পিঁড়িতে দুধের গ্লাস, বাটি চিত্রিত দেখা যায়। ফরিদপুরের হিন্দুসমাজে সাধারণত পিঠালি দিয়ে পিঁড়িতে চিত্র আঁকা হয়। হালে বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে পিঁড়িতে আলপনা আঁকতে দেখা যায়।

১০. কুলাচিত্র

ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চিত্রিত কুলার ব্যবহার রয়েছে। হিন্দু সমাজে বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠান, লক্ষ্মীপূজা, বিবাহ অনুষ্ঠানে কুলা অঙ্কন করা হয়। কুলা চিত্রে সাধারণত ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা থাকে। চিত্রিত কুলা ছাড়া বিবাহের অনুষ্ঠান কল্পনাও করা যায় না। যে কোনো বরণ এবং বধূবরণের প্রধান উপকরণই চিত্রিত কুলা।

www.pathagar.com

১১. গেট চিত্র

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পূর্ব থেকেই বিভিন্ন মোটিফের গেট নির্মাণের রেয়াজ রয়েছে। পূর্বে রঙিন কাগজ কেটে কলাগাছ দিয়ে গেট সাজানো হতো। অনেকসময় দেবদারু গাছের চিকন পাতা দিয়ে কলাগাছ ঢেকে দেয়া হতো। পরে রঙিন কাপড়ে কাঠ ও বাঁশের ফ্রেমে গেট তৈরি করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন স্থাপত্য শিল্পের আদলে অথবা শৈল্পিক কারুকার্যে এবং বৈদ্যুতিক লাইটিং এর মাধ্যমে চোখ ধাঁধানো গেট নির্মিত হচ্ছে। পূজাপার্বণ এবং বিয়ের সময় এ অঞ্চলে দৃষ্টিনন্দন গেট তৈরি করা হয়। পূর্বে কলাগাছ পুঁতে দেবদারু গাছের পাতা এবং রঙিন কাগজ কেটে এসব গেট তৈরি করা হতো। বর্তমানে ডেকোরেশন থেকে রঙিন কাপড়ের গেট তৈরি করা হয়। পূজা-পার্বণে মোগল স্থাপত্য শৈলীর আদলে রঙিন কাপড়ে গেট তৈরি করা হচ্ছে। যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণের গেটের তুলনা চলে।

পূজার গেট

www.pathagar.com

পূজার বিভিন্ন ধরনের গেট

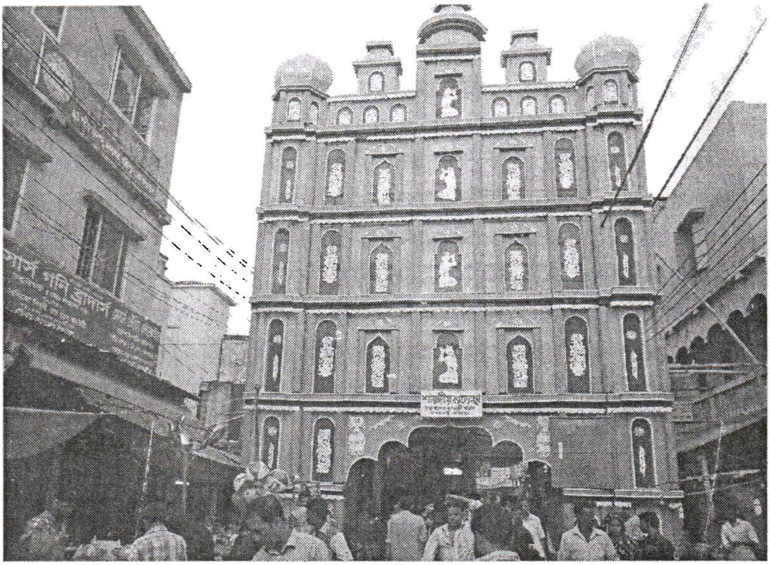

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছেদ

পূর্বে ফরিদপুর জেলার হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ ধুতিজাতীয় পোশাক পরিধান করত। মুসলমান সমাজে এর ব্যবহার একেবারেই নেই। হিন্দু সমাজেও ধুতির ব্যবহার কমে আসছে বলা যায়। বয়স্কদের মধ্যে অনেকেই পড়ে। পূজা-পার্বণে বা কোনো অনুষ্ঠানাদিতেই তা লক্ষ করা যায়। বর্তমানে পুরুষেরা লুঙ্গি, পাজামা-পাঞ্জাবি, ফতুয়া, প্যান্ট-শার্ট, টিশার্ট, মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, সালোয়ার, কামিজ পরিধান করে। আবার কোনো কোনো পরিবারে ম্যাক্সি পরিধান করতে দেখা যায়। সকলে জুতা, সেণ্ডেল পায়ে দেয়। স্বাধীনতা পূর্বকালে কাঠের বইল্যাওয়ালা অথবা রবারের ফিতাচ লাগানো খড়ম পায়ে দেয়া হতো। ষাটের দশকে স্পোঞ্জের সেন্ডেল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে খড়মের ব্যবহার উঠে যায়। বর্তমানে সকলেই জুতা-সেণ্ডেল পায়ে দেয়। মুসলমানেরা কেউ কেউ টুপি, পাগড়িও পরিধান করে। সকল পরিবার গামছা, তোয়ালে ও রুমাল ব্যবহার করে। সকল শ্রেণির মহিলারা সাধ্যানুসারে অলংকারাদি পরিধান করে যদিও আর্থিক সামর্থ্যের উপর স্বর্ণালংকার, রৌপালংকার, নকল গয়না ও কাঁচের চুড়ি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

প্রাচীনকাল থেকে নাকের নথ, নোলক, কানের দুল, কড়িয়া, ঝুমকামারি, কানপাশা, মাকড়ি, গলার হাঁসুলি, কবচ, ফুতি, হাতের বাওটি, বয়লা চুড়ি, বাজু, শাখা, কোমরের হার, বিছা, পায়ের খাড়ু-নূপুর ইত্যাদি ব্যবহার করে। বিবাহ-শাদি বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মহিলা প্রায়শই সজ্জিত হয়ে বের হন।

ফরিদপুর অঞ্চলে লুঙ্গিকে 'তহবন্দ' বলা হয়। এই লুঙ্গি সাধারণত চার ধরনের। যেমন– ছাপালুঙ্গি, চেকলুঙ্গি, বাটিক প্রিন্টের লুঙ্গি এবং এক রঙের লুঙ্গি। মেয়েদের শাড়ি ও বিভিন্ন প্রকার। এদের মধ্যে আটপৌরে শাড়ির প্রচলন বেশি। এ সকল শাড়ি সাধারণত সূতি তাঁতে নির্মিত শাড়ি। পূর্বে নীলাম্বরী শাড়ির খুব কদর ছিল। অনুষ্ঠানাদিতে এরা জর্জেট অথবা অন্য কোনো কৃত্রিম সূতার শাড়ি পরে। স্বচ্ছল পরিবারে জামদানি অথবা ভারতীয় স্টোন বসানো শাড়ি ব্যবহার করে। নববধূর জন্য বেনারশির শাড়ি কেনা হয়। বর্তমানে মেয়েরা হেজাব এবং কেউ কেউ বোরকা পরছে।

হিন্দু বিয়েতে বর-কনে মাথায় মুকুট পরে। ছেলেরা গরদের ধুতি ও পাজামা, মেয়েরা বেনারশি শাড়ি পরে। বিবাহের দ্বিতীয় শাড়ি হিসেবে পাড়ওয়ালা তাঁতের শাড়ির প্রচলন বেশি। হিন্দু মেয়েরা বিবাহের পর সিঁথিতে সিঁদুর এবং কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়। ঠোঁটে লিপিস্টিকের ব্যবহার প্রায় সকল মেয়েরাই করে থাকে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে ভাইফোঁটার সময় কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয়া হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এ সম্প্রদায় তিলকের ফোঁটা বা যজ্ঞের কাজল মাখে।

www.pathagar.com

ঋতু ভেদে পোশাকের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শীতকালে নরনারী সকলেই গরম কাপড়-চোপড় ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে চাদর, সোয়েটার, মাফলার, কানটুপি অথবা উলের তৈরি অন্য কোনো পোশাক। এছাড়া রাতে লেপ, কম্বল, কাঁথা এবং তোষক ব্যবহার করে। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রায় সকল ধর্মের লোক তাদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে সাধ্যানুযায়ী নতুন জামা-কাপড় পরিধান করে। শহরের নিত্য নতুন ডিজাইনের পোশাক-আশাক এখনর পরিধানে গ্রামাঞ্চলের মানুষ অভ্যস্থ।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

ফরিদপুর জেলার গ্রামগুলি সাধারণত খাল, বিল ও ছোট-খাটো নদ-নদীর পাড়ে। প্রায় প্রতিটি গ্রামই বাসের উপযোগী বাস্তুভূমি, চাষের জন্য ক্ষেত্রভূমি, উচ্চভূমি, গর্তভূমি, তলভূমি, গোচরভূমি, বাটক-বাট, গোচর বা গোবাট-গোমার্গভূমি। গোচর বা গোচার ভূমি সবসময়ই গ্রামের ক্ষেত্রভূমির শেষ সীমা ; অপরদিকে গ্রামের সীমা ঘেঁষে একেবারে গ্রামের ভেতর পর্যন্ত গোবাট-গোমাঘ-গোপথ। প্রায় সব গ্রামেই আছে জলাশয় বা পুকুর-পুষ্করিণী। এইসব গ্রামে জোতদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, কৃষক এবং বর্ণশ্রমিকের বসবাস। শস্যক্ষেতে মাচান বেঁধে কৃষকেরা ফসল রক্ষা করে।

প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঘরবাড়ি নির্মিত হয়। এখানে প্রাকৃতিকভাবে পাথর নেই। ইট, বাঁশ, কাঠ, ছন, খড়কুটা প্রভৃতি দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি হয়। ঘরের ছাদে টিন অথবা ছন, খড়কুটা ব্যবহৃত হয়। মূলত আর্থিক সচ্ছলতা এবং রুচি অনুসারে ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়। বাড়িতে বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদির গাছগাছালি লাগানো হয়। প্রত্যেকটি গ্রামে সচ্ছল পরিসরে চারপাশে চারটি বা ততোধিক ঘর দেখা যায়। কেউ কেউ খনার বচন অনুসরণ করে। ''পূর্বে হাঁস/পশ্চিমে বাঁশ/দক্ষিণে ধূয়া/উত্তরে গুয়া"। একটি আয়তন বা চারপাশে আদায়ের আঙিনা ঘিরে এসব ঘরের ভিটিগুলির অবস্থান। বাড়ির একপাশে অর্থাৎ বাহির বাড়িতে বৈঠকখানা বা কাছারি ঘর। এই ঘরের একাংশ চাকর-বাকর অথবা গৃহশিক্ষক ব্যবহার করে। মাঝে মাঝে এই ঘরে সমাজিক অনুষ্ঠানাদি হয়।

পরিবারের প্রধান ঘর দক্ষিণ-দুয়ারি। এতে আসবাবপত্র সম্বলিত শয়নকক্ষ থাকে। মালামাল, কৃষিফসলাদি রাখার জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘর নির্মাণ করা হয়। 'রান্নাঘর' হিসেবে একটি ভিন্নতর ঘর থাকে। পূর্বে এই ঘরের একাংশ ঢেঁকিঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। গরু-বাছুরের জন্য তৈরি হয় ' গোয়ালঘর'। পূর্বে কিছু কিছু পরিসরে সুদৃশ্য চারচালা বিশিষ্ট 'বাংলাঘর' ছিল। ঘর বানিয়ে ঘরের চালের উপর রূপার টাকা ছুড়ে ফেলা হতো। টাকা যদি অনায়াসে মাটিতে এসে পড়ত তাহলে ধরে নেওয়া হতো ঘরের চাল ঠিকমতো তৈরি হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাঠের নকশা-করা বেড়া দেয়া হতো। দেয়ালে রুইমাছ অথবা চিতলমাছের আইশ এঁটে দেয়া হতো। এতে চাঁদনিরাতে আলো প্রতিফলিত হতো। অভিজাত মুসলমান ও হিন্দু বাড়িতে কাঠের নকশা করা বেড়া, কাঠের কারুকার্যখচিত দরজা-জানালা যাতে লতা-সাতা, রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি অথবা বাঘ-সিংহ উৎকীর্ণ দেখা যায়। আসবাবপত্রের মধ্যে কাঠের খাট-পালঙ্ক, চিত্রিত সিন্দুক, বাঁশবেতের খোড়া, কাঠেরপিড়ি, কাঠের চেয়ার-টেবিল, কাঠের আলমারি, আলনা। সংসারের অন্যান্য দ্রব্যাদির মধ্যে কাঁসা-পিতলের থালা, বাটি, পাত্র, চিত্রিত হাঁড়ি, মাটির প্রদীপ, কূপি, কেরোসিন তেলের বাতি, হারিকেন ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে অবশ্য অধিকাংশ গ্রাম বিদ্যুতায়িত।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বত্র স্থানীয় প্রযুক্তি, স্থানীয় সহজ লভ্য উপযোগিতা এবং কীর্তি-কৌশল ব্যবহৃত হন। যেমন কুঁড়েঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বাঁশ, ছন, সুতলি, পাটখড়ি এবং দক্ষ কারিগর যিনি বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মাণকার্য সম্পাদনে সক্ষম।

এ অঞ্চলে বাড়িঘড় নির্মাণের ক্ষেত্রে বহুলৌকিক আচারি প্রচলিত রযেছে। যেখানে বস্তভিটা নির্মাণ করা হবে সে স্থানটি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ছিল বিধি-নিষেধ যেমন : কবরস্থান, শ্মশান অথবা হাট-বাজারের, সন্নিকটে বস্তভিটার স্থান নির্বাচন করা হতো না। যার যার ধর্মানুসারে মৌলভি অথবা গণক বা পুরোহিত থেকে তাবিজ-কবজ, দোয়া দুরুদ পাঠ করা হতো। বস্তভিটায় মাটি এনে উঁচু করে ভরাট করা হতো এবং ঐদিন সিন্নি রান্না করে খাওয়ানো হতো। নতুন ভিটায় কালো পাতিল ছেঁড়াজুতা এবং পুরাতন ঝাটা বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে দেয়া হতো। তাদের ধারণা জীন-পরী অথবা অন্য কোনো অপদেবতার হাত থেকে রক্ষার জন্য এগুলো মানতে হতো।

বাড়ি-ঘড় নির্মাণ ০০২০শুরু করা হতো শুভাশুভ দিন ক্ষণ মেনে প্রথমে সুতলী দিয়ে প্রস্তাবিত ঘরের স্থান চিহ্নিত করা হয়। ঐদিন পাড়া-পড়শি এবং আত্মীয়-সজনদের ডেকে আনা হয়। তাদের সকলের সামনে মৌলভী অথবা পুরহিত যার যার ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করেন। সুলতী দিয়ে নিদিষ্ট করা স্থানে চার কোণে চারটি খুঁটি পোতা হয় এবং আজান দেয়া হয়। ঘরের মাপের অগ্নিকোণে প্রথম গর্ত করা হয় এবং সেই গর্তে তিল পরিমাণ সোনা ও রৌপ্য দেয়া হয়। এরপর ঘর নির্মাণের মূল কাজ-আরম্ভ করা হয়। ঐসময় আগতদের মিষ্টিমুখ করানো হয়।

পূর্বে ফরিদপুর অঞ্চলে দোচালা, চারচালা, আটচালা কোথাও একটালা ঘর নির্মাণ করা হতো। অবশ্য এসকল ঘর ছিল ছনের ছাউনি। বর্তমানে অবশ্য টিনের ছাউনি দোচালা অথবা চারচালা ঘর নির্মিত হয়। আটচালা ঘর এখন আর চোখে পড়ে না। এ ঘরগুলো ছিল চারচালা ঘরের শীর্ষে ছোট আকারের আর চারচালার ছোট ঘর। মূলত সৌন্দর্য এবং আভিজাত্য প্রকাশের জন্যই এ ধরনের ঘর নির্মাণ করা হতো।

দোচালা ঘরগুলো সাধারণত অসচ্ছল পরিবারেই দেখা যেতো। এসকল ঘরগুলো পাট খড়ি দিয়ে বেরা দিয়া হতো। চারচালা অথবা আটচালা ঘরে কাঠের ফ্রেম করে নলীবাঁশ বিছিয়ে বেরা বানানো হতো। এতে জানালাও থাকতো। তখনকার দিনে শন দিয়ে ঘরের ছাউনি দেয়া হতো। পরবর্তী সময়ে শনের পরিবর্তে টিনের ছাউনির প্রচলন হয়। বর্তমানে শনের ছাউনির কোনো ঘর চোখে পড়ে না।

তখনকার ঘরগুলোর ভেতরে একটি অংশে মাচান থাকতো যাতে গৃহস্থালীর মালামাল রাখা হতো। ঘরের সামনের কামরাকে হাতিনা বলা হয়। ঘরের মেজে ছিল কাঁচা মাটির। যা মাসান্তে, 'লেপা' হতো'। স্বচ্ছল পরিবারে দোচালার ঘরটি ঢেঁকি ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই ঘরের একপাশে থাকতো রান্না ঘর রান্না ঘর পরিবারের সকলেই খাবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতো।

পূর্বামলের ঘর-বাড়ি এখন নেই বললেই চলে। এখন সর্বএই আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

ফরিদপুর জেলা লোকসংগীতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ জেলায় লোকসংগীতের মধ্যে বৃষ্টি কামনায় কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রায় মেঘরাজার গান, বদনা বিয়ে, মাজারের গান, মানিক পিরের গান, নইলা গান ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিভিন্ন রোগ-বালাই থেকে আরোগ্য লাভের জন্য গাজির গান, শীতলার গান, সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষার পাবার জন্য রয়ানিগান, ব্রত নারীদের মধ্যে সূর্যপূজার গান, মাঘমণ্ডলব্রত, তারাব্রত, সতীনব্রত প্রচলিত আছে। নারীমনের স্রোতধারা ফুটে উঠেছে মেয়েলিগানে। মুর্শিদি, মারফতি, মরমি, বাউল, বিচারগান, সুরেশ্বরি গান, খাজা বাবার গান, মাজারের গীত ও ফকিরি গান এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ লোকসংগীত। বিরহ সংগীতের মধ্যে বারোমাসি, রাখালি, কর্মসংগীতের মধ্যে সারিগান, গোয়ালের ডাক, পালকির গান, ছাদপেটার গান উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গানের মধ্যে কবিগান, জারিগান এবং বিচার গানের ব্যাপক সংগ্রহ দেখা যায়। পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে অষ্টকগান, গাশশির গান, গাজনের গান, মনসাপূজার গান, দুর্গাপূজার গান, গাজির গানের প্রচলন আছে। হোলি উৎসব, চড়কপূজা এবং ত্রিনাথের মেলার বেশ কিছু গান শোনা যায়। শোকসংগীতের মধ্যে কৃষ্ণলীলা, নিমাই সন্ন্যাস পালা, গৌরাঙ্গলীলা, কীর্তন এবং ব্যবহারিক সংগীত হিসেবে বিবাহের গান, সাধভক্ষণ, জাতিকর্ম ও অন্নপ্রাশনের প্রচলন রয়েছে।

এ জেলা থেকে এখন পর্যন্ত যে সকল সংগীত সংগৃহীত হয়নি সেগুলো হলো: গীতিকা, ভাদুগান, টুসুগান, জাওয়াগান, আলকাপ, গম্ভীরা, মালসী, ঘাটু, ঝুমুর গান ও আদিবাসীদের গান উল্লেখযোগ্য।

ফরিদপুর জেলার লোকসংগীতকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। এক. লোকধর্ম বা লৌকিক অধ্যাত্ম্যচেতনাপুষ্ট সাধন সংগীত। দুই. লৌকিক জীবননির্ভর সাধারণ সংগীত।

এ পর্যন্ত ফরিদপুর জেলা থেকে অর্ধশতাধিক ধারার লোকসংগীত সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : বাউল, মরমি, বিচার গান, মুর্শিদি-মারফতি, ভাটিয়ালি, সুরেশ্বরি গান, খাজাবাবার গান, ফকিরালি গান, কবিগান, জারিগান, ধুয়াগান, কীর্তন, ধামালি, রয়ানি বা ভাসান, বিচ্ছেদ গান, অন্নপ্রাশনের, ভাইফোঁটার গান, হ্যাচড়াপূজার গান, সূর্যপূজার গান, মাঘমণ্ডল, তারাব্রত, কার্তিক পূজায় ভুলপুড়ানো, সতীনব্রত, ক্ষেত্রব্রত, গোক্ষুর নাড়ু, ত্রিনাথের মেলা, ভাংড়া বা অষ্টক, হুলোই বা অড়ন, নইলা, সারিগান, বারমাসি, গাশ্‌শি, পালকির গান, গোয়ালের গান, বৃষ্টির গান, বোল, মেয়েলিগীত, ছয়হাটুরে বা নামকরণ, তেলপান গুয়ার গান, খাতনার গীত, সাইর গান এবং বেদে-বেদনীর গান প্রভৃতি। এর মধ্যে এ জেলার প্রতিনিধিত্বশীল কয়েকটি লোকসংগীত উল্লেখ করা হলো : বাউল, মরমী, মুর্শিদি, ফরিদপুর জেলার অগ্রগণ্য লোকসংগীত। এ সকল ধারা থেকে সৃষ্ট 'বিচারগান' ফরিদপুর জেলার শ্রেষ্ঠতম লোকসংগীত।

www.pathagar.com

ফরিদপুর জেলার উল্লেখযোগ্য বাউল ও মরমি সাধকদের একটি তালিকা প্রণীত হলো। তিনুশাহ (চণ্ডিপুর), খোশাল চাঁদ (রামনগর), মেছের শাহ (মাসাউজান), আরফিন শাহ (দত্তপাড়া), পাঁচু ফকির (সাকপাইলদ্যা), নৈমদ্দিন ফকির (ধোপাডাঙ্গা), গহেরশাহ (ঘাগর), কিতাবদ্দি শাহ (কৃষ্ণ নগর), করিমদ্দিন (খলিলপুর), ছৈজদ্দিন ফকির (বিলমামুদপুর), মুন্সী বাসের (কোশগাঁও), যোগেশ সরকার (কৃষ্ণ নগর), সানাল চাঁদ (পদ্মাপাড়), সমীর চাঁদ (মথুরাপুর), নবাব চাঁদ (ব্রাহ্মণকান্দা), কালাচাঁদ (প্রেমতারা), কুড়ুদাস (গোয়াইলপোতা), ক্ষ্যাপা-ক্ষেপী (ধোপাডাঙ্গা), পাইলন ফকির (সাতৈর), ফটিক গোঁসাই (মাইচ কান্দি), আহাম্মদ শাহ (বিনিকদিয়া), ডা. হানিফা (বাখুণ্ডা), আনেচ আলী (মানিকদা), সতীশ গুহ (খামার পাড়া), কমলাবালা (লংকার চর), জসীমউদ্দিন (ঝাউখালী), ছাদেক (রূপদিয়া), গনি বয়াতি (চরভদ্রাসন), সাধু শিকদার (ভাজনডাঙ্গা), মঙ্গল সাধু (অম্বিকাপুর), মঙ্গল বয়াতি (ভীমপুর), ফেলাশাহ (কানাইপুর), হাসমত চাঁন (ভাটি লক্ষীপুর), মোন্তাজ ফকির (ভাজনডাঙ্গা), মেছের ফকির (আলিয়াবাদ), ওয়াজেদ মোল্লা (ভাটপাড়া), আজিম শাহ (গোয়ালেরটিলা), আমিনুদ্দিন মোড়ল (মৃজারচর), মেঘু বয়াতি (গোয়ালের টিলা), মহিন সাঁই (কমলাপুর), খোরশেদ (কাজির সুরা), ইয়াছিন ফকির (প্রেমতারা), সেক দবিরউদ্দিন (গজারিয়া), দেওয়ান মোহন সদরদি), নাসিরশাহ (কুমার কান্দি), কোরবান খাঁ (ডিক্রিরচর), আইনুদ্দিন (কানাইপুর), জলুরশাহ (শুকতলী), কুটি শিকদার (বাখুন্ডা), খোরশেদ (চাঁনপুর), করিম বয়াতি (ভাজনডাঙ্গা), আঃ রহমান চিশতি (ঘনশ্যাম), আব্দুর রহমান (টেপাখোলা), ফরমান সাধূ (ভাবুকদিয়া), মজিদ (সদরদি), মোকসেদ (বিনিকদিয়া), ছৈজদ্দিন (খয়েরদিয়া), আকমত বয়াতি (রামনগর), জমির আলী (সদরপুর), আসাদ বয়াতি (ধুলদী), হাজেরা বিবি (অম্বিকাপুর), আয়নাল মিয়া (মাহিশালা), পূর্ণসরকার (পুয়াইল), চাঁদ মিয়া (সোনাখোলা), কানাইলাল শীল (নগরকান্দা), কুটি মুন্সুর (লোহারটেক), দাইজদ্দিন (রামনগর), মাখন (বসুলহাট), মোতালেব শরীফ (রামচন্দ্রপুর), আব্দুর রহমান (বায়তুল আমান), আলাউদ্দিন সাঁই (ভাজনডাঙ্গা), মান্নান খাঁ (বাখুণ্ডা), মঈনুদ্দিন ফকির (সাদিপুর), আলেয়া বিবি (সন্ন্যাসীর চর), তাইজদ্দিন শাহ (সদরদি), কাসিম ফকির ওরফে কোছে কাওড়া (ধোপাডাঙ্গা চাঁদপুর), পাগলা বাবলু (ওয়ারলেস পাড়া), সিকান্দার আলী খান মনা (আলীপুর)। এ ছাড়া জব্বার ফকির, ওয়াজেদ চান, রশিদ বয়াতি, আব্দুস সামাদ, আমজেদ, ইসমাইল আলী, ইয়ার আলী, গোলাম হায়দার, দেওয়ানমোহন, ফকির মজিদ, জালাল বয়াতি (ধুলদী বাজার), আব্দুল হালিম বয়াতি ও দলিল উদ্দিন (ধলু) বয়াতি (নাওডোবা), সুফি আব্দুল মজিদ (আলীপুর)।

ফরিদপুর জেলার শ্রেষ্ঠতম মরমী সাধক হিসেবে মেছের শাহকে গণ্য করা হয়। যিনি ১২৪৭ মতান্তরে ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুন সদরপুর থানার কোনো এক চরে জন্মগ্রহণ করেন এবং নদীভাঙ্গনে সেই স্থান পরিত্যাগ করে নগরকান্দা থানার মাসাউজান গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। মৃত্যু ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। খোসাল চাঁদ দরবেশ ছিলেন তাঁর সাধক গুরু 'সত্যধর্ম মারুফাতে এছলাম' নামক বেতাব সহ তাঁর পাঁচ শতাধিক দেহতত্ত্ব, মারুফতি, মুর্শিদি, প্রেমতত্ত্ব ও নবীতত্ত্বমূলক বিচিত্রধর্মী গানের সন্ধান

www.pathagar.com

পাওয়া যায়। কুমার নদ সংলগ্ন রসুলপুর বাজারের পশ্চিমপাশে এই সাধকের মাজার রয়েছে। বর্তমানে এখানে প্রতি বছর ১৯ চৈত্র ওরস হয় এবং অসংখ্য ভক্তকুল ও অনুরাগীদের সমাবেশ ঘটে।

১. বিয়ের গীত

প্রাক্ বিয়ের গীত

১.

স্নান করতে গেল ও মাধন
দেখলাম অনবিয়াস্থ ময়নারে
সেইনা ময়নারে আনতি ও মাধনরে
কত লাগবিরে সিন্দুর।
যত লাগে দিবরে মইফুল
তুমি বিয়া করো।
সেইনা ময়নারে আনতি ও মাধনরে
কত লাগবিরে জেওর।
যত লাগে দিবরে মইফুল
তুমি বিয়া করো।
সেইনা ময়নারে আনতি ও মাধনরে
কত লাগবিরে কাপড়।
যত লাগে দিবরে মইফুল
তুমি বিয়া করো।
সেইনা ময়নারে আনতি ও মাধনরে
কত লাগবিরে টাকা।
যত লাগে দিবরে মইফুল
তুমি বিয়া করো।

২.

ছয় মাস ধইরা নয় মাস ধইরা
আমি সিন্দুরর বাইনা দিছি
আমি জেওরের বাইনা দিছি
তেওনা পাইলাম তোর বাবাজানের জবান নারে
তেওনা পাইলাম তোর চাচাজানের মনও নারে বিবি;
রাইত পোহাইলি চকিদার বুলাইয়া আনবো আলোবিবি
নিবো তোরে চুলের জুটি ধইরা আলো বিবি
নিবো তোরে চোখের টিপ দিয়ারে আলো বিবি,
কাইন্দা মরবি তোর দরদীর বাপজান নালো আলো বিবি

www.pathagar.com

কাইন্দা মরবি তোর দরদী মাধন নালো বিবি।

বিয়ের প্রস্তাবের গীত

কলসি ভইরা আনছি দুগ্ধ
দেও দেও মামাসাব
কোলের রাজনরে বিয়া নারে।
কলসির দুগ্ধ ছিটেই ফেলবো
কলসির দুগ্ধ ডাইল্যা ফেলবো
তেওনা দিবো কোলের রাজন রে বিয়ানারে।
কাগজে ভইরা আনছি সিন্দুর
দেও দেও চাচাজান
কোলের রাজন রে বিয়া নারে।
কাগজির সিন্দুর ছিটায়া ফেলবো
তেওনা দিবো কোলের রাজন রে বিয়া নারে।
কাগজে ভইরা আনছি মাজন
দেও দেও ফুফাজান
কোলের রাজন রে বিয়া নারে
কাগজির মাজন ছিটায়া ফেলবো
কাগজির মাজন ঢাইল্যা ফেলবো
তেওনা দিবো কোলের রাজন রে বিয়া নারে।

বিয়ের পয়গাম সম্পর্কে গীত

মামুজান যে জুটাইছেন কামও
জমিদারের বেটি কি নবীন কোকিলা
সেহান থনে পাঠাইছেন চিঠি
আসমান তারার সিন্দুর কি
নবীন কুকিলা।
কোথায় পাবো কোথায়রে যাবো
আসমান তারার সিন্দুর কি নবীন কোকিলা।
চাচাজান যে জুটাইছেন কামও
তালুকদারের বেটি কি নবীন কোকিলা,
সেহান থনে পাঠাইছেন চিঠি
ফুলজানের মাজন কি
নবীন কোকিলা।
কোথায় পাবো কোথায়রে যাবো
ফুলজানের মাজন কি নবীন কোকিলা।
ফুফাজান যে জুটাইছেন কামও

www.pathagar.com

মাতুব্বরের বেটি কি নবীন কোকিলা
সেহান থনে পাঠাইছেন চিঠি
কুটি বড়ুর জেওর কি
নবীন কোকিলা।
কোথায় পাবো কোথায়রে যাবো
কুটি বড়ুর জেওর কি নবীন কোকিলা।

বিয়ের সওদা করার গীত

সূর্যবালির ঘরে কি দুয়ারে
ঐ সুরার ও পাশায় মিলে কি নারে
ঐনা সিন্দুর পাশায় মিলে কি নারে
ঐনা সিন্দুর কিনেরে বাদশাররে বিটা
ঐনা জেওর কিনেরে বাদশাররে বিটা
ঐনা সিন্দুর কিনেরে বাদশাররে বিটা
পাঁচশো টাকা দিয়া কি নারে।
ঐনা জেওর কিনেরে বাদশাররে বিটা
হাজার টাকা দিয়া কি নারে।
ঐনা সিন্দুর পরে সূর্যবালি কি নারে
তিরি ছুটে ঘাম ও কি নারে
ঐ নার ঘাম পোছেরে বাদশার বিটা
হস্তেরও রুমাল দিয়া কি নারে
আবের পাঙ্খা দিয়া কি নারে।

হলুদ কোটার গীত

১.
কেমনে টেকিলা অলদি
কেমনে টেকিলা অলদি
ও নালো জান কি
মধ্যি রইছে সুজি কি নারে।
না-ও যদি টেকিবার পারো অলদি
না-ও যদি টেকিবার পারো অলদি
ও নালো জান কি তোমার মারে আনো
সাথে কি নারে,
তোমার চাচীরে আনো
সাথে নারে ও নালো জানকি।

২.
আজকের ষোলই দৃষ্টির অলদি
কে কে কুটে হারে ও ভাঙ্গেলা,
তোমার নানীজান খুনকারের বেটি হারে ভাঙ্গেলা

www.pathagar.com

তোমার খালাজান জমিদারের বেটি হার ভাঙ্গেলা
তোমার চাচীজান মিঞাগো বেটি হারে ভাঙ্গেলা।

কুলা ও ঢাকুনি সাজানোর গীত

কুলা কিনতি অবি,
কুলারে তোর জনম কোন্‌হানে?
আমার জনম হুনতে পাই ঋষির দুহানে।
ও কি সুন্দর রামরে,
সিন্দুর কিনতি অবি,
সিন্দুর রে তোর জনম কোন্‌হানে?
আমার জনম হুনতে পাই বাইদ্যার দুহানে
ও কি সুন্দর রামরে,
অলদি কিনতি অবি
অলদিরে তোর জনম কোন্‌হানে?
আমার জনম হুনতে পাই গেরস্তের পালানে।
ও কি সুন্দর রামরে।
ঢাকুন কিনতি অবি,
ঢাকুন রে তোর জনম কোনহানে?
আমার জনম হুনতে পাই কুমেইরির দুহানে।
ও কি সুন্দর রামরে,
ধান কিনতি অবি,
ধানরে তোর জনম কোন্ চকে?
আমার জনম হুনতে পাই গেরস্তের চকে?
ও কি সুন্দর রামরে,
দুর্বা আনতি অবি,
দুর্বারে তোর জনম কোন্‌হানে?
আমার জনম হুনতে পাই আলানে পালানে।
ও কি সুন্দর রামরে।

গোসল করানোর গীত

কাঠালের পিড়িতে আবে জিলিক মারে
তার উপরে নওশা গোসল করে,
আমি তো যাবো দুরের শ্বশুর বাড়িরে
কি কি নিবো মোর সাথে রে
ঘরে তো আছে কৌটা ভরা সিন্দুর রে
তাতে তো বিবি তোমার শোভা হবে কি নারে;
আমি তো যাবো দূরের শ্বশুর বাড়িরে
কি কি নিবো মোর সাথে রে

www.pathagar.com

ঘরে তো আছে বাক্স ভরা কাপড় রে, জেওর রে
তাতে তো বিবি তোমার শোভা হবে কি নারে।
আমি তো যাবো দুরের শ্বশুর বাড়িরে
কি কি নিবো মোর সাথে রে
ঘরে আছে কৌটা ভরা পাউডাররে, সনু, আলতারে
তাতে তো বিবি তোমার শোভা হবে কি নারে।

বর সাজানোর গীত

১.
ওরে সুন্দর রামরে
রাম সীতার হবে বিয়া
তাইরির জয় জয় হুনিরে
ওরে সুন্দর রামরে
কি দিয়া সাজাবো রে
বনিকার ও চন্দর আইন্যা রামরে সাজাবো
ওরে সুন্দর রামরে
কি দিয়া সাজাবো রে
দ্বীপের শীষের কাজল আইন্যা রামরে সাজাবো
ওরে সুন্দর রামরে
কি দিয়া সাজাবো রে,
মালিকারো মালা আইন্যা রামরে সাজাবো
ওরে সুন্দর রামরে
রাম সিতার হবে বিয়ারে।

২.
স্বর্ণ থালে ফুলের বাসর সাজাইয়া দেও শ্রীরাম লক্ষণ
শ্যামতো রাধার কুঞ্জে আইলো না।
সাজাইয়া দেও শ্রীরাম লক্ষণ
শুকাইল প্রেমসাগর
শ্যামতো রাধার কুঞ্জে আইলো না,
বনিকা রো চন্দন আইন্যা সাজাইয়া দেও শ্রীরাম লক্ষণ
শুকাইলো প্রেমসাগর
শ্যামতো রাধার কুঞ্জে আইলো না,
দ্বীপের শীষের কাজল আইন্যা সাজাইয়া দেও শ্রীরাম লক্ষণ
শুকাইলো প্রেমসাগর
শ্যামতো রাধার কুঞ্জে আইলো না।

৩.
খাওরে গোপাল দুগ্ধের সর
খাওরে গোপাল ঘিয়ের সর

www.pathagar.com

মনের সুখে খাওয়াই তোরে ওরে বাছা জলধর।
পরোরে গোপাল আচকান পরো
পরোরে গোপাল টুপি পরো
মনের সুখে খাওয়াই তোরে ওরে বাছা জলধর।
পরোরে গোপাল মোজা পরো
পরোরে গোপাল জুতা পরো
মনের সুখে পরাই তোরে ওরে বাছা জলধর।
কররে গোপাল মা বাপরে সেলাম কর
কররে গোপাল এবার যাত্রা কর
মনের সাধে করাই বিয়া ওরে বাছা জলধর।

আশীর্বাদমূলক গীত

পাচ কাপড় পইরারে ছাওয়াল সিপাই
খাড়ায় মুরুব্বির আগে
ভালো দোয়া দেও ওরে বাপজান
বিয়ার সাজন গো ভালো সাজি
বিয়া কইরা বাড়ি আসি।
ভালো দোয়া দিছিরে ছাওয়াল সিপাই
তুমি বিয়ার সাজন গো ভালো সাজো
তুমি সিপাই বিয়া কইরা বাড়ি আইসো।
আন্ধার রাইতে যাওরে ছাওয়াল সিপাই
তুমি হলক রাইতে বাড়ি আইসো
কাঁটা বন দিয়অ যাওরে ছাওয়াল সিপাই
তুমি ফুল বন দিয়া বাড়ি আইসো
তুমি দোসর নইয়া বাড়ি আইসো।

আমন্ত্রণ গীত

বিবির মারে কইয়ো খবর
খাট পালং সাজাইতে,
আসুক আসুক সাহেবরে দামান
বাঁশ বাগান ঘুরিয়া,
ফুল বাগান ঘুরিয়া,
পথের সামনে দিয়অ থুইছি
আলম টুঙ্গির ঘরটি,
সেই না ঘরে নাগাইয়া থুইছি
শাল সুন্দরীর কপাট
ঐনা কপাট ভাঙ্গিবে দামান
একও লাথ্যি দিয়া

www.pathagar.com

ভালো একও থাবুর দিয়া
তেওন্যা যাবি বিবির চকিতে পাশা না খেলিয়া
ভালো জুয়া না খেলিয়া;
দামানদের নিগা দিয়া থুইছি
ইফতেরির না কুত্তা,
ঐনা কুত্তা কাটপিরে দামান তরয়াল দিয়া।

বিয়ে বাড়িতে কন্যা পক্ষের অভিযোগ

কেমন বাপের কেমন হারে বেটা
ওকি দামান পাল্কি দেয় নাই তোমার সাথে নারে
ওকি দামান তিরি ছুটে ঘামও নারে,
তোমার মারে পাল্কি আলাগো দিয়া
পাল্কি আনতা তোমার সাথে নারে,
কেমন চাচার কেমন হারে ভাইস্তা
ওকি দামান মশালচি দেয় নাই তোমার সাথে নারে,
ওকি দামান তিরি ছুটে ঘামও নারে
তোমার চাচিরে মশালচি আলাগো দিয়া
মশালচি আনতা সাথে,
কেমন মামুর কেমন হারে ভাইগনা
ওদি দামান বাজি দেয় নাই তোমার সাথে নারে
ওকি দামান তিরি ছুটে ঘামও নারে
তোমার মামানীরে বাইন্যা গো দিয়া
বাজী আনতা সাথে নারে।

পান-সুপারির গীত

পান দে লো দামানদের মাধন
পান চরিনে চেরিব
ছ্যাদার আর কত বুঝাব ও লটি
আর কত বুঝাবো,
পাট উইঠা বেটারা নইয়া তারে
যায় ফইরাতপুরের হাটে লো
তারে বেইচা আসে বাড়ি নালো;
সুপারি দেলো দামানদের চাচি
সুপারি চেরিনে চেরিব
ছ্যাদার আর কত বুঝাব ও লটি
আর কত বুঝাবো,
সুপেরির দোকানদার বেটারা নইয়া তারে
যায় তালমার হাটে লো
তারে বেইচা আসে বাড়ি নালো।

www.pathagar.com

কন্যা সাজানোর গীত

সুরমা আমায় ভুলাইছে
নাকের বেসর পরাইতে
কে কে যাবিলো তোরা
সুরমা রাজার দ্যাশেতে।
সুরমা আমায় ভুলাইছে
হাতের বেসর পরাইতে
কে কে যাবি লো তোরা
সুরমা রাজার দ্যাশেতে।
সুরমা আমায় ভুলাইছে
পায়ের বেসর পরাইতে
কে কে যাবি লো তোরা
সুরমা রাজার দ্যাশেতে।

কন্যা বিদায়ের গীত

১.
উঠো উঠো মিরজান বড়ু
উঠো ডুলির মাঝে কি নারে
আমি যাবো ঐনা পরের ঘরে রে
কি কি দিবেন সাথে রে
থাল দিবো, বাটি না দিবো মিরজান বড়ু
ঠাটারো দিবো সাথে নারে;
অত ব্যাবার চাইনা রে বাপজান
আমি মাধন নিবো সাথে নোরে;
তোমার দ্যাশের মানষি কইবেরে মিরজান বড়ু
বান্দি আনছে সাথে নারে।
উঠো উঠো মিরজান বড়ু
উঠো ডুলির মাঝে কি নারে
আমি যাবো ঐনা পরের ঘরে রে
কি কি দিবেন সাথে নারে।
গাই দিবো, বাছুর দিবো মিরজান বড়ু
রাহাল দিবো সাথে নারে,
অত ব্যাবার চাইনারে চাচাজান
আমি চাচীরে নিবো সাথে নারে,
তোমার দ্যাশের মানষি কইবেরে মিজান বড়ু
বান্দি আনছে সাথে নারে।

www.pathagar.com

২.
মিঞাভাইর দুয়ারে বটবৃক্ষের গাছরে
সেইনা গাছে কাকাতুয়ার বাসা নারে,
কাকাতুয়া ডাইক্যা বলে কন্যার বাপজানরে,
বেটি পাইলা পরকে করলা দান নারে,
হাঁস ওনা মুরগি পালিতা কত টাকা পাইতা নারে।
বেটি পাইলা অন্তর করলা পুড়া নারে।
মিঞা ভাইর দুয়ারে বটবৃক্ষের গাছরে
সেইনা গাছে কইতরের বাসা নারে
কইতর ডাইক্যা বলে কন্যার মাধনরে
কন্যা পাইলা পরকে করলা দানও নারে।
হাঁস ওনা মুরগি পালিতা কত টাকা পাইতা নারে।
বেটি পাইলা অন্তর করলা পুড়া কি নারে।

৩.
পর হইয়া আইচোরে তুতা
পরে নিয়া যাবিরে
ও সোনার তুতারে,
টাকা হইলো আপন বাপধন
আমি হইলাম পররে
ও সোনার তুতারে।
সোনা নহে, রূপা নহেরে তুতা
কৌটায় ভইরা রাখপোরে
ও সোনার তুতারে,
টাকা নহে পয়সা নহেরে তুতা
বাক্সে ভইরা রাখপোরে
ও সোনার তুতারে,
পর অইয়া আইছোরে তুতা
পরে নিয়া যাবিরে
ও সোনার তুতা রে,
ধান নহে, চাইল নহে রে তুতা
মাচা ভইরা রাখপোরে
ও সোনার তুতা।

বধূবরণ গীত
রাই রাই চলো সখি আমরা বরণে যাই,
এত দিন ছিলার দুর্বা আলানে পালানে
আজ কেন আইছাওরে দুর্বা এই বিয়ার বরণে।
এতদিন ছিলারে ঢাহুন কুমারেরও দুহানে

www.pathagar.com

আজ কেন আইছাওরে ঢাহুন এই বিয়ার বরণে।
এতদিন ছিলারে সিন্দুর বানিয়ারও দুহানে
আজ কেন আইছাওরে সিন্দুর এই বিয়ার বরণে।
এতদিন ছিলারে মাজন বানিয়ারও দুহানে
আজ কেন আইছাওরে মাজন এই বিয়ার বরণে।
এতদিন ছিলারে কুলা ঋষিরও দুহানে
আজ কেন আইছাওরে কুলা এই বিয়ার বরণে।
এতদিন ছিলারে ধান গেরস্তের ঘরে
আজ কেন আইছাওরে ধান এই বিয়ার বরণে।

পাশাখেলার গীত

রোশনাই ঘরে উঠায় দুর্লভ রে
হিরামন কাঞ্চন দিয়া
রোশনাই ঘরে উঠাইয়া দুর্ভল রে
জ্বালায়া মোমের বাতি নামাইয়া দুর্লভ রে
নামায়া ফুলের ঝাপি দুর্লভ রাজারে,
ফুলের ঝাপি নামাইয়অ দুর্লভ রে
খেলায় সায়রির পাশা দুর্লভ রাজারে,
এক দাইনি দুই ওদাইনি তিনও দাইনির কালেরে
দুর্লভ রাজারে,
তিন দাইনির কালে জিতিল চম্পারে
ঠকিল দুর্লভ রে, দুর্লভ রাজারে।
তিন দাইন চার দাইন পঞ্চ দাইনির কালেরে
দুর্লভ রাজারে,
ঠকিল ঠকিল ঠকিল দুর্লভ রে
জিতিল জিতিল চম্পারে দুর্লভ রাজারে।
পঞ্চ দাইন দিয়া দুর্লভ রে
যায়ও ফুলের বাগে, দুর্লভ রাজারে,
ফুলের বাগে যাইয়া দুর্লভ রে
কাঁটে ছরিরে, দুর্লভ রাজারে,
ফুলের ছরি কাইটা দুর্লভ রে যায়ও নিজের ঘরে
দুর্লভ রাজারে,
নিজও ঘরে যাইয়া দুর্লভ খেলায় সাইরির পাশারে
দুর্লভ রাজারে,
এক দাইন দুই দাইন তিন দাইনের কালেরে
জিতিল জিতিল দুর্লভ রে
দুর্লভ রাজারে।

www.pathagar.com

বাসিবিয়ার গীত

কিবা হালুয়া পাকাইছ মালো মা
বাসনায় ম ম করে
দামান্দের বাপজান এমন ছুচা
কানচি বাইয়া আসে,
কুত্তা বইল্যা মারলাম বাড়ি
খেউ খেউ কইরা কান্দে।
কিবা ছালুন পাকাইছ মালো মা
ঘ্রাণে ম ম করে
দামান্দের চাচাজান এমন ছুচা
বেড়া ভাইঙ্গা আসে
বিলেই বইল্যা মারলাম বাড়ি
ম্যাও ম্যাও কইরা কান্দে।

শিশুর জন্ম উপলক্ষে গীত

স্বর্গের গুনা পইলোরে সোনার ওলি
সোনার ওলি হস্তের কলমরে নিয়া
তোমার নানির আছে জুলাইত্যা টাহরে
গইড়া দিবোরে জামা;
স্বর্গের গুনা পইলোরে সোনার ওলি
হস্তের কমলরে নিয়া
তোমার দাদির আছেরে সোনার জেওর
কিনা দিবোরে জুতা।

২. মুর্শিদি গান

মুর্শিদি আধ্যাত্ম সাধনা ভিত্তিক গান। ‘শামা’ গজলের উত্তরসূরী হিসেবে মুর্শিদি গানের প্রচলন হয়। এ গানের উৎপত্তিস্থল চট্টগ্রামে (খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকে)। কালক্রমে নোয়াখালী, কুমিল্লা, বরিশাল, ফরিদপুর সহ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। কেউ কেউ বাউল, মারফতি, মুর্শিদি গানকে একটি বৃক্ষের তিনটি ‘ফল’ বলতে প্রয়াস পেয়েছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, কঠিন অসুখ-বিসুখ থেকে মুক্তি পাবার বিশ্বাসে রাত্রিকালে বৈঠক ডেকে মুর্শিদি গান গাইতে দেখা যায়। উঁইপোকার বংশ ধ্বংস করতে এবং অশুভ শক্তিকে উৎখাত করার মহৌষধ হিসেবে মুর্শিদি গানের আয়োজন করা হয়। ফরিদপুরের কিছু কিছু মুর্শিদি গানের ভণিতায় মরমি সাধক মেছের শাহের নাম পাওয়া যায়। এই জেলায় মুর্শিদি গানের ব্যাপক ভাণ্ডার রয়েছে।

www.pathagar.com

১.
তুমি দাও দেখা দয়াল চাঁনরে আমার
তোরে না দেখিলে প্রাণ আমার বাঁচে নারে।।
দয়াল আমারে দিয়া ফঁকি
তুমি হইলা বনের পাখিরে
তোরে পঞ্জিরায় ভরিয়া রাখবো। [...]

২
আমি দুঃখে পইরা যে ডাল ধরি গুরু ধন
সে ডাল ভর আমার মানে না
গুরু তোর নাম সাধন করতে পারলাম না,
আইছি ভবে, যাইতে হবে
সেও চিন্তা করলাম না
গুরু তোমার নাম রাখতে পারলাম না,
আসবার সময় দিয়া আইছি দরুন করাল
সেও কথা মনে করলাম না
গুরুর ভাব রাখতে পারলাম না,
সেইন্যা দেশে যাবো রে গুরু ধন
সেইন্যা দেশে যাবো
হারে গুরুর ভাব রাখতে পারলাম না,
কি ধন দিতে কি ধন দিলা
সেও ভাবনা তো করলাম না
হারে গুরুর সাধন করলাম না।
আশায় আশায় জনম গেল তবু আশা মিটলো না
গুরু তোমার নাম রাখতে পারলাম না।

৩. কবিগান

কবিগান এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গান। এই গানে দুটি দল থাকে। প্রত্যেক দলের দলপতিকে কবিয়াল বলা হয়। কোথাও এঁরা সরকার বা কবি সরকার নামেও পরিচিত। যশোর, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুর অঞ্চলের যে কয়জন উল্লেখযোগ্য কবিয়ালের নাম পাওয়া যায় তাঁরা অধিকাংশই তারক সরকারের শিষ্যপরম্পরারূপে নিজেদের পরিচয় দেন। তারক সরকারের দুই শিষ্য নড়াইলের বিজয় সরকার এবং ফরিদপুরের নিশি সরকার। এঁরা বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ফরিদপুর জেলার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবিয়াল হলেন : রাসমোহন সরকার (জানদি), বসন্ত সরকার (গজারিয়া), নিতাই সরকার (গজারিয়া), মধু ভূঁইয়া (জোয়ার)। বিভিন্ন প্রজাসাধন, বারণী স্নান বৈশাখী ও চৈত্রের মেলায় কবিগনের আসর বসে।

www.pathagar.com

কৃষ্ণ সেবা করতে যায়রে দেবী গঙ্গা ঘাটে,
অঞ্চলে বান্ধিয়া নিল রণী গঙ্গার ঘাটে,
জটিলা কয় দাদা তোমার বউর কথা শুনেছ
অঞ্চলে বান্ধিয়া নিল রণী তবেই করলো কৃষ্ণ সেবা। [...]

সংগৃহীত কবিগান

(১)
প্রণতি প্রণতি দেবী সরস্বতী
বিষ্ণু হতে জন্ম তোমার পুজিল প্রজাপতি।
যক্ষ রক্ত গন্ধর্ব দেবতা কিন্নর
সকল জীবের কণ্ঠে তুমি করেছিলে ভর
সেই হতেই বাক্য পেল
পুরুষ ও প্রকৃতি ॥
গাড়ি বাড়ি ধন ঐশর্য্যে হোকনা অনন্য
বিদ্যা বুদ্ধি না থাকিলে সকলের ঘৃন্য
তুমি বিদ্যা দিয়ে বিদ্যান করো
রাখো মোর মিনতি ॥
আশু বলে নয়ন জলে পূজিবো চরণ
বসো আমার কণ্ঠ পরে দিয়েছি আসন
আমার আঁধার ঘরে জ্বেলে দিও
তোমার জ্ঞানের বাতি ॥

(২)
এসো ধ্যানের ছবি প্রাণেরও ঠাকুর
এসো রুনু ঝুনু মধুর সুরে
বাজিয়ে পায়ের নূপুর ॥
মোহন মুরলী করে হাসি মাখা মুখ
তোমায় হেরে নয়ন জুড়ায় ভরে ওঠে বুক
তোমায় হেরে পাই পরম সুখ
মনের ব্যথা সব হয় দুর ॥
অনাদির আদি তুমি ব্রহ্ম সনাতন
বিশ্বপিতা বলে কেহ শ্রী নন্দের নন্দন
তুমি সবার জীবন মরণ
হাসি কান্নার মিলন সুর ॥

www.pathagar.com

বাঁশির সুরে বিশ্ব ভোলে উজান বহে জল
হাসিতে ফুল ফোটে কত হাসিতে হয় চঞ্চল
পেতে তোমার চরণ যুগল
প্রাণ কাঁদে বনের পশুর ॥
আশু বলে সকল ভুলে তোমায় শুধু চাই
অন্তিমকালে যেন তোমার চরন ছায়া পাই
যেন, নয়ন জলে চরন ধোরাই
রাখি মমো হৃদয় পুর ॥

(৩)
নিতাই চাঁদের তরীরে আয়, ভব পারের সময় যায়
ওসে দয়ার সাগর দয়াল নিতাই
সবাইকে পার করে দেয় ॥
প্রেমের ঠাকুর নিত্যানন্দ তার সনে থাকলে সম্বন্ধ
ভবে লাভ হবে তার প্রেমানন্দ দুরে যাবে সকল ভয় ॥
হরিনাম তরণীলয়ে গুরু সেজে হাল ধরিয়ে
পাপী তাপী দেয় ত্বরায়ে পারের কড়ি নাহি লয় ॥
সদগুরু সৎ পথের সন্ধান যদি পায় কোন ভাগ্যবান
ভবে আসা যাওয়া হয় অবসান
নিত্য বিন্দাবনে ধায় ॥
ভুল করেও যাসনা অঘাটে পার হতে পারবিনা মোটে
হবি নামের তরী উজান ছোটে
সকল বাধা করে জয় ॥
শেষের যাত্রী যারা ছিল নিতাই চাঁদের তরী পেল
আশুতোষের দীন ফুরালো
বসে কাঁদে অবেলায় ॥

(৪)
গৌরি চাঁদের নাম শুন গাও ওরে আমার পাগল মন
ও তোর নামে পাবে নিত্যানন্দ
দুর হয়ে যাবে শমন ॥
যে নাম ছিল গোলক পুরে সেই নাম এই কলির বাজারে
বিনা মূল্যে ঘরে ঘরে
দিয়েছে শচীর নন্দন ॥
হরি নামী হরি নামে গৌরি হরি ধরা ধামে
তার নামে যার অশ্রু নামে
লাভ হবে তার প্রেমধন ॥

www.pathagar.com

গরবী দুঃখীর ব্যথা হারী দীন দরদী গৌর হরি
ঘাটে ঘাটে ভিড়ায় তরী
কেউ হবে না তার মতন ॥
আশু বলে ভবের খেলায় দিন কাটে মোর সংসার মায়ায়
এবার কৃপা করো গৌল আমায়
কেটে দাও মায়ার বাধন ॥

(৫)
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বলে চল ওড়া কাদি প্রেম বাজারে
যারে দেখার আশে পরাণ কাঁদেরে
তারে দেখে আসি পরান ভরে ॥
পূর্ণ ব্রহ্ম হরিচাঁদ আমার এলা ওড়াকান্দি ধাম
পাপী তাপী ত্বরাইতে রে বিলায় মধুর হরিনাম
এলো স্বনামে ছাড়িয়া স্বধাম রে
হলো ব্যথার ব্যতিত এ সংসারে ॥
ঢেউয়ের নদী পাড়ি দিয়ারে ও সেই ধামে যেতে হয়
প্রেম বৈঠা ভক্তি বাদামরে সকল বাধা করে জয়
ঠাকুর গুরুচাঁদ থাকবি সহায়রে
দেখবি কোন বাধা আসবে নারে ॥
হরিচাঁদের রূপের ছটায়রে ওরে ভোলে ত্রিভুবন
তাঁর গুণগায় ব্রহ্মা বিষ্ণুরে পঞ্চ মুখে পঞ্চানন
হরিচাঁদ রুপে যে দেয়নি নয়নরে
ভবে কলুর বলদ বলে তারে ॥
আশু বলে নয়ন জলেরে ভবে আছি যতক্ষণ
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ পদেরে যেন ডুবে থাকে মন
যেন ফিরে আর আসি না কখন রে
এই মায়া বন্ধ কারাগারে ॥

(৬)
ওগো প্রভু দয়াময় ভুলোনা আমায়
রেখো তুমি আমাকে চরণ তলে
তোমার চরণ পর দিয়েছি জীবন ভার
তুমি প্রভু আমাকে
যেওনা ভুলে ॥
তোমাকে যখন আমি বসে ভাবে নিরালায়
আমার মন পরাণ প্রেমানন্দে ভরে যায়
যেদিকে মেলি আঁখি সেদিকে তোমাকে দেখি
আপন ভাষায় ডাকি

www.pathagar.com

হে প্রভু বলে ॥
তোমাকে যখন আমি মন থেকে ভুলে যাই
পলে পলে ক্ষণে ক্ষণে কতই যে ব্যথা পাই
তখন কেউ কাছে আসেনা মোরে ভালবাসে না
একা একা কেঁদে মরি নয়ন জলে ॥
দয়ার সাগর তুমি ওগো দীন বন্ধু
এ পাপীরে করো দয়অ ওগো কৃপা সিন্ধু
তোমার চরণ ভরসা আশুতোষের আশা
ধন্য হতাম প্রভু তোমাকে পেলে ॥

(৭)
এতো ভগবানের মাঝে কারে কই প্রধান
কার চরণে নোয়াই মাথা
কারে করি অর্ঘ্য দান ॥
পুরানে দিলে দরশন ভগবান মেলে কতজন
আদশ্যশক্তি কার্ত্তিক, গণেশ, পাগলা পঞ্চানন।
কে হবে মোর মনের মতোন
জুড়াইবে তাপিত প্রাণ ॥
জগবন্ধু অনুকুল ঠাকুর তাদের বাণী সুমধুর
ভক্তাভক্ত এ জগতে রয়েছে প্রচুর
নাকি তাদের নামেও ধরাধামে
পাপীরা পায় পরিত্রাণ ॥
এক ভগবান ওড়াকাদি গায় সে যে কৈ মাছের ঝোল খায়
এই গুণে কি তারক গোসাই আসল হরি কয়
নইলে আসল বলার যুক্তি কোথায়
পেলাম না সঠিক সন্ধান ॥
অবতার আছে ছয় প্রকার বৈদিক শাস্ত্রে প্রমাণ তার
শক্তাকেশ লীলা পুরুষ গুণ যুগ মন্বন্তর
এই প্রমাণ ছাড়া করলে স্বীকার
বিশ্বের সবই ভগবান ॥
আশু কয় সুশান্ত মনে সব দিয়ে কৃষ্ণ চরণে
বেদের বাক্য করি ঐক্য থাকি সাধনে
জানি কৃষ্ণ বিনে এই ভুবনে
পরম পুরুষ নাই প্রমাণ ॥

(৮)
ভগবানকে পেতে আগে মানুষ পূজা কর
এই মানুষের মাঝে পাবি

www.pathagar.com

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ॥
অনাহারী ভিক্ষারী কেউ এলে তোর দুয়ারে
লাটি মেরে জুতা পিটা করিস তাহারে
পূজা করিস তুই যে দেবতারে
সেতো নয় দেবতার পর ॥
অন্ধ খঞ্জ পাগল বোবা মুচি মেথর ডোম
ভগবান সকলের মাঝে নহে বেশী কম
যেদিন সকলকে দেখিবি সম
পাবি তাহার কৃপা বর ॥
ক্ষুধার জ্বালায় মা বাবা তোর পথের ভিক্ষারী
মন্দিরে তুই পূজা করিস হয়ে পূজারি
দিলে দেবতার পায় নয়ন বারী
বৃথা যাবে জনম ভর ॥
সব দেবতা পিতার মাঝে মায়ে সকল দেবী
ভক্তি ভরে কররে পূজা সকলই পাবি
মিছে তীর্থ ধামে কেন যাবি
মাতা পিতার চরণ ধর ॥
আশু বলে হৃদ মন্দিরে যে দিয়েছে বাতি
মানুষ রূপে সেই ভগবান করিস তার আরতি
দেখবি রাই শ্যামের যুগল মূরতি
হৃদ মন্দিরে নিরন্তর ॥

(৯)
কালীপূজা খালি খালি করো কেন?
যে মায়ে বলেনা কথা বোঝেনা সন্তানের ব্যথা
নরের মুণ্ড গলায় গাথা এই তো তাহার মূর্তিখান ॥
সত্য যুগে সুরত রাজা করেছিল মায়ের পূজা
তাহাকে মা দিল সাজা ঘটালো অকাল মরণ
যে মায়ের নাই দয়া ক্ষমা কেমন সে দয়াময়ী মা
ঘরে তোমার জীবন্ত মা তোমার জন্য দিবে প্রাণ ॥
নিজের মাকে দিলেও ব্যথা নিজেই যেচে বলে কথা
ভুলে যায় তার সকল ব্যথা ভাবিয়া নিজের সন্তান
কালী মায়ের পূজারকালে মন্ত্র খোথাও ভুল পড়িলে
অসি ধরে কেটে ফেরে থাকেনা পর আপন জ্ঞান ॥
নাকি ব্রহ্মাময়ী কালী মাতা শুনে মনে লাগলো ব্যথা
নঃতস্য প্রতিমাস্তি কথা বেদের পাতায় লিখা কেন
ব্রহ্ম যদি হয় নিরাকার কেন তারে করলে সাকার

www.pathagar.com

বুঝলাম তোমার মাথায় বিকার দিতে হবে ইঞ্জেকসান ॥
আশু বলে জনম ভরে মায়ের পূজা যাবো করে
যদি মাতা কৃপা করে চিনায় মোর পিতা কোন জন
মুখে বলে হরি হরি জীবন সাগর দিতে পাড়ি
ঝরায়ে প্রেম নয়ন বারি
গাইবো বিশ্বপিতার গান ॥

(১০)
মা তোমার চরণ তলে এসে দাঁড়ালাম
ভালবেসে আমাকে কোলে তুলে নাও
কত পথ ঘুর ঘুরে পেয়েছি মা তোমারে
ক্লান্ত এ দেহ মনে শান্তি যোগাও ॥
তোমারও ছবি যখন মোর মনে জাগে
বলিতে পারি না মাগো কত ভালো লাগে
তোমাকে রেখে যখন যাই দূরে সরে
অজানা ব্যথা পেয়ে কাঁদি বারে বারে
তোমারও চরণ ভুলে ত্রিতাপে মরি জ্বলে
ভুলে যাই যে ভুলে সে
ভুল ভেঙ্গে দাও ॥
দুদিনের তরে মাগো এই ভবে আসা
ক্ষণিকের তরে মাগো কত ভালবাসা
ভেঙ্গে গেছে মিছে স্বপনের খেলা
ধীরে ধীরে ডুবে এলো জীবনের বেলা
তবো চরণ দুখানি ভবো পারের তরণী
দুর্গতি নাশিনী আসিয়া দাঁড়াও ॥
জীবনের দিনগুলি হারিয়েছি হেলায়
বিপদে পড়িয়া আমি ডাকি আজ অবেলায়
আশু বলে বিপদে বিপদ তারিনী মা
সকল অপরাধের করো তুমি ক্ষমা
আমি তো হারানো ছেলে কাঁদি আজ মা মা বলে
লহো মোরে কোলে তুলে
দুঃখ ঘুচাও ॥

(১১)
কোন পথে যাই স্রষ্ঠার কাছে বলো গুরু ত্বরা করি
বলো ত্বরা করি গুরু বলো ত্বরা করি
সাধন ভজন জানি নাকো
আমি বড় পাপাচারী ॥

www.pathagar.com

কারো সাধন গাছ তলাতে কারো পুজন পাঁচ তলাতে
কারো ভজন জপ মালাতে বিস্ময়ে সব হেরি
কেউবা নিয়ে ভিক্ষার ঝুলি ঘোরে বাড়ি বাড়ি
কেউবা আছে গভীর বনে বহুদিন সে অনাহারী ॥
কেউবা মাথা করি মুণ্ডন মাথার পিচে রেখ চৈতন
তিলক মালা করি ধারণ বরে হরি হরি
মাছ মাংস ডিম পেয়াজ রসুন সকল পরিহরি
নিবেদিত মহাপ্রসাদ পেয়ে আছে জীবন ধরি ॥
কারো মুখে লম্বা দাড়ি বাবরী চুলের বাহাদুরী
বেলের আচার মালা পরি বলে হরি হরি
লাল নিশানা ছোটা হাতে মতুয়া নাম ধরি
তারা ব্রহ্মচর্য পালন করে বাম ভাগে রাখিয়া নারী ॥
কেউবা মাটির মূর্তি গড়ে যতনে রেখে মন্দিরে
কেউবা ডাকে নিরাকারে শব্দ ব্রহ্ম ধরি
কেহ কর্মের মাঝে ডাকে কেহ কর্ম ছাড়ি
কার ভয়ে থমকে গেলাম
দাঁড়িয়ে রই পথ পরি ॥

(১২)
আল্লা হরি গড় বলিয়া লাঠালাঠি কি লাগিয়া
সন্তান মোরা বাংলা মার
এসো বাংলা মাকে শ্রদ্ধা জানাই
বারে বারে ॥
বাংলা মায়ের কোলে জন্ম শিখেছি বাংলা ভাষা
একই মায়ের দুগ্ধ পিয়ে সবাই মিটাই পিপাসা
মায়ের কাছে পেলাম ছন্দ গন্ধরাজ গোলাপের গন্ধ
ভাইয়ে ভাইয়ে করলে দ্বন্দ্ব
উঠবে মায়ের হাহাকার ॥
সর্বশাস্ত্রের একই কথা পিতা মোদের প্রেমময়
জন্মিলে প্রেম ভক্তিরতন তবেই পিতার কৃপা হয়
সেই প্রেমময় বহুনামে ব্যক্ত আছে ধরাধামে
কেউ হরি গড় আল্লা নামে
অশ্রু ঝরায় অনিবার ॥
একই বটবৃক্ষ ছায়ে ক্লান্তি দূর করি সবাই
এই সূর্য্যের আলো পেয়ে বাঁচিয়া আছি সবাই
মন্দির মসজিদ গীর্জার কাঝে এই নদীর জল বিরাজে
একই সকাল একই সাজে
গান করি বিশ্ব পিতার ॥

www.pathagar.com

একই মায়ের বক্ষপরে সকলে ফসল ফলাই
ধান পাট গম যব মশুরী তিল তিষি সরিষা রাই
উচ্চে আলু তোরমুজ বেল কামরাঙ্গা পেয়ারা নারকেল
আম কাঁঠাল সুপারি কদবেল
রহিলো হাজার হাজার ॥
আশু বলে মনুষত্ব ভুলিওনা মানুষ ভাই
এসো সবে এক সারিতে বাংলা মায়ের গুন গাই
মায়ের মুখে ফুটলে হাসি আমরা সবাই হবো খুশি
কেউ হবোনা পরবাসী
প্রাণের এ দাবী আমার ॥

(১৩)
একদল সাধক এসেছিল
ভবের খেলা সাঙ্গ করে
স্বধামে ফিরিয়ে গেল ॥
কৃষ্ণ দাস অশ্বিনী হিরামন দশরথ মৃত্যুঞ্জয় লোচন
লাভ করিয়া ভক্তি রতন সবাই ধন্য হলো
প্রেমের বাদাম উড়াইয়া বলে হরি বলো
তারা হরিচাঁদ বলে যার যার মতো রওনা হলো ॥
গোলক তারকা মহানন্দ বিশ্বনাথ নাটু ব্রজেন্দ্র
সকলেই ভজন বীরেন্দ্র আঁকিতে জল ছিল
ভক্তের ভক্তির কাছে হরি ধরা পড়ে গেল
তাই তো সফলা ডাঙ্গাতে বুঝি স্বয়ং হরিচাঁদ আসিলো ॥
মহা সাধক পিতা পুত্র ধরাকে করতে পবিত্র
রাখিয়া নির্মল চরিত্র হরিনাম বিলালো
হরিচাঁদ তাঁর দ্বাদশ আজ্ঞায় যাহা জানাইলো
ঠাকুর গুরুচাঁদ তাই আচরিয়া সকল জীবকে শিখাইলো ॥
পরম সাধু জগদানন্দ মনে রাখা প্রেমানন্দ
ছিল না কামনার গন্ধ এমন সাধক ছিল
কত অন্ধ খঞ্জ পাগল বোবার পুনর্জীবন দিল
জাগে মুখের কথায় ডুবা তরী বন্ধা নারীর সন্তান হলো ॥
কৃষ্ণ প্রেমে ছিল পাগল কেষ্ট ক্ষেপা গণেশ পাগল
ভাঙ্গতে মানুষের মনের গোল পাড় কোণাতে এলো
তাঁর সান্নিধ্য পেরো যারা সবাই ধন্য হলো
আজও কাঁদে হাজার নর নারী গণেশ নামে মেখে ধুলো ॥
আশু বলে শেষ আশা তাই সাধুর পায়ে মাতা ঠেকাই
জনম ভরে কুড়িয়ে বেড়াই সাধুর চরণ ধুলো
সাধু গুরু বৈষ্ণবের পায় এই নিবেদন রলো
যেন সাধুর চরণ ধুলি মেখে ঘুচে যায় বিষয় জঞ্জাল ॥

www.pathagar.com

(১৪)
যারা শাস্ত্রের ধার ধারে না ভগবানকে সম্মান দেয় না
তার আইন মেনে না চলে
আমি কেমন করে যাই বলো তাদের দলে ॥
দ্বাদশ আজ্ঞায় বলে গেছেন প্রেমের ঠাকুর হরিচাঁদ
ষড় রিপুর নিকট থেকে সবাই থাকিবে সাবধান
করবেনা অবৈধ আহার কামক্রোধ করো পরিহার
দেখি কীর্ত্তনাঙ্গ সভা মাঝার ধুমপানের আড্ডা চলে ॥
এ জগতে ভক্ত সাথে দিলাম কত তীর্থ যোগ
ভগবান থাক দেবতাকেও কেহ দেয়না মাছের ভোগ
মাছের ভোগে তুলসী দেয় তাইতো বড় ব্যাথা হিয়ায়
ব্যথার কথা জানাই কোথায় মুখে ভাষা না চলে ॥
গয়া কাশী শ্রীক্ষেত্র দারকা মথুরা বৃন্দাবন
মায়াপুর আঙ্গিনা পাব না কোথাও নাই মৎস্য ভোজন
খেলে হিংস্র পশুর খাদ্য তাতে হয় না চিত্ত শুদ্ধ
জীবে প্রেম শিখালো বুদ্ধ বিবেকানন্দও তাই বলে ॥
তুলসী ছাড় অন্যমালা যতই রাখুব ভক্তদল
মৃত্যুকালে তার বিছানায় রাখিতে হয় তুলসী ডাল
তিলক তুলসী ঘৃণা করে শাস্ত্রে অসুর বলে তারে
কৃষ্ণ প্রেম যার নাই অন্তরে পাষণ্ড সে ভুতলে ॥
আশু বলে সাধন ভজন কৃষ্ণ ছাড়া সবাই বাম
মৃত্যুকালে কর্ণমূলে শোনাইবে কৃষ্ণ নাম
সময় থাকতে এসো পথে কৃষ্ণ গুণ গাই এক সাথে
ভক্তি ফুলের মালা গেথে পরাই শ্রীকৃষ্ণের গলে ॥

(১৫)
নিজের ভাল চাওয়ার আগে পরের ভাল চা
তোর বিপদে তারে পাবি
তার বিপদে আগে যা ॥
পরের নিদ্রা আহার দেখে রেগে হস আগুন
মনে রাখিস জ্বালাইলে জ্বলতে হয় দ্বিগুণ
কোন জীবের ভাল চায় না শকুন
খায় যত মরা পঁচা ॥
উচিৎ কথা বললে শুনে মনে কষ্ট পাস
মিথ্যা বলে ঘটাতে চাস পরের সর্বনাশ
ও তুই পরের ঘরে বাস দিতে চাস
ভেঙ্গে নিজ ঘরের মাচা ॥

www.pathagar.com

পরের ভাল দেখিয়া যার মনটা হয় কাতর
জগতের সবাই কয় তারে পরশ্রী কাতর
ভবে কেউ তারে করে না আদর
হয় তার উচা নাক বুচা ॥
আশু বলে দেহ পেলি মানুষের মতন
পেলিনা সৎ গুরু কৃপা বৃথা তোর জীবন
পুনঃসদগুরুর ধরিয়া চরণ
সদাচারণ ভিক্ষা চা ॥

(১৬)
একঝাক পাখি এসেছিল
কালের ডাকে সাড়া দিয়ে
যার যার মত চলে গেল ॥
হরিবর আর মনোহর পাগল রাজেন বড় সরকার
বাড়াইয়া কবি গানের দর আগে আগে গেল
অসময় ঘনাবার আগে রসময় চলিলো
করে টপ্পায় মত্ত নকুন দত্ত বিত্ত বৈভব ফেলে গেল ॥
প্রেমিক কবি বিজয় সরকার ডুমদি গ্রামে জন্ম তাহার
গানে পাগল মন জয় সবার সেজন করেছিল
ভাটিয়ারি সুর সম্রাট উপাধি সে পেল
শেষে প্রেমের বাদাম তুলে দিয়ে স্বধামে ফিরিয়া গেল ॥
পাঁচালিতে বড় নিশি সবার মুকে আনতো হাসি
বীণা পাণি কণ্ঠে বসি ছন্দ সঞ্চারিলো
রশিক বাবুর সুর ঝংকারে মুগ্ধ হয় সকল
দীন অনাদী জ্ঞানের জাহাজ মায়া সাগর পাড়ি দিলো ॥
কবি রসরাজ তারক গোসাই মাতৃভক্ত তার জুড়ি নাই
মা মা বলে কেদে সদাই মায়ের দেখা পেল
লক্ষ্মীপাশা মায়ের বাড়ি স্মৃতি চিহ্ন রলো
যে মা নবগঙ্গা নদীর মাঝে হাতের শাখা দেখাইলো ॥

(১৭)
কর্ম ছাড়া ধর্ম হয় না শুন সাধু ভাই
যারা কর্ম পেলে ধর্ম খোজে
অভাবে পড়ে তারাই ॥
সারাদিন বললে হরিবোল তাতে বাড়ে গণ্ডগোল
শ্রবণ শক্তি নষ্ট হবে বাজাইওনা খোল
তোমার বাজাও যবে ঝাজ ডংকা ঢোল
দূরে যায় জ্ঞানী যারাই ॥
সাদা কাপড় পরার উপায় নাই বেশি ময়লা ধরে তাই

www.pathagar.com

পড় তোমরা রং করিয়া যতো সাধু ভাই
তোমাদের অঙ্গে ভোকসা গন্ধ সদাই
সাবানের তো পয়সা নাই ॥
জমিতে লাগাও দেখি ধান মুখে গাহ কৃষ্ণ গুণগান
নিজে খাবে দেশ বাচিবে তুষ্ট বগবান
তোমাদের কে দিয়েছে ভিক্ষা বিধান
আমি তাহার সন্ধান চাই ॥
ভবে কর্ম আছে যার সম্পদ বেশি আছে তার
কর্ম ছাড়া ঘুরে বেড়ায় অর্থ নাহি তার
তোমরা দেশের প্রধান বেকার
দেশটাকে দিলে গোল্লাই ॥

(১৮)
বৃন্দাবনারী শ্যাম এসো তুমি হৃদ মাঝারে
তুমি কৃপা সিন্ধু অনাথের বন্ধু
শ্যামল ও নটবরে ॥
বৃন্দাবনের পাখি ডাকিছে তোমায়
তোমার বাঁশি শুনে যমুনা উজায়
গাভী ছেড়ে বৎস্য ছেড়ে মৎস্য
ভস্ম মাখিয়া স্মরে ॥
অনাদির আদি তুমি শ্রী মধুসুদন
তোমারই কারণে এই বিশ্বভুবন
আমি বড় অভাজন জানি নাতো ভজন
পূজিবো দু'নয়ন নীরে ॥
শুনেছি সবাই বলে তুমি তো প্রভু
তোমাকে স্মরণ নিলে ভয় নাহি কভু
দীন আশু বলে ভাসি আখি জলে
রেখো প্রভু পদ নখরে ॥

(১৯)
বল বল বল সই কে বনে বাঁশি বাজালো
বাঁশরি সুরে মোর মন হরিলো ॥
বাঁশির জ্বালা আর প্রাণে সহেনা
তোদের কানে কি সই বাঁশি বাজে না
আমাকে উদাসী করে
সবই ভুলানো ॥
উজার বয়ে যায় যমুনার জল

www.pathagar.com

তৃর্ণ লতা নাহি খায় ও ধেনু সকল
বেণুতে ধেনুর মন
হারিয়া নিলো ৷৷
নিরজনে বসিয়া আশু শোনে সুর
অচেনা সে সুর লাগে কতই মধুর
কখনও নিশিখ রাতে
ঘুম ভাঙ্গালো ৷৷

(২০)
আমার দুঃখের কথা কেউ শোনে না
মনেই রয়ে যায়
ব্যথার ব্যথিত কেউ হলো না
সুন্দর দুনিয়ায় ৷৷
ভালবেশে হৃদয় মাঝে দিলাম যারে ঠাঁই
দুঃখের কথা বলতে গেলে বলে সময় নাই
বুকের ব্যথা চোখে ভাসাই
বসি নিরালায় ৷৷
মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে এসেছি এই ভবে
দুঃখের মাঝে বাকি জীবন এভাবেই কি যাবে
আর কত আমায় কাঁদাবে
ওগো দয়াময় ৷৷
আশু বলে বুঝলো না কেই কি ব্যথা অন্তরে
ব্যথার ব্যথিত তুমি হরি রইলে কত দূরে
নয়ন জলে গানের সুরে
ডাক আজ তোমায় ৷৷

৪. বিচার গান

মুর্শিদি বা ভাবগানের আসরে বিচার গানের উত্তরণ ঘটেছে। গুরু-শিষ্য, মারফত-শরিয়ত, নিরাকার-আকার, নারী-পুরুষ, সৃষ্টিতত্ত্ব, আহাদিয়াত নবুয়তি, রূপ-স্বরূপ, কাম-প্রেম ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় নিয়েই বিচার গানের আলোচনা। বিচার গানে মূলত মঞ্চে উপস্থিত দুই বয়াতির মাঝে প্রতিযোগিতামূলক গান। কেউ কেউ মনে করেন বিচারগানের আদিভূমি ফরিদপুর।

এই গানের জন্ম অর্ধ শতাব্দী আগে। মেছের শাহ (১২৪৭–১৩২৪ বঙ্গাব্দ) এই গানের গোড়াপত্তন করেন। লোকগবেষক খলিলুল্লাহ-দিল-দরাজ ফরিদপুরের বিচার গানের সময় কালকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন : ১২৮০ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দ প্রথমভাগ। এই ভাগের বিখ্যাত সাধকগণ হলেন, মেছের শাহ, তাহের শাহ, কিতাবদী শাহ, নৈমদ্দি ফকির, পাঁচু ফকির, পাইলন ফকির, আজিম শাহ, যোগেশ সরকার,

www.pathagar.com

লক্ষীকান্ত সেন, কুঞ্জুদাস, মুন্সী বাছের, কসিমদ্দিন (কোছে কাওড়া); গহের শাহ, ক্ষ্যাপা-ক্ষেপী। দ্বিতীয় ভাগ ১৩৩০ থেকে ১৩৬০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। এই ভাগে রয়েছেন আহম্মদ ফকির; জসিমদ্দিন, তাজদ্দিন ফকির, আইনদ্দিন, ছাদেক, কমলাবালা বৈষ্ণবী, মোসলেম ও ছাদেক ফকির। তৃতীয় ভাগের সময়কাল ১৩৬০ থেকে ১৩৯০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ের বিখ্যাত সাধক আব্দুল হালিম বয়াতি। তাঁর প্রতিভা ছিল আকাশ ছোঁয়া। এরপর আনাল মিয়া, দলিল উদ্দিন, জমির আলী বয়াতি, আকমত, চাঁনমিয়া, জলিল, জালাল, হাজেরা বিবি, মাখন, আলাউদ্দিন, সুফিয়া, অনিতা, কুটি মনসুর, ইয়াদ আলী, খোরশেদ ও আলেয়া বিবি।

একটি বিচার গানের উদ্ধৃতি

জ্ঞানের আয়না ভক্তির পায়রা/মুর্শিদ রূপের সুরাত দেখ
স্বরূপে রূপ দেখতে চাইলে ধ্যানের ঘরে কর লক্ষ।
নিরব নিটল ভাবে/নির্জনেতে বসে তবে
গোপন দরজা যে খুলিবে/সেই মানুষের করণ শিখ।।
আপন দেল কর সাদা/কেন ভাব জুদাজুদা
যথা মুর্শিদ তথা খোদা/সেই রূপেতে ডুবে থাকো।
পরমের নাই আকার সাকার/জীব হইতে হইলেন প্রচার
হালিমের নাই তত্ত্ববিচার/মন তুমি কেন উল্টা ডাকো।।

৫. গাজির গান

'গাজির গান' ফরিদপুর জেলার প্রতিনিধিত্বমূলক লোকসংগীত হিসেবে চিহ্নিত। গাজি পির এতদঞ্চলের অন্যতম লৌকিক দেবতা। এঁকে জিন্দা পির বা গাজিসাহেব বলেও অভিহিত করা হয়। বাঙালি হিন্দু সমাজে দক্ষিণা রায় এবং বাঙালি মুসলমান সমাজে গাজিপির মূলত অভিন্ন। চাষি, জেলে, বিশেষ করে বনজীবীরা এঁকে মান্য করেন।

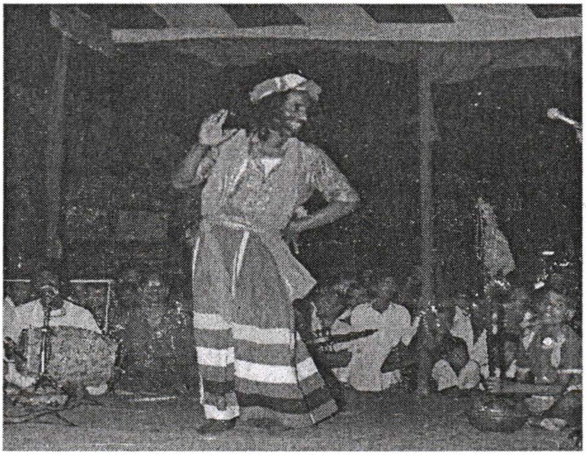

গাজির গানের আসর

www.pathagar.com

গাজির বন্দনা গানের নমুনা

এসো এসো দয়াল গাজি, এসো এসো এই আসরে গো
একবার চাও ফিরে।
প্রথমে বন্দনা করি প্রভু নিরঞ্জন রে দয়াল গাজি,
দ্বিতীয় বন্ধনা করি নবীজীর চরণ রে দয়াল গাজি,
উত্তরে বন্ধনা করি হিমালয় পর্বত রে দয়াল গাজি
যার হাওয়ায় গলে ওই দেশের পাথর রে দয়াল গাজি। [...]

৬. জারিগান

মুসলমান সম্প্রদায়ের মহররমের কাহিনিকে কেন্দ্র করে জারিগান রচিত ও পরিবেশিত হয়। জারি গানের অর্থ ক্রন্দন বিলাপ। এক সময় ফরিদপুর জেলায় ব্যাপকভাবে জারি গানের প্রচলন ছিল। এই অঞ্চলের বিখ্যাত কয়েকজন জারিগানের বয়াতি হলেন; মেঘু বয়াতি (গোয়ালের টিলা), ডা. হানিফা (বাখুণ্ডা), হাকিম চান্দ (কালিশঙ্করপুর), মেহের চান্দ (কালিশঙ্করপুর), তমিজদ্দিন (ভাঙ্গা), হানিফ বয়াতি (উজান চর), এনাতুল্লা (সদরপুর), গনি বয়াতি (সদরপুর), মঙ্গল বয়াতি (টেপাখোলা), জমীর আলী (সদরপুর), নিশিকান্ত (বাঁশতলা), ওয়াহেদ আলী (গোয়ালের টিলা), ছবেদ আলী (গোয়ালের টিলা), বদরুদ্দিন (গোয়ালের টিলা) ইয়াছিন বিশ্বাস, আমজেদ, নাসির শাহ।

দুল দুল ঘোড়ারে তুমি কি জবাব দাও আমারে
চতুর্দিকে ঘিরারে কাফের কি হালে রাখলা মোরে
বুকের উপর বইসা সীমাররে তুমি হলকমে না দাও ভর
তোর সমান আর গুনাগার নাইরে এই দুনিয়ার পর। [...]

সংগৃহীত জারিগান

হাসানের বিষপান জারি

প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে জারি করলাম শুরু
অনাথের নাথ গো আল্লাহর দোয়া কর গুরু
আহা গুরু কল্পতরু তুই সংসারের সার
আমি ভরিয়াছি অচল ভরা কর আমায় পার।
পার কর পার কর গুরু পার করিয়া লও
তুমি যদি না কর পার মা বরকতেরে কও।
নবির বেটি বেহেশতের খুটি নেয়ামতের গোলা
আমার আসরেতে ভর কর মা বরকত চঞ্চলা।
আমার আসর ছেড়ে যদি অন্য কোথাও যাও
দোহাই দোহাই তোমার দুই ইমামের মাথা খাও

www.pathagar.com

তবে এসো মাতা সরস্বতী কণ্ঠে কর ভার
আমি বসিতে আসন দিলাম রসনার উপর।
আমার কণ্ঠ ছেড়ে যদি অন্য কোথাও যাও
দোহাই দোহাই তোমার বংশের মাথা খাও।
এই সমস্ত বলতে আমার হবে অনেক দেরি
হাসানের বিষ পান সভায় প্রকাশ করি।
একদিন মিরাজে গেলেন দীনের পয়গম্বর
আমার নবিজীকে নিয়া গেল মোস্তাহার উপর।
সেখানে যাইয়া নবি করেন তো নজর
লাল সবুজ দুই রংয়ের দেখিলেন দুই ঘর
জিব্রাঈলের কাছে পুঁছে সে হাল
ইহার একখান সবুজ কেন আর একখান লাল।
তবে এই কথা শোনেন যদি আপে পাক জাত
বলে দোস্তকে শুনাও জিব্রাঈল ঘরের হকিকত।
তবে খোদার হুকুম পেয়ে বলেন জিব্রাঈল
হাসান হোসেন করেন মহরম মঞ্জিল
জহরেতে সবুজ বর্ণ কহরেতে লাল
দুনিয়াতে মারা যাবে ফাতেমার দুলাল।
জহরে কহরে মারা যাবে দোন ভাই
তাহার নিশানা হেথা রাখিয়াছে সাই।
মাবিয়ার ঘরে পয়দা হবে দুরন্ত জালেম
পাপী না মানিবে কোরান কিতাব না মানিবে আলেম
সেই হতে নবি বংশ হইবে বিনাশ
নবিজি ছাড়িলেন তখন শোকের নিঃশ্বাস।
একথা শুনিয়া নবি ঘরে চলে এলো
মনের বেদনা নবি কাউকে না বলিল।
একদিন মরণের কথা উঠিল জাগিয়া
ডাক দিয়া বলেন শুন ইয়ার মাবিয়া
তোমার ঘরে পয়দা হবে দুরন্ত জালেম
না মানিবে কেতাব কোরান না মানিবে আলেম
সেই হতে নবি বংশ হইবে বিনাশ।
একথা শুনিয়া মাবিয়া হইলেন তরাশ
ডাক দিয়া বলেন মাবিয়া নবিজির তরে
বিবাহ না করিব হুজুর দুনিয়ার মাঝারে
কেমনে পয়দা হবে জালেম আমার ঘরে।
নবি বলেন ও মাবিয়া ও কথা বল না
খোদার কলম রদ কভু হবে না।

www.pathagar.com

এইভাবে অনেক দিন গুজরিয়া যায়
মদিনা ছাড়িয়া মাবিয়া দামেস্কেতে রয়
একদিন হযরত মাবিয়া শুয়ে ছিল ঘরে
প্রসাব করিয়া যখ কুলুখ ধরিল
বিষাক্ত জিনিস কোমল অঙ্গেতে লাগিল।
ছটফট করিয়া মাবিয়া জ্বালায় অস্থির হইয়া
ওঝা বৈদ্য হাজার হাজার আনিল ডাকিয়া
কেহ দেয় জলপড়া কেহ দেয় ফুঁক
হলুদ পড়া করলো সাড়া কিছুতে নাই সুখ
পত্র দিয়া হজরত মাবিয়া পাঠায় মদিনায়
পত্র পেয়ে দীনের নবি দামেস্কেতে যায়
দোয়া পড়ে নবি আমার ফুঁক দিতে গেল
পিছন থেকে জিব্রাঈল এসে কহিতে লাগিল
ফুঁক দিওনা দীনের নবি হবে সর্বনাশ
মাবিয়ার এক ঔষধ আছে স্ত্রী সহবাস।
এলাহির হুকুম যাহা কহিলাম আমি
এখন তোমার দেলে চিন্তা করে দেখ তুমি।
এ কথা নবি আমার যখন শুনিল
ডাক দিয়া নবি আমার কহিতে লাগিল:
ধন্বন্তরী ঔষধ আছে আমি দিছি কইয়ে
এ ব্যাধির ঔষধ তোমার করতে হবে বিয়ে
তখন দায় ঠেকিয়া করে বিয়ে পালে একাদশী
মেয়ের বয়স কিন্তু বেশি না সত্তর কিংবা আশি।
বুড়ির সনে মাবিয়ার মিলন হইল
পিতার মস্তক ছেড়ে এজিদ মায়ের গর্ভে গেল।
ও বুড়ির চেহারা ফিরিল যৌবন আসিল
গর্ভের ভাব দিল দেখা
ও তার চক্ষের চাহনি খঞ্জন নয়নি
ভুরুদ্বয়ে কালরেখা।
দ্বিতীয় মাসেতে মাবিয়া জানিলে সুকেতে সদায় থাকে
তৃতীয় মাসেতে না পারে খাইতে
বমি ওঠে শুধু মুখে।
চতুর্থ মাসেতে কোমল অঙ্গেতে কনক বর্ণের পড়ে রেখা
পঞ্চম মাসেতে আলস্য অঙ্গেতে
থাকিতে ভাল লাগে একা।
ষষ্ঠ মাসেতে মায়ের সঙ্গেতে
এজিদা বলেন কথা

www.pathagar.com

সপ্তম মাসেতে না পারে বসিতে
মৃদু মৃদু ওঠে ব্যথা।
স্বাদ খেয়ে মহিষী হইলেন বড় খুশি
পূর্ণ শশী যেন হাসে
অষ্টম মাসেতে সখীগণের সঙ্গেতে
সুখের সাগরে নারী ভাসে।
ও তার যুগল পয়োধর হয়ে এল ভার
সুধার ভারে পড়ে হেলে
নবম মাসেতে না পারে চলিতে
ধীরে ধীরে পা ফেলে।
দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হইল যেইদিন
স্বর্গ ছেড়ে দিল ইন্দ্র
এজিদ প্রসব হইল, ভূমিতে পড়িল
ঠিক যেমন পূর্ণিমার চন্দ্র।
ও তার চেহারা দেখিয়া মোহিতে মাতিয়া
বাদশা মাবিয়া গেল ভুলিয়া
ও তারে চাঁদ তারা বলিয়া কোলে লয় তুলিয়া
প্রেমের তরঙ্গে ঢেউ খেলে।
দিনে দিনে এজিদ পাপী হইল সেয়ানা
তার পরে শোনেন সবে অপূর্ব ঘটনা
নামে শাম শহরে বাড়ি
তাহার এক স্ত্রী ছিল পরমা সুন্দরী
ছুরাত জামাল কন্যার অখি ছুরত দেখে
সাধ করিয়া বড় ঈমাম তারে করিলেন নিকে।
সেই নিকের কারণে বাঁধল রণ এজিদের সনে
সপ্তদিন লড়ে এজিদ ভঙ্গ দিল রণে।
ডাক দিয়ে বলে কথা আকবরের কাছে
দেখনা দুই ঈমামের মৌরাত আছ কিনা আছে
তখন কেতাব পড়ে বলে এজিদের তরে
দেখি দুই ঈমামের মৌরাত আছে জহরে কহরে।
জহরে হোসেনের মৃত্যু জানাচ্ছি তোমায়
কহরে হাসানের মৃত্যু দাস্ত কারবালায়
এই কথা যখনেতে এজিদ কর্ণেতে শুনিল
ডাকিয়া মারোয়ানকে তখন কহিতে লাগিল
বিষ দিয়া যদি মারিতে পার ইমাম হাসানেরে
নগদে দশ হাজার টাকা গুণে দিলাম তোমারে
ইহা শুনে মারোয়ান পাপী ধীরে ধীরে যায়

www.pathagar.com

কতদিন উদয় হল শহর মদিনায়।
পাহাড় পর্বতে মারোয়ান ঘুরিয়া বেড়ায়
এক মকরজোনা বুড়ির সনে তাহার দেখা হয়
তখন ডাক দিয়া বলে মারোয়ান কুটনা বুড়ির তরে
বিষ দিয়া মারতে পার যদি ইমাম হাসানেরে
নগদে দশ হাজার টাকা গুণে দেব তোরে।
ধন দৌলত দিব কত সোনা অলঙ্কার
পরিণামে পাবি বুড়ি মদিনার ভার
মকরজোনা বুড়ি বলে আমি এত মকর ধরি
এক শয্যার নারী আমি সাত শয্যা করি।
আকাশের চন্দ্র সূর্য পারি খসাইতে
সাত সমুদ্রের জল পারি রাখিতে ঘটিতে
এক জনার বৌকে নিয়ে অন্য জনকে দেই
তুই মোরে চিনলিনা ময়মুনা কুটনী এই।
সাত তোলা জহর যদি আমায় পার দিতে
মদিনার বাতি আমি পারি নিভাইতে
তখন সাত তোলা জহর দিল বুড়ির যে হাতে
বুড়ি ইমামকে মারিতে চলে মদিনার পথে।
মদিনাতে যাইয়া বুড়ি কপার গোণা গোণে
ডাক দিয়া বলে কথা কদবানুর সনে
কি কর জায়দা বিবি বসিয়া মহরে
চেয়ে দেখ আগুন তোমার লেগেছে কপালে।
সাধ করিয়া বড় ইমাম তেমার করছে বিয়ে
তোমায় তুয়ে ইমাম সাহেব করবে দোসর নিকে
তবে সতিন কাঁটা বিষম লেঠা কাঁটাবড়ি গাছ
দুই সতীনে ঝগড়া করেন নারদ লাগে পাছ।
করে চুলাচুলি কিলাকিলি তার কি পরাণ বাঁচে
বসে বসে নারদ বেটা হাততালি দিয়ে নাচে
সতীন কাঁটা বিষম লেঠা আমি ভাল জানি
আমার এক সতীন ছিল দুপুরে ডাকিনি।
ছলে ছুতায় গোল বাঁধায় সে যেই সেই কথা নিয়ে
আমার স্বামীর হুজুর মার খাওয়াত মিথ্যা কথা কয়ে
টিকিতে না পারিতাম আমি সতীরে জ্বালায়
কত বন জঙ্গল ঘুরতাম আর করতাম হায় হায়।
শেষে দয়া করে এক ফকিরে ঔষধ দিলে মোলে
কৌশল করে খাওয়ায়েছিলাম আমার স্বামীর তরে
সেই হইতে পিরীতি হইল তোমার খালুর সাথে

www.pathagar.com

স্বামী দিবারাত্রী শুয়ে থাকত আমার দোতালাতে।
আমি সুখে নিদ্রা যাইতাম সে ঘুমাইত নয়
আবের পাংখা হাতে নিয়া বাতাস দিত গায়
আমি খেতাম গোস্ত নিজে খেত ঝুটা
হাজার মন্দ বললে তাহার কাছে লাগত মিঠা।
হাটে যেত কিনে আনতো নূতন নূতন সাজ
মাসে মাসে কিনে দিত শিলামণির কাঁচ
দিত পায়ে পাতামল কোমরে শিকল নাকেতে ফুরফুরি
আমায় মাসে মাসে কিনে দিত বেনারসী শাড়ি।
দিত গলেতে গজমতি হার কপালেতে টিকে
কত বুড়া মানুষ পাগল হইত আমার ছুরত দেখে
আমি তোর খালা হই মা তুমি বোন ঝি
দরদের খাতিরে মাগো বলতে এসেছি।
খুছমুছ করো না মা ঔষধ নারায়ণ
ইহার এক রত্তি খাওয়াইলে ফেরে পাগলা হাতির মন
কাটা গাছেতে দিলে তাহে লাগে জোড়া
জায়েদা বলে খালা দাও দেখি থোরা।
জায়েদা বলে খালা তোমায় বলিতেছি
তোমার কাছে ঔষধ আছে তাহার মূল্য হবে কি?
বুড়ি বলে ও জায়েদা তুই বললি কি
তুই আমার ঔষধ নিবি তার আবার দাম কি?
এক রত্তি এক মহরে বেচি সব লোকের ঠাঁই
মিথ্যা যদি বলি আমি স্বামীর মাথা খাই
জায়েদা বলে মাসির কথা বড় খাটি
আমার কাছে আছে মহরের গাঠি।
তখন জহর দিয়ে মহর নিল মকরজোনা বুড়ি
খেলা ছেড়ে সাধের ইমাম ফিরে এল বাড়ি
ছোট ইমাম শিকার দিল ছোট বিবির ঠাঁই
বড় ইমাম বলে বিবি পানি দাও না খাই।
কিঞ্চিত পূর্বে সেই বিষ পানিতে মিশাইয়া
রেখেছিল ইমামের জন্য পিয়ালা পুরিয়া
যখনেতে বড় ইমাম পানি খেতে চাইল
বিষাক্ত পানি এনে ইমাম হাতে দিল।
যকনেতে পানি ইমাম হাতে নিল
আমার আল্লাহর নাম ভুলিয়া ইমাম পানি পিলাইল
তখনে গগণে ভাইরে দুপুরের বেলা

www.pathagar.com

আমার ইমাম জন্যে রুজু হইল জহরের পেয়ালা।
ও বিষ খেতে ধরল ছাতি ঘোর হল দুই আঁখি
জমিনে লুটায় যেন তীর বিধে পাখি
কি খেলাম টের না পেলাম না পেলাম উদ্দিশ
পানি খেতে চাইলাম বিবি এনে দিল বিষ।
তবে হাসান বলে কাসেমেরে তুমি এসো আমার কাছে
যেয়ে দেখ হোসেন ভাই মোর কোথা রহিয়াছে
ইহা শুনে কাসেম আলী দৌড়ে গেল হোসেনের ঠাঁই
কেঁদে কেঁদে বলে কাসেম হোসেন আলীর ঠাঁই।
চল চল চাচাজান বাবাজানের কি দশা হইয়াছে
ইহা শুনে হোসেন আলী তাড়াতাড়ি যায়
যেয়ে গলায় বস্ত্র বেঁধে পড়ে বড় ভাইর পায়।
এই দাদা শিকার খেলে ফিরে এলাম বাড়ি
কোনখানে কি খাইয়াছ বুঝিতে না পারি
বিবি দিল বিষ এনে ইমাম শুনতে পেয়ে
কাটিতে চলল জায়েদাকে তলোয়ার খুলিয়ে।
তলোয়ার খুলিয়ে যখন করিবে ওয়ার
হাসান বলে মারিসনে ভাই দোহাই তোর আল্লাহর
বহুদিন এজিদের মনে ছিল আক্রোশ
ছলনা করে খাওয়াইছে বিষ বিবির নাইকো দোষ।
মৃত্যুকালে একটি কথা বলে যাই তোমায়
কাসেম আলীর কাছে দিবা সখিনার বিয়ে
বলে গেলাম এই কথা মাথায় কিড়া দিয়ে
নবির কলেমা আমায় পড়াও তিনবার
মৃত্যুকালে বলি আমি আল্লাহু আকবর।
আমার হাসানের জান পৌছিল যদি জান্নাত মাঝার
ভাই কান্দে বন্ধু কান্দে আরববাসী কান্দে সব
পিঞ্জিরাতে পাখী নাই তার কে দিবে জওয়াব।
আল্লাহ আল্লাহ বল ভাই যত মোমিনগণে
আমার হাসানের জান পৌছিল জান্নাত বাগানে।

ইসমাঈলের কোরবানির জারি

নীরব হইয়া থাকেন আমার বন্ধু বান্ধবগণ
ইসমাঈলের কোরবানির জারি করিতেছি বর্ণন।
এইভাবে অনেক দিন গুজরিয়া যায়
দেখেন কি তামাশা পয়দা করিছেন খোদায়।
একদিন খলিলুল্লাহ দেখিলেন স্বপনেতে

www.pathagar.com

আদেশ করেন খোদা তাঁরে কোরবানি করিতে।
তবে নবি খলিলুল্লাহ ফজরে উঠিয়া
একশত উট দিলেন তিনি কোরবানি করিয়া।
দ্বিতীয় রাত্রে আবার দেখিলেন স্বপনেতে
আদেশ করেন খোদা তাঁরে কোরবানি করিতে।
আবার দ্বিতীয় রাত্রে খলিল ফজরে উঠিয়া
একশত উট দিল তিনি কোরবানি করিয়া।
তৃতীয় রাত্রোবার দেখিলেন স্বপনেতে
আদেশ করেন খোদা তাঁরে কোরবানি করিতে।
যে তোমার অধিকতর ভালোবাসার হয়
হাসিয়া কোরবানি তারে কর তাহায়।
তবে নবির দেল বিছে হইলো উদয়
আমার ভালোবাসার বেটা ভিন্ন অন্য কেহ নয়।
জেকেরের খুন আমার ইসমাঈল আছিল
কোরবানী করিতে আল্লাহ আমাকে বলিল।
এতেক ভাবিল যদি নবি দোজাহানে
ফজরে উঠিয়া চলে বেবাহা ময়দানে।
জামা জোড়া নিল খলিল বগলে দাবিয়া
বড় এক ছুড়ি নিল আস্তিনে ভরিয়া।
বিসমিল্লাহ বলিয়া খলি চলিল রাহেতে
বসিয়া হাজেরা ছিল যেখানেতে।
দূর হতে বিবিজান নজর করিল
আপনার পতি বলে মালুম হইল।
বহুদিন পরে পেলাম পতিরে আমার
জান মন দিয়া করব খেদমত তাহার।
বহুদিন হইল মোর পতির খেদমত
আমা হইতে না হইলে সকল অকারণ।
গুনাহার সাগরে আমি কত দিন রব
পতির খেদমত বিনে বেহেস্ত নাহি পাবো।
এতেক বলিয়া বিবি পানি উঠাইয়া
লোটা হাতে এন্তেজারে দাঁড়ালো গিয়া
ইতোমধ্যে খলিলুল্লাহ পিয়ারা খোদার
পৌছিল ভাসিয়া যদি উটের ছওয়ার।
দেখিয়া হাজেরা বিবি বলেন পতিরে
একবার নেমে এসো পতি জমিনের উপরে।
বড় এক পাথর বিবি আনি উঠাইয়া
নবিজির কদম নিচে দিলেন রাখিয়া।

www.pathagar.com

এই পাথরের উপরে রাখিবেন কদম
পাও ধোয়াইব আমি নাপাক অধম।
একদিন অভাগিনীরে বনবাসে দিয়ে
মায়া কাটাইয়া ছিলে আমাকে ভুলিয়ে।
তবে নবি উট হইতে উতাড়িয়া গেল
পাথরের উপরে দুই কদ রাখিল।
অজু দেলাইল বিবি আপনার হাতে
পাও মুছাইয়া দিল ছেরের চুলেতে।
বড়ই খেদমত বিবি করিতে লাগিল
সোনার ইসমাঈলকে কোলে নিয়ে দাঁড়াইয়া রহিল।
বলে এই দোয়া দেবে পতি হুজুরে আমার
হাসরেতে পাই যেন কদম তোমার।
তুমি না থাকিলে রাজি কিছুই না হবে
আমার এবাদত নেক কাম সকল ভেসে যাবে।
নায়েব করিল জান পতি সরকার
জান মন দিয়া কর খেদমত তাহার।
পতির পায়ের নিচে জান্নাত জানিবে
নাখোস করিলে নারী দোযকি হইবে।
পতির গায়েতে যদি পঁচা ঘাও থাকে
জিহ্বা হতে চাটিয়অ নারী ছাপ করিবে তাতে।
তবু না স্বামীর হক আদায় হইবে
যে স্বামীর চরণ দোলতে বেহেস্ত হইবে।
নছিহতের কথা আমার রইল এখন
কোরবানির কথা আবার শোনেন দিয়া মন।
সেই দিন খলিলুল্লাহ বগল হইতে
জামা তুলে বিবি জানের হাতে।
সোনার ইসমাঈলের অঙ্গে তাহা পড়াইয়া দিল
তবে নবি খলিলুল্লাহ বলিতে লাগিল
দাওয়াত খাইতে যাবো বিবি, ইসমাঈলকে নিয়ে সাথে
এলাহি ভাবিয়া তুমি থাক এখানেতে
শুনিয়া হাজেরা বিবি বলেন তখন
দাওয়াত খেতে যাবেন আপনি কে করে বারণ।
আপনার বেটা নিয়ে জাইবেন আপনি
কোলে করে রাখ আমার এই জাদুমণি
নয়নে নয়নে রেখ নয়নের তারা
ঘরে মানিক আমার জানের পেয়ারা।
জান মেরা চলে গেল তোমার যে সাথে

www.pathagar.com

খালি ঘরে পরে রইনু এই জমিনেতে
দেখে দেখে কাছে রেখ থেক হুশিয়ার
সোপর্দ করিনু বাছা রাহেতে আল্লাহর
এতেক বলিয়া বিবির থামিল জবান
নবি ইসমাঈলকে নিয়ে চলে ভেবে সোবাহান।
ইসমাঈলকে কোলে নিয়ে চলিল রাহেতে
শয়তান এসে বলতে লাগল বিবির কাছেতে
শোন বিবি কহি আমি দুঃখের কাহিনি
সোনার ইসমাঈলকে নিয়ে যায় করিতে কোরবানি।
কোরবানি করিয়া দিবে রাহেতে আল্লাহর
মা বেটা দেখা শোনা হবে না আর
জনমের মতো কোলের ছেলে করিলি বিদায়
শুনিয়া হাজেরা বলে ওরে মালাউন
বাপ হয়ে বেটা কেবা করিয়াছে খুন
তবে যদি এলাহির হুকুম হইল
আল্লাহর রাহে যদি মেরা বেটা মারা গেল
এর চেয়ে কিবা আমার নছিব হইবে
এলাহি আমার বেটা কবুল করিবে
যার বেটা সেই নিচে নাম হবে মোর
তুই কেন দাগা দিতে এলিরে কুফর
লান্নতী শয়তানরে তুই যা অন্ন দিকে
শুনিয়া শয়তান পাজি সেখা হইতে ভাগে।
শরম পাইয়া শয়তান যায় পালাইয়া
ইসমাঈলের কাছে কথা কহে বুঝাইয়া
শোনরে ইসমাঈল দুঃখের কাহিনি
তোর বাবা নিয়া যাচ্ছে তোরে করিতে কোরবানি।
কোরবানি করিয়া দেবে রাহেতে আল্লাহর
মা বেটা দেখাশোনা হইবে না আর।
দেখতোর বাবার ঐ আস্তিন ভিতর
বড় এক ছুড়ি এনেছে নামেতে খঞ্জর।
ভালো তো যদি চাও তবে পালাও না এবার
এই বেলা ভেগে যা তোর মাতা যেথায়
শুনিয়া ইসমাঈল বলে ওরে মালাউন
বাপ হয়ে বেটা কেবা করিয়াছে খুন।
তবে যদি এলাহির হুকুম হইল
আল্লাহর রাহেতে যদি মোর জান গেল
এর চেয়ে কিবা আমার নছিব হইবে

www.pathagar.com

এলাহি আমার গোস্ত কবুল করিবে।
দুনিয়াতে জন্ম ধারণ করেছি যেদিন
আজ মরি কি কাল মরি মরব একদিন
না হোক আমাকে কেন এলে দাগা দিতে
লানতি শয়তানরে তুই বুঝিলাম ভবেতে
দুর হয়ে যারে শয়তান সম্মুখ থাকিয়া
লাহাওলা পরেন নবি এলাহি ভাবিয়া।
তার পরে ইসমাঈল বলেন বাপেরে
কোথায় নিয়ে যাও বাবাজান বলনা আমারে।
দোহাই আল্লাহ বাবাজান বলনা আমায়
কোরবানি করিবার জন্য কি এনেছ হেথায়?
তবে কেন কর দেরি ওগো বাবাজান
আল্লাহর রাহেতে আমায় করনা কোরবান।
দেখনা শয়তান পাজি পাছে আমার লাগা
বিলম্ব হইলে পরে দিতে পারে দাগা।
আল্লাহর রাহেতে কাজ আগে করা চাই
এথা সেথা গুনাহ হইতে পাইবে রেহাই।
তবে কেন কর দেরি ছুড়ি দেহ গলে
এইখানে স্মরণ করিলাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে।
আমার হাত পা রশি দিয়া বান্ধিয়া লইবে
কি জানি পড়িলে খুন আপনার কাপড়ে লাগিবে
আমার গায়ো রক্ত যদি লাগে আপনার গায়
গুনাহাগার হবে আমি হাশর বেলায়।
মহাপাপী হব বাবাজান বিচারে তখন
আর এক কথা বলি বাবাজান শুনেন দিয়া মন
আমার গায়ের জামায় রক্ত মাখাইয়া
আমার মা দুঃখীনির কাছে বাবাজান দিও পৌঁছাইয়া
কেননা জননী আমার হইবে তাপিনী
আমার বদলে জামা দেখিবেন তিনি।
কেননা মায়ের বেটা ইসমাঈল আছিনু
জনমের মত তাকে ছাড়িয়া জাইনু।
যখন শুনিবে মাতা আমার মৃত্যুর কথা
পাষাণে পড়িয়া তখন মরিবেন মাতা
দুনিয়াতে মৃত্যু আমার তাতে নাইরে দুঃখ
মরণ সময়ে না দেখিলাম মা দুঃখিনীর মুখ
বইল বইল সংবাদ বইল বাবজান
মা দুঃখিনীর আগে

www.pathagar.com

তোমার সোনার ইসমাঈলকে খাইছে বনের বাঘে
এতেক বলিয়া আমার থামিল জবান
একবার আললাহর রাহেতে আমায় করগো কোরবান
তবে নবি বগল হইতে ছুড়ি নিকালিয়া
হাত পা রশি দিয়া বাঁধিল কষিয়া
বিসমিল্লাহ বলিয়া তখন ছুড়িকে ধরিল
আল্লাহ আকবর বলে ছুড়ি চালাইল।
ছুড়িকে মানা করিল আপে পরোয়ার
কেট না কেট না ছুড়ি আদেশ আমার
খোদার হুকুম যখন ছুড়ি শুনিল
খোদার হুকুম শুনে ছুড়ির ধার মুছে গেল।
যতবার চালায় ছুড়ি ইসমাঈলের গলায়
ছুড়িতে না কাটে গলা পিছলিয়া যায়
এই হাল নবিজান যখনে দেখিল
বার বার ছুড়ির ধার পরীক্ষা করিল
পরীক্ষা করিয়া ছুড়ি চালায় বারে বার
আমার এলাহির নিষেধ আছে কাটতে পারে
সাধ্য আছে কার।
এই হাল নবিজান যখনে দেখিল
হাত হইতে তিক্ষ্ণ অস্ত্র দূরে ফেলে দিল।
পাথর কাটিয়া অমনি দুইভাগ হইল
খোদার হুকুমে ছুড়ির জবান খুলিল
জবান খুলিয়া বলে নবিজির তরে
অনর্থক রাগ তুমি করিলে মোর উপরে
কোরবার করিতে আল্লাহ বলিছেন একবার
কেটনা কেটনা আমায় বলেছেন সত্তর বার।
কোরবানি করিতে নিষেধ করেছেন পরোয়ার
আমি তাহার হুকুম রদ করে কি হব গুনাহগার।
এই কথা যখনেতে ছুড়ি বলিল
এমন সময় খোদার জিবরাঈল আসিয়া পৌঁছিল
নবিজির কাছে এসে সালাম জানায়
ওয়ালাইকুম বলে নবি করিলেন আদায়
জিবরাঈল বলিছে নবি হইওনা আকুল
কোরবানি করিতে তোমার হইয়া গেছে ভুল।
কাপড় দিয়া দুই চক্ষু বান্ধিয়া লইবে
এলাহির কুদরতে তোমার কোরবানি হইবে।
হবে নবি পাগড়ি হইতে কাপড় লইয়া

www.pathagar.com

আপনার নয়ন বাঁধে মজবুত করিয়া
যখনে বাঁধিল কাপড় আপনার নয়নে
জিবরাইল ইসমাঈলকে সরাইয়া রেখে দেয় পিছনে
বেহেস্ত হইতে দুম্বা ধরে নবিজীর সামনে
জিবরাঈল বলেছে এবার ছুড়ি ধর জোরে
তোমার কোরবানি হইয়া যাবে আল্লাজীর মেহেরে।
এই কথা নবিজী যখন শুনিল
বিসমিল্লাহ বলে নবি ছুড়িকে ধরিল
আল্লাহু আকবর বরে জোরে চালাইল
নয়ন খুলিয়া দেখে নবি আল্লাহর কুদরত
জবাই হইল দুম্বা ইসমাঈল সালামত।
এই হাল নবিজান যখন দেখিল
বাছা বাছা বলে নবি কোলে তুলে নিল।
দরুদ ভেজেন নবি আল্লাহর দরগায়
তোমার মহিমা মাবুদ বোঝা নাহি যায়।
তুমি ধন দিয়ে মন বোঝ, বোঝ বেটা দিয়ে
গরিব করিয়া বোঝ নিদারুন হয়ে।
ভিখারি করিয়া কার ঝুলি কাঁধে দাও
কারো দালান বাড়ি দিয়ে তুমি মন বুঝে লও।
তখনেতে আসমান হইতে আগ বাহির হইল
কোরবানির গোস্ত যত জ্বালাইয়া দিল।
তামাম শহরের লোকে সকলে খাইল
সেই হতে কোরবানি যাহের হইল।
আমার আল্লাহর বান্দা, নবির উম্মত যেভাবে থাক
কোরবানি সাঙ্গ হইল আল্লাহ বলে ডাক ॥

৭. রয়ানি গান

সর্পদেবী-মনসার জন্ম থেকে লক্ষ্মীন্দরের পুনর্জীবন প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে তার দেবত্ব প্রচেষ্টার গীতিকাহিনীই 'রয়ানি' নামে পরিচিত। রয়ানি মূলত চাঁদ সওদাগর, লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার প্রচলিত লোককাহিনী ভিত্তিক মনসাদেবীর মাহাত্ম্যসূচক লোকসংগীত। সাপের উপদ্রুব থেকে রক্ষা পাবার জন্য ফরিদপুরসহ দক্ষিণ বাংলার সমগ্র জেলার ঘরে ঘরে এ সংগীত গীত হয়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এ গানের শ্রোতা। বর্ষা মৌসুমে গ্রামে গ্রামে মনসাপূজা কিংবা মহাত্ম পরিবেশিত হয়।

জ্যৈষ্ঠ না আষাঢ় মাসে গগনে গর্জন
রে বিধির কী অইলো

www.pathagar.com

লোহার আঁটন লোহার ছাটন
লোহার বাসর ঘর
সেই ঘরেতে বসত করে বেহুলা-লক্ষীন্দর। [...]

৮. সূর্য পূজার গান

সূর্য জীবনের প্রতীক। এই কারণে ধর্ম, কৃষি ও ব্যাধিকে ঘিরে সূর্যচেতনা, সূর্যবন্দনা জনমানসে অনিবার্য এবং আবশ্যিক বিষয়। ফরিদপুর জেলায় হিন্দু-কুমারী মেয়েরা সূর্যবন্দনা করে 'মাঘমঙ্গলব্রত' পালন করে। সূর্যরশ্মিতে বৃক্ষ যেমন ফলবান হয়ে ওঠে তেমনি কুমারীদের বিবাহের বাসনা যথাশীঘ্র ফলপ্রসূ হয়। সূর্য দেবতার মতো সুন্দর, বলবান ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী বর পাবার জন্য মাটিতে কল্পিত সূর্যদেবতা অঙ্কন করে।

উঠো উঠো সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
তোমার জন্য বসে আছি ধূপ প্রদীপ নিয়া
উঠো উঠো সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
তোমার জন্য বসে আছি ধান দুব্বা নিয়া;
উঠো উঠো সূর্যঠাকুর অবির মাইখা গায়
সাজি ভইরা রক্তজবা দিবো তোমার পায়।
আইসো আইসো সূর্যঠাকুর সোনার রথে চইরা
সপ্তবর্ণ সপ্তঘোড়া চালাও আকাশ জুইড়া
সূর্য উঠলো ঝিকিমিকি আঁধার গেলো দূরে
সূর্যঠাকুর দিলো দেখা সোনার রথে চইড়া।

www.pathagar.com

৯. গোক্ষুর নাড়ু

গৃহপালিত গাভী প্রসবান্তে একুশ দিন পরে বাইশ দিনে দোহন করে সেই দুধ দিয়ে ক্ষীরের নাড়ু তৈরি করে সন্ধ্যায় উঠানের মধ্যখানে ঘট পেতে তার উপর আম্রপল্লব, বিভিন্ন রকমের ফুল, কলার আগপাতায় নাড়ুগুলো রেখে একজন ছড়া আবৃত্তি করে সহযোগিরা ধুয়া ধরে।

গৃহপালিত গাভীর রোগবালাই থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য গোরক্ষকের উদ্দেশ্যে গোক্ষুর নাড়ু অনুষ্ঠিত হয়। এটি একটি যাদুবিদ্যাগত ক্রিয়া (Ritual)।

১. ওরে পাইকেরি/উপরে যাবো/কত পানি?
আটু পানি।
ওরে পাইকেরি/উপরে যাবো/কত পানি?
গলা পানি।
(ক্রমান্বয়ে অথৈপানি পর্যন্ত ছড়া কাটা হয়)

২. মামা দোয়ালে আসে না আসে
ভাগনে দোয়ালে সাগর ভাসে।

১০. নইলা গান

ফরিদপুর জেলার লোকসংগীতের মধ্যে বৃষ্টি কামনায় কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রায় মেঘরাজার গান, বদনা বিয়ে, সত্যপিরের গান, সোনারায়ের গান, মাদারের গান, মানিকপিরের গান এবং নইলা গান প্রচলিত ছিল। একসময় শিরালি, হিরালি, বা হিড়াল নামক বৃষ্টির ওঝা বলে কথিত একশ্রেণির পেশাদার লোক নিয়োজিত ছিল। বৃষ্টি আহ্বানে তারা মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করত। কোথাও কিশোরী মেয়েরা গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে মেঘ রাজার গান গেয়ে মাঙ্গন করত। ঐ সময় তাদের লোকাচারে 'বদনা বিয়ে' এবং 'ব্যাঙ' বিয়ের প্রচলন ছিল।

রক্তজবা জলে ভাসাইছে ভাইরে
মা বুঝি আজ আসরে আইসাছে,
আমাগো উপরে আছে দয়াল আল্লা সখা
কোথায় রইল হাইড়া ম্যাঘারে
আইসা করো দেখা।
ওনুর ঝনুর বাজে সোনার নূপুর পায়
ঐ আসতেছে দয়াল নবী এই আসরে আয়।
ওনুর ঝনুর বাজে সোনার নূপুর পায়
ঐ ফুলের নাগররে

www.pathagar.com

হারে ফুলের ডালা নামাইয়া দে
আমার দয়াল চাঁন চাইছে ফুল ঝাঁপি ভইরা দে।

১১. হুলোই গান

ফরিদপুর জেলার লোকায়ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'হুলোই গান' নামে একশ্রেণির প্রার্থনামূলক মাগুনগীতি প্রচলিত আছে। 'হুলোই' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিক হচ্ছে হুল্লোড়>হুল্লোই>হুলাই। হুলাই আনন্দসূচক ধ্বনি। কোনো কোনো অঞ্চলে এ গান 'অড়া' বা 'অড়ণ' নামে পরিচিত। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এই গান আনুষ্ঠানিকভাবে গীত হয়। নির্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হলে গানগুলো বছরের অন্য কোনো সময়ে শুনতে পাওয়া যায় না। সাধারণত 'নবান্নের' জন্য রাখাল রাখাল ছেলেরা শীতের আগমনে শিরনি উৎসবের আয়োজন করে। ঐ সময় সন্ধ্যায় এরা দলবেঁধে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে চাল-ডাল, ভোজ্যদ্রব্য, টাকা-পয়সা, ইত্যাদি সংগ্রহ করে। পৌষ মাসের শুরু থেকে পৌষসংক্রান্তি পর্যন্ত এদের মাগুন চলে। সংক্রান্তির দিন প্রভাতে মাগুনকৃত চাল-ডাল ও ভোজ্যসামগ্রী দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে হৈ-হুল্লোড় করে নিজেরা খায় এবং পড়শিদের মধ্যে তা বিতরণ করে। 'হুলোই গান' ছড়াধর্মী হলেও এর কথায় ধর্মাশ্রিত বিষয়টি লক্ষ করা যায়। মাগুন গান বলে এর পিছনে একটি লৌকিক পটভূমি আছে।

কোনো লৌকিক দেবতার উদ্দেশ্যে গান গাওয়া হয় বলে স্বভাবই বাড়ির মালিক অথবা গৃহিণী তুষ্টি সাধনের জন্য মাগুন দেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এতে যুক্ত থাকে। বিশেষ করে শিবঠাকুরের দোহাই, লক্ষ্মীর নাম উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

১.
ও গিরি ও গিরি/(ধুয়া) হুলোই হুলোই।
বার কইরা দাও সোনার ফিড়ি।/(ধুয়া) হুলোই হুলোই।
সোনার ফিরিতে বসবে কে?/(ধুয়া) হুলোই হুলোই।
বাস্তঠাকুর এইসাছে।/(ধুয়া) হুলোই হুলোই।
ব্যস্ত ঠাকুর দিলেন বর,/(ধুয়া) হুলোই হুলোই।
ধান-চালে গোলা ভর।/(ধুয়া) হুলোই হুলোই। [...]

২.
ওর ভাই শামুক খোলরে শামুক খোল
হুলোই হুলোই।
আমরা আইছি গুড়াগাড়া
হুলোই হুলোই।
আমরা কয়ডা মাঙ্গন চাই
হুলোই হুলোই।
কালেতে কষ্ট পাই
হুলোই হুলোই।

www.pathagar.com

আর বাড়িহান পাবার চাই
হুলোই হুলোই।
আর বাড়িহান কদ্দুর
হুলোই হুলোই।
আসতে যাইতে সমুদ্দুর,
হুলোই হুলোই।
সমুদ্দুরে নূনা পানি
হুলোই হুলোই।
পাটা আনো অলদি বাটি
হুলোই হুলোই।
অলদিপড়ে ফোটা ফোটা
হুলোই হুলোই।
বুইড়া বিটির মাজা মোটা
হুলোই হুলোই।

১২. সারিগান

লোকসাহিত্যে সমবেত সংগীত (Group Song)-এর মধ্যে সারিগান একটি জনপ্রিয় শাখা।এ গানে শ্রম লাঘব হয় বলে একে শ্রমসংগীত (Work Song) বলা হয়। নদীকেন্দ্রিক অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনে এ গান বড়ই ঐতিহ্যময়। বিশেষ করে নৌকা বাইচের জয়লাভের নিমিত্তে আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও শক্তিসাহস বর্ধনে এ গান পরিবেশিত হয়। এ ছাড়া দালানের জলছাদ করার সময় সুরকি পেটার তালে তালে, গাড়ি ঠেলা, ক্ষেতে ধান-পাট নিরানো ও কাটা, ফসল গৃহস্থের ঘরে তোলা ইত্যাদি পরিশ্রমের কাজেও এ গান গীত হয়। এ গান তাল প্রধান বলে একে Rhythmied সংগীত বলা হয়। প্রধানত পূর্ববঙ্গকে সারিগানের সংগীতাঞ্চল বলা হলেও সিলেট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর ও রাজশাহী তথা চলনবিল অঞ্চলে এ গান ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ফরিদপুর অঞ্চলের একটি সারিগানের উদ্ধৃতি–

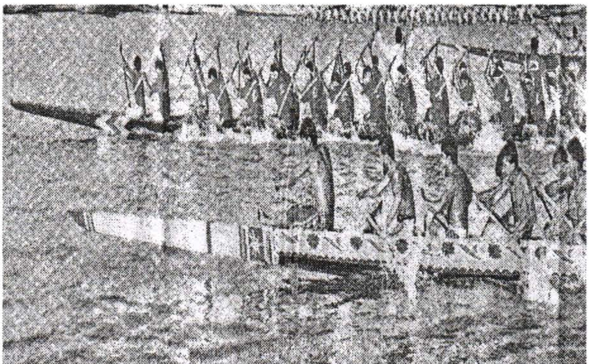

ওমা, জয়ের ধ্বনি দে,
তোর গোপাল সাজিল গোষ্ঠে, জয়ের ধ্বনি দে॥
ওমা, ধান দুব্বা বরণ কুলা মাগো লইয়া আইস ঘাটে।
আশীর্বাদ কর মা তোমার গোপাল যাবে গোষ্ঠে॥
ওরে সাজাইয়া নন্দরাণী নূপুর দিয়া পায়,
পূর্ণিমারো চন্দ্র যেন হইয়াছে উদয়॥
ওমা, ডান কুলে বাজে শঙ্খ বামে বাজে বাঁশী।
গোষ্ঠে যাবার জন্যি মাগো হইলো উদাসী॥
তোর গোপাল সাজিল গোষ্ঠে, জয়ের ধ্বনি দে॥

১৩. বারোমাসি

বারোমাসি গানে বছরের বারোমাসের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণনা করা হয়। বর্ণনায় নারী কণ্ঠ। সে বারোমাসের প্রাকৃতিক বর্ণনাসহ তার দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবনের কথা বলে। শুধু বাংলাসাহিত্যে নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের সব সাহিত্যে বারোমাসী গীত হয়েছে। সিরাজগঞ্জ, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর এবং ফরিদপুরে যথেষ্ট পরিমাণ বারোমাসি গানের প্রচলন আছে।

ফরিদপুরে শান্তির বারোমাসি, ফুল্লরার বারোমাসি, বেহুলার বারোমাসি, মইফুলের বারোমাসি প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মধ্যযুগের বাংলা ধ্রুপদী সাহিত্যে 'ময়মনসিংহ গীতিকায়' মলুয়ার বারোমাসি, নীলার বারোমাসি, কমলার বারোমাসি এবং ষোলো শতকের কবি মুকুন্দ দাসের 'কালকেতু উপাখ্যানে' ফুল্লরার বারোমাসি অনন্য সৃষ্টি। লৌকিক সাহিত্যে এমন কিছু রাধার বারোমাসি আছে যে গুলি রাধা-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ লীলার বর্ণনায় মুখর।

ফরিদপুরের একটি বারোমাসি

ওরে আমি তোর পিরিতে হইলাম দেশান্তরি।
জ্যৈষ্ঠ গেল আষাঢ় এলো/বন্ধুর দেখা না হইল রে
শ্রাবণ মাসে বর্ষা হইল ভারি
ভাদ্র গেল আশ্বিন আসে/আশ্বিনেতে রয় বিদেশে
কার্তিক মাসে শুকনায় গড়াগড়ি
দেখিতে দেখিতে মাস আগুন/জ্বালাইয়া যায় মনের আগুন রে
ওরে পৌষ মাসে শীত করলো আড়ি
মনে হইল মাঘের শেষে/জীবন গেল হায় হুতাশে

www.pathagar.com

ফাল্গুনে দক্ষিণা বাতাস ছাড়ি
শীত গেলো বসন্ত এলো/বন্ধুর দেখা না হইল রে
চৈত্র মাসে গরম পইল ভারি
বৈশাখ করে আনচান/বাতাসে জুরায় না প্রাণ
আমি গ্রীষ্মকালে কারে বাতাস করি
জালালের আষাঢ় মাসে/জোয়ারে নদী গেল ভরে
মাঝিবিনে ঘাটে নাই তরি [...]

১৪. গাশ্‌শি

আশ্বিন সংক্রান্তির রাতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গাশ্‌শি' উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন বাড়ির আঙিনায় পাটকাঠি দিয়ে একটি ছোট ঘর তৈরি করে ঘরের সামনে আলামাটি দিয়ে বৃত্তাকারে লেপন করে। বনবাদাড় থেকে সংগৃহীত তেলাকুইচার পাতা, কাঁচাহলুদ, পিপুল, তুলসি পাতা, নিমপাতা, বেতের কচি ডগা, দূর্বা একটি ডালায় করে বৃত্তাকার অংশে রেখে দেয়া হয়। এর সাথে সরিষা, নারকেল ও তালের শাঁস থাকে। রাতের শেষ অংশে ছড়াকেটে ঐ সকল দ্রব্যাদি জাগানো হয়। জাগানো শেষ হলে এ গুলি একটি শিলপাটায় বেটে সবাই মিলে তা শরীরে মেখে সূর্যোদয়ের পূর্বেই জলাশয়ে গিয়ে স্নাণ সম্পন্ন করে। সবার বিশ্বাস এতে শরীরের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং বিভিন্ন চর্মরোগ থেকে রেহায় পাওয়া যায়। এর পর সন্ধ্যা রাতে রান্নাকৃত 'জোলাভাতি' নারিকেল ও তালের শাঁস সবাই মিলে খায়। বন্ধ্যানারী সন্তান কামনায় জুলাভাতি আহার করে।

'গাশ্‌শি' অনুষ্ঠানে মশা-মাছি এবং রোগ বালাই থেকে মুক্তি পাবার আশায় বিভিন্ন প্রকার ছড়া আবৃত্তি করা হয়। এ ছাড়া বন্ধ্যা গাছে ফলের প্রত্যাশায় ছড়া কেটে সম্মিলিতভাবে কিছু অভিনয় করা হয়। কাছের গায়ে কুঠারের কোপ দিয়ে মাদুলি হিসেবে খড় বেঁধে দেয়। গাছের আত্মা আছে, এই ধারণা থেকে গাছকে ভয় দেখানো হয়। এ হল Animism-এর দৃষ্টান্ত। অভিনয়ের পিছনে আছে সদৃশ্য যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস।

গাশ্‌শির ছড়া

১. গাশ্‌শি জাগো জাগো/ ভালো কইরা জাগো
আশ্বিনে রান্ধে কার্ত্তিকে খায়/ যে বর মাঙ্গে সেই বর পায়।

২. গাশ্‌শি জাগো জাগো/ ভালো কইরা জাগো
অলদি জাগো, তুলসী জাগো, কুলা জাগো, চালুন জাগো
ভালো কইরা জাগো।

৩. গাশ্‌শি জাগো জাগো/ ভালো কইরা জাগো
মশা বুনবুন মশা বুনবুন/ মশার গায় দড়ি।
সকল মশা খেদায় দিলাম/ কেষ্টর মার বাড়ি।

www.pathagar.com

১৫. গোয়ালের ডাক

গোয়ালের ডাক-আশ্বিন মাস থেকে শুরু করে চৈত্র মাস পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গোয়ালের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণির নিম্ন-বর্ণহিন্দু 'গোয়াল' নামে পরিচিত। এরা গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গরুদাগিয়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে। গরু দাগানোর সময় কর্মের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা হিসেবে এক ধরনের ছড়া আবৃত্তি করে যা 'গোয়ালের ডাক' নামে পরিচিত। ফোকলোরবিদ আব্দুল হাফিজ বলেন, 'গোয়ালীর ছড়া' বা গানে গরু ও গোয়াল সম্পর্কে বিচিত্র সংস্কার স্থান পেয়েছে। এ গুলোকে 'গোরক্ষনাথের ছড়া' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। ...গ্রিয়ার্সন সাহেব 'ময়নামতির গান' সংগ্রহ করেছিলেন এই গোয়ালী ভিক্ষুকদের নিকট থেকে। রংপুরের কোনো কোনো অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা 'যোগী' নামে পরিচিত। ফরিদপুর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গোয়ালের ডাক :

আষাইঢ়া বেঙ্গা/ করে চেঙ্গা বেঙ্গা/ অলদি মাইখ্যা গায়/ বেঙ্গা শ্বশুর বাড়ি যায়।
বেঙ্গা কুত কুইতে চায়/ বেঙ্গা ঠুকু-ঠুকুর কাশে/ মুখ দেয় না ঘাসে/
পোলাপানে হাসে।[...]
তোর গেরস্ত দেয় না কড়ি। র- র- র
করিস না নড়া চড়া/ দাগাইয়া দিব গুদির মূড়া/ ঘাস খাবি যাইয়া মোল্লার পাড়া
মোল্লারা যদি করে রাগ/ ধইরা আনবি বনের বাঘ/ সাপ দেইখা লম্ফ দিবি
বাঘ দেইখা দাবার দিবি/ বছর বছর বিয়ান দিবি/ দুনা ভাইয়া দুধ দিবি
নাতিন নিয়া চকে যাবি/ তারাচান ঘোষের গুণ গাবি।

১৬. ছয়হ্যাটুরে বা নামকরণ

নবজাতকের জন্মের ছয়দিনে, কখনো নয় দিনে ছয়হ্যাটুরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি মূলত একটি নামকরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের পূর্বের রাত্রে সন্তানকে বিদ্বান করার ইচ্ছা পোষণ করে নবজাতকের শিয়রে দোয়াত কলম, খাতা-পত্র রাখা হয়। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েরা সারারাতব্যাপী প্রসূতির ঘরে হাসিঠাট্টা আমোদপ্রমোদ সহকারে গীত পরিবেশন করে। পরদিন নবজাতকের মাথার চুল কামানো হয় এবং প্রসূতি ও নবজাতককে গোসল করিয়ে নতুন জামাকাপড় পরিধান করিয়ে প্রথম ঘর থেকে বাইরে বের করা হয়।

জ্যৈষ্ঠ না আষাঢ় মাসে পন্থে কাদাপানি
সেইনা পানিতে ভাইসে আইলোরে কোলে জয়ধন মনি।
মায়তো উঠিয়া কয় আমি কিসের কাম করি রে
ছাউয়াল ওলিরে ছাউয়াল ওলি।
মায়ের কোলে থুইয়া ছাউয়াল দাদির কোলে যায়
দাদিতে উঠিয়া কয় আমি কিসের সংসার করি

www.pathagar.com

এক পয়সার বিস্কুট অইলে আমি নাতি ভুলাইতে পারি রে
ছাউয়াল ওলিরে ছাউয়াল ওলি। [...]

ফরিদপুর জেলার লোকসংগীত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলিষ্ঠ, বিচিত্রমুখী এবং ভাষা ও বাণীতে উজ্জ্বল। প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিশাল সমতলভূমি, নদীকেন্দ্রিক চরোৎপাদী (Bralded) চরিত্র এ জেলার লোকসংগীতকে প্রভাবিত করেছে। এ জেলার লোকসংগীতের মধ্যে বৃষ্টি কামনায় কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার মেঘরাজার গান, বদনা বিয়ে, মাদারের গান, মানিকপিরের গান, নইলা গান ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিভিন্ন রোগ-বালাই থেকে আরোগ্য লাভের জন্য গাজির গান, শীতলার গান, সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রয়ানি গান, ব্রতনারীদের মধ্যে সূর্যপূজার গান, মাঘমঙ্গলব্রত, তারাব্রত, সতীনব্রত প্রচলিত আছে। এ জেলায় এমন কিছু লোকসংগীত আছে যেখানে প্রেমই তার প্রধান উপজীব্য। এই গানগুলোর মধ্যে মেয়েলিগীত আধ্যাত্মিক সংগীত উল্লেখযোগ্য। লোকাচারভিত্তিক মেয়েলি গান এ জেলার একটি প্রধান লোকসংগীত। নারী মনের স্রোতধারা এ গানে ফুটে উঠেছে। মুর্শিদি, মারুফতি, মরমি, বিচার, কির্ত্তন, সুরেশ্বরি গান, খাজাবাবার গান, মাদারের গীত ও ফকিরি গান এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠতম লোকসংগীত। কর্মসংগীতের মধ্যে সারিগান গোয়ালের ডাক, পালকিরগান, ছাদপেটার গান, উল্লেখযোগ্য।

বিরহীসংগীতের মধ্যে বারোমাসি, রাখালি, বৈঠকি গানের মধ্যে কবিগান, জারিগান, বিচারগান এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে অষ্টকগান, গাশ্‌শির ছড়া, গাজনের গান, মনসাপূজার গান, দুর্গাপূজার গান, গাজির গানের সংগ্রহ দেখা যায়। হোলি উৎসব, চড়ক পূজা এবং ত্রিনাথের পূজায় বেশকিছু গান শোনা যায়। শোকসংগীতের মধ্যে কৃষ্ণলীলা, নিমাই সন্ন্যাস পালা, গৌরাঙ্গ লীলা, কীর্তন ছাড়াও ব্যবহারিক সংগীত হিসেবে বিবাহের গান, সাধভক্ষণ, জাতিকর্ম ও অন্নপ্রাশনের গানের প্রচলন রয়েছে।

১৭. অন্যান্য আঞ্চলিক গান

মেছের শাহ (নগরকান্দা উপজেলা)-এর বাউল, মরমি ও বিচার গান

(১)

সে যে চিন্ময় চৈতন্য স্বরূপ
চারগুণে এক দেহ তার
আইদ্য মানুষ সাধ্য কর যার ॥
ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ুর জোরে
নিত্য লীলা ঘরে ঘরে
চার দিয়া চার পূরণ করে

www.pathagar.com

চারগুণে হয় এক আকার ॥
ঠিক যেন সে সর্বশক্তি
জীবের জীন ভক্তের মুক্তি,
যত দেখ প্রতিমূর্তি
একজনার এইসব আকার ॥
অধীন মেছের চাঁন্দের কথা
ওহিকে তা জানতে কোথা,
এক মানুষ জগতের দাতা
শরিক নাই সে একেশ্বর ॥

(২)
মন তোর মনিপুরের খবর জান
যেখানে খুঁজলে পাবি মানুষের সন্ধান ॥
মণিপুরে আছে মানুষ অঙ্কুরের আশ্রয়
সেখানেই সাধন সিদ্ধি যে তার মর্ম পায়
গুরু প্রেমে শুধা পেলে অঙ্কুরে মানুষ মেলে
রোগে যার কপালে আসে সোবহান ॥
আসকের হিল্লালে মানুষ চলে সর্বদায়
মুর্শিদের আসক হলে সহজে প্রেম হয়
সহজের প্রেমিক যারা মূলের ভেদ জানে তারা
দেখে নূর সেতারা যারা ভাগ্যবান ॥
মহাশক্তি সরোবরে ফাঁদ পাতলে ধরা যায়
মানুষ সেই পথে চলে ফিরে যখন তার সময় হয়
সহিংস মানুষ যারা সেই পথে আছে তারা
মেছের শাহ কয় পেলে ধরা বর্তমান মানুষ বর্তমান ॥

(৩)
ঐ দেখ হাতের কাছে আছে মানুষ
সাধক যাঁরা চিনতে পায়
চিনে মানুষ চিনলে সাধন হয় ॥
দেখ এক মানুষ অনন্তরূপে রয়
যে রূপে যে ভাবে তার পায়
হইল স্বরূপ রূপ, রূপে স্বরূপ গো
তারে দেখলে জীবের ধান্দা বায় ॥
দেখ মানুষ মানুষের আশ্রয়ে
সপ্তমানে আছেন তিনি খুঁজলে দেখা যায়
সে জ্ঞান চোখে দেখবি তোরা গো
চর্মচোখে দেখবি নয়,

www.pathagar.com

তারে গুরু বইলে ডাকলে বাঞ্ছা হয় সর্বক্ষণ
চৈতন্য মানুষ চেনা বেষম দায়
অধীন মেছের বলে দেখবি তোরা গো
তবে কূল ছেড়ে এই কুলে আয় ॥

(৪)
মন ভজনের কারণ জানে না
ডুবে ভক্ত মুর্শিদের প্রেমে
কুলের গৌরব করো না ॥
প্রেম পুরুষ প্রকৃতি মহাতত্ত্ব
তিনেতে হয় একটি অর্থ
তিন তারে দড়ার মতো জানো না ॥
পালা মেলে দুই তার
তার মধ্যে বসায় এক তার
দুই তারে মিল হয়না যার
সেখানে তার বসে না ॥
যেমন বনের পাখি ফাঁকি দিয়ে
পাখি ধরে পাখি দিয়ে
তেমনি দুই এক মন হয় ধরো না ॥
জেনে আত্মতত্ত্ব
হও তার প্রেমে মত্ত
ডাক তারে ডাকার মতো
ভয় করো না ॥
ও মন যে নামে ডাকরে তারে
জেনে মুর্শিদের ধারে
সর্বক্ষণ এসে ভবে থাকো না ॥
তার সাধন সিদ্ধি হবে
এ দেহের বিপদ যাবে
মনপুরের খবর হবে
মেছের কয় তা জানো না ॥

(৫)
হলো এই মাটিতে সবের জন্ম
জেনে কি জানো না মন
নিগুড় তত্ত্ব জানলে হয় ভজন ॥
আছে মাটি রূপে সাকার নিরাঞ্জন
তাঁর নূর হতে সৃষ্টি সর্বজীবগণ,
তাঁর নূর জমিয়া অগ্নি হয় গো
দেখ বায়ু রূপে দেয় চেতন ॥
মাটি কী সামান্য জানো মন

www.pathagar.com

পানি আর আগুন বাতাস
মাটিতে স্থাপন,
তার প্রমাণ আছে জীবের কাছে গো,
মাটি না পাইলে হারায় জীবন ॥
মেছের শাহ কয় বুঝে দেখ মন
মাটি হতে আকার পেল
সর্ব নূরি তোন,
আগে এই মাটিতে ছেজদা দিলে গো
জানো ছেজদা পায় সেই নিরাঞ্জন ॥

সতীশ গোসাঁই (বোয়ালমারী উপজেলা)-এর গান

(১)
ঐরূপ দেখলে যাবে মনের ধোকা
আয়নাতে লাগাইলে পায়রা যাবে রূপের করণী দেখা।
মূল আঁধারে কুণ্ডুলিপি সবদিক মেঘে আছে ঢাকা
তার উপরে সত্য মানুষ রূপ বনেতে আছে মাখা।
আপন ঘরে আপনি বন্দি চৌকিকে বিদ্যুতের রেখা
আপন জনে ঘর বান্ধিয়া আধা রয় গুটি পোঁকা।
সর্ববর্ণ একই বর্ণ দেখলে জীবের হয় জ্ঞানশূন্য
গোসাঁই সতীশ হলো গুরু ভিন্ন কে দেখাবে শোনরে বোকা।

(২)
গুরু যার কাণ্ডারি ভবে সে অনায়াসে হইবে পার
শুভ যোগে ধরলে পাড়ি নদীর তুফান বলে ভয় কি তার।
সুধা মাস্তল ঠিক রাখিয়া ভক্তির বাদাম দাও খাটাইয়া
মদনগঞ্জ বায় রাখিয়া চালাও তরী উজান ধার।
শুদ্ধপ্রেমের তরীখানা এক মনের বেশি ধরে না
গুরুশিষ্য এই দুইজনা একমনের সই ওজন দার।
সতীশ কয় মোর দুষ্টমতি ভজন হয়না গুরুর প্রতি
পূর্ব জন্মের নাই সুকৃতি তাইতে হইলো না এবার।

(৩)
মিছা কেন ভয়ের হাটে বইস্যা আছ মন বেপারি
মহাজনের কাছে যেয়ে
শিখা লওগ্যা দোকানদারি।
আগে যাইয়া তারে বাধ্য কর
অনুগত হইয়া থাকো রে তার চরণের পর,
সেদিন মহাজনের দয়া হলে রে
তোমারে দিবে রে মাল খরিদ করে।
ভবের পাগলা প্রেমেরি পাথর

www.pathagar.com

রসের দাড়ি বেন্ধে ওজন করো নিরাঞ্জন,
ঠিক থাকে যেন নিক্তির কাটা
এবার অনুরাগে ধর দড়ি।
জমার খাতা কইরা লও পাঁকা
নিকাশের দিনে যেন হওনা ঠেকা,
সতীশ বলে মন বেপারী রে
আরে তোর জমার থিকা খরচ ভারি
বসে থাকো মন বেপারি।

(৪)
জানগা উপসনা করণ না জানিলে
ও তোর সদর বাড়ির দৃষ্টি হয় না।
স্বরূপে কইরে আসন রয়েছে খোদ মহাজন
পবন হিল্লারে মন কাছে আসা যাওয়া
রাহুত, নাছুল, মালকুত, জরুত চার দেশে চারজনা
আছে হাউত মোকামে খোদ কাচারি লাও সে কানে কয় ঠিকানা।
কবুল কর ইস্কের পিয়ালা খোল জোর রাগের তালা
দেখবিরে রূপের মেলা সন্দেহ আর রবে না
মোর জামে মনরে আমার, ক্যান হলে অলক দেওয়ানা
এস্কের পিয়ালা না চিনিলে, দানের কর্ম হাচেল হয় না।
ছালোকি ছাড়িয়া যাবে, ৩৬ পে দুনিয়া হবে
আশকে মাশুক পাবি ঘুইচে যাবে লগনা
অধীন সতীশ বলেছে মনরে আমার
করছাও আনাগোনা
বারে বারে কই তোমারে দিন থাকিতে হও গুরুর জান।

তাইজদ্দিন শাহ (ফরিদপুর সদর)-এর গান

(১)
সর্ব চরণে পাপীর নিবেদন।
আওয়ালে বিছমিল্লাহর কলাম
দোয়াসে পাক পাঞ্জাতন ॥
পদ্মাপাড় 'সানাল চাঁন' রয়
তেঁতুলায় 'চাঁন্দের' আশ্রয়,
শাহ জঙ্গলে 'হরীবশাহ' রয়,
চিনলে এ 'পাগলার' আসন ॥
কাটাগর 'সাগর শাহ' দেওয়ান

www.pathagar.com

বেথুলায় 'গরীবশাহ' জান।
'রামধনী' আজিমশাহ মস্তান
ছেঁউরিতে 'ফকীর লালন' ॥
এসো মুর্শিদ সাঁইর বাজারে
তাইজদ্দিন ডাকে তোমারে
'গোসাই মনীন্দ্রচাঁদ' মথুরাপুরে
'সমীর চাঁদ' রূপচান্দের মিলন ॥
গুরুপদ জানো খাঁটি
ব্রাহ্মণকান্দা মক্কার মাটি
দেওয়ান 'নবাবচাঁন্দ' মোর হস্তের লাঠি
জীবনের জীবন এখন ॥

(২)
আমি কেমন করে ধরবো তোমারও কোমল আঁখি
আমি শয়নে স্বপনে সদাই
তোমার ঐ বদন দেখি ॥
হইয়া সে চাতকেরই প্রায়
জল ধরেই জলধর হয়ে আমি
করিরে হায় হায়।
তোমার পদবিন্দু বারি বিনে রে
দয়াল জীবন কেমনে রাখি ॥
তৃর্ণ যেমন স্রোতে ভেসে যায়
একূল ওকূল পায়নারে সে
ভাসে নিরাশ্রয়।
তেমনি পড়ে ভব সাগরে রে
দয়াল দুই নয়নে আন্ধার দেখি ॥
তাই ভেবে বসে ফকির তাইজদ্দিন
আমার মনে বড় আশা ছিল
পাক নবাব চাঁদের দীন।
আমার সে আশা নইরাশা হলোরে
দয়াল আমারে দিলিরে ফাঁকি ॥

(৩)
দয়া করে দাও ও দয়াল চাঁদ চরণ দু'খানি
আমি কেমন করে করবো বলো
তোমার নামের গুণ বা খানী ॥
তুই যে আমার নবগুণ আমি অতি হীনজন
বাঁচাও যদি এ জীবন চরণ বারি দাও এখনি।

www.pathagar.com

অনাহারে উপষে থাকি তবু সদাই তোমায় ডাকি
তোমার রূপ বুকে রাখি সদা গাই ও নামের ধ্বনি ॥
যে তোমারে সাধন করে দুঃখ জ্বালা রইতে নারে
ফকির তাইজদ্দিন ডাকে তোমারে
বলে নবাব চাঁদ গুণমণি ॥

(৪)
একবার দয়া কর দীন দয়াময় দরদি আমায়
তোমার ভক্তের ডাকে বিনয় করে
দয়াল দাও আমারে পদাশ্রয় ॥
শুনি তোমার নামের জোড়ে
পাথর ভাসে সুমুদ্দুরে জলেরই আশ্রয়ে,
তুমি শোলাকে ডোবাতে পারো
দয়াল তোমার নামের হিমালয় ॥
অহল্যা পাষাণী ছিল
(তোমার) পদধুলায় মানব হল চরণের কৃপায়।
তুমি পাটনির নাউ করিলে সোনা
দয়াল দিয়ে চরণ বিনিময় ॥
তুমি ভক্তগুরু নাম ধরিয়া
নিলে পাপী উদ্ধারিয়া আমার কি উপায়।
দেওয়ান নবাব চাঁদের চরণ বিনা
ফকির তাইজদ্দিনের নাই উপায় ॥

(৫)
আমি কাঙালিনী বলে কি দয়াল চাঁদ মনে পড়ে না
তুমি তো করেছো কাঙাল
আমায় দিয়ে কত যন্ত্রণা ॥
যে দিন তোমার রূপ দেখেছি
ঐরূপে নয়ন দিয়েছি।
আমার মন প্রাণ সব সঁপেছি
তাও আমার আছে জানা।
প্রাণ সঁপেছে হাতে হাতে
এখন কাঁদাও পথে পথে
একদিন কাঁদতে হবে আমার সাথে
জেনে কি তা জানো না।
আজ আমারে ফাঁকি দিয়ে
কোন্ বনে রইলি লুকিয়ে

www.pathagar.com

ফকির তাইজদ্দিন বিদরে হিয়া
একবার চেয়ে দেখো না।

মহিন সাঁই (ফরিদপুর সদর)-এর গান

(১)
রূপের খাঁচায় সোনার পাখি
আসে আর যায় ॥
চোখ বুঁজিলে সকল মিথ্যে
দিন দুনিয়া আঁধার হয় ॥
শিকল কাটা অচিন পাখি
ঘুরে ফিরে খাঁচায় থাকি
ফাঁক পাইলে দেয় গো ফাঁকি
ধড় ছাড়িয়া মন পালায় ॥
খায় দায় বেশ পক্ষীটি
বনের দিকে রয় চক্ষুটি
সদায় করে কাটিকুটি
সুযোগ পেলে উড়ে যায় ॥
বৃথা চোখের পানি ফেলা
দুদিনের এই ছেলেখেলা
মঙ্গল সাঁই কয় মহিন ভোলা
কেন্দে ফেরো কার আশায়।

(২)
ধরবি যদি অধরারে খোঁজো নিরালায় ॥
সে লম্পটের শিরোমণি তারে ধরা বড় দায় ॥
চীন শহর আর ঢাকার গলি
নিশান তাহার কদমতলি
ক্ষণে ক্ষণে যার
রসের বাঁশরি বাজায় ॥
কান পেতে যে শোনেরে বাঁশি
আমার মওলা নামের প্রেমের ফাঁসি
পড়ে তার গলায় ॥
কুলের মুখে দিয়ে কালি
মাথায় নিয়ে কলঙ্কের ডালি
পথে নামতে হয় ॥
মনরে ধরবি যদি তায়
ফকির মহিন কয়

www.pathagar.com

নিত্য সন্ধ্যা দুপুর প্রাতে
যেও মুর্শিদ যমুনায়।

মুন্সী বাছের (নগরকান্দা উপজেলা)-এর

(১)
নিলা তুই দেখ না নয়ন ভরে
যে নিলা কইরাছে সাঁই সীমা সঙ্গ সীমা নাই।
নয়নে তে দেখ তাই নিলা কিরূপ ধরে,
আপন রূপে ধরে রূপের খেলা করে,
নীড়েতে বসত কইরা নিরাঞ্জন নাম ধরে।
আকার আর সাকার অন্ধকার আর নিরাকার
তারপরে সাঁই দীপ্তকার রূপ ধরে
বিনা মেঘে বিন্দু ছুটে পরে,
সিন্ধুনীড়ে পইড়া বিন্দু জীবের গঠন ধরে
ঘাটে ঘাটে নিরাঞ্জন কইরাছে প্রেমের আলাপন
সক্ষিটে একজন সর্বরূপ ধরে
মুন্সী বাছের বলে খোর নীলা কে বুঝিতে পারে
সর্প হয়ে দংশন করে ওঝা হয়ে ঝাঁড়ে।

(২)
চৌদ্দ পোয়া জরিপ করা জমিন একখানা
চৌদিকে মাপিয়া দেখ ওজনদার পরমজনা
আবাদ পতিত জলা জমি তহশিলদার চাষা মদনা,
জংলা জমি আবাদ হইলে ফসল হয় কাঁচা সোনা,
কামারে পাতিয়া জল অগ্নিতে জ্বালাইছে জ্বাল
ও তার গাদ কাঁটিয়া কইরাছে উজলি,
কসনি করে কসনা।
চার কোনে চার নিশান ধরে দাঁড়িয়ে আছে চারজনা
ছয় জনাতে যুক্তি করে লুটে নিলো মালখানা,
পাহাড় ও পর্বত শুকাইল নদীনালা
নদীর কূলে পাখি বসে করতেছে আনাগুনা।
পাখির পেট ভরে তো ঠোঁট ভরে না
আহার করে শুধু ছানা,
মুন্সী বাছের মোল্লা কয়
ভূমিকম্প হলে জমি হয়ে যায় খানখানা,
পাখি যাবে সরকারের জমি রবে অন্ধকারে
ছেড়ে যাবে মুখের বসত এই জায়গারি থাকবে না।

www.pathagar.com

(৩)
কি খেলা খেলছে ভবে আদ্যশক্তি মহামায়া
আদশ্যশক্তি মহামায়া ধরিয়া অনন্তকায়া
জেগে জেগে রূপ ধরে খেলছে খেলা,
দুনিয়া আপনি হইয়া তরী ভাসছে ভরা সমুদ্রে,
সৃষ্টি দানের আশা করে শিব সন্নাসীর কাছে যায়
ব্রহ্মা, বিষ্ণু দুইটি ছেলে মা বলিয়া দিল ফেলে,
শিব সন্ন্যাসী হয়ে ছেলে আলিঙ্গনের আশায় দেয় বলে
মায়ের হস্ত ধরে সহস্র জনমের পরে
গিলিয়া খাবো তোমারে নইলে খাবার সাধ্য নয়
শিব সন্ন্যাসীর অনুমতি পাইলো যখন আদ্যশক্তি
সহস্র ডুব দিয়ে যখন সহস্র জনম পরে
মুন্সী বাছের বলে গেল জানা মহামায়ের গুণপনা
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তিন জনার লীলা বুঝা হবে দায়।

(৪)
ও তুই শোনরে বোকা মন
খোদা বলিয়া মানুষ ভজিসনা কখন।
মানুষ যদি খোদে খোদা হয়
কার তালাশে দীনের নবী মিরাজেতে যায় গো
মানুষ যদি খোদা হইতো মরতো না কখন।
কুল দুনিয়া যাহার সৃজন
সেইতো হইতে পারে প্রভু নিরাঞ্জন
জীবের জীব একই মিলন ভক্তি মুক্তিগণ।
লা শারিক আল্লা আমার মালেক সাঁই
সর্বজীবের যোগায় খানা নিজের খানা নাই
মুন্সী বাছের বলে তাহার লীলা জুড়িয়া ভুবন।

(৫)
মান দেহে বিরাজ করে সাঁই কাদের গণি
মোমিনের দেল আল্লার আরশ হাদিসের বাণী
শাহানশাহ বাদশা যিনি আদমের কলবে আছেন তিনি
আদমের ভেদ যান তুমি বলছে রব্বানী।
কুন্তকানজান মোখফিয়ান নবীজি করে দেবয়ান
নিজেকে নিজ প্রকাশিলেন বলছে রব্বানী।
মীমে মীমে টানাটানি প্রকাশিলেন রব্বানী।
প্রকাশ হইয়া ভুবনে বেড়ায় সাইকেলে করে
লাভ লোকসান নফসের ফেরে চিন্তা করো ইনছানি।

www.pathagar.com

মান আরফা নফছোহ্‌ ফাজাদারা রবে বাহু
নফছের সনে আছে মিসে, বলছে রব্বানী।

আনেচ আলী ফকির (নগরকান্দা উপজেলা)-এর গান

(১)
অবদ মন দেহ রাজ্যের জান সমাচার যা দেখ ব্রহ্মাণ্ড বারে
সে পিলা ভাণ্ড মাঝার ॥
আট কুঠুরি নয় দরজা বার বুরুজ চৌদ্দ কামান, চার কুতুব ষোল প্রহরী
এ দেহ করেছে নির্মাণ,
তিনজন বাদশা, তিনজন উজির, চারজন তার সহচর ॥
ছয় কোটি ছয় খানা হাড় গাঁথিয়াছে ঘরখানি
ছয় কোটি লোমের পড়ে করিয়াছে ছাউনি,
ছেড়পাও বত্রিশ রুয়া চল্লিশ জন তার কর্মচারী ॥
আপন দেহ জরিপ করে কেন ঘুরো অন্ধকারে
জংলা জমিন আবাদ হবে মরবি না অন বিচারে
আনেচ বলে এসব তত্ত্ব জানলে গুচবে অন্ধকার ॥

(২)
অবদ মনরে পাকে পাকে ঘুর পাঞ্জাতন,
পাকপাঞ্জাতন সৃষ্টির কারণ, দুনিয়ায় করে গমন ॥
বহুরূপি তোতাতুতি পাকে পাকে হয় উদয়,
ভাটারটানে আবার ফিরে ভেঙ্গে করে শূন্যময়;
জন্ম মৃত্যু সঙ্গে ঘুরে, নাগরদোলা ঘুরে যেমন ॥
যুগ-যুগান্তর ঘুরিতেছে
জহরী আর মহরা পাকে পাকে ঘুরিতেছে চন্দ্রসূর্য সেঁতারা
পাকে পাকে ঘুরিতেছে সপ্ত দিবস অনুক্ষণ।
মমিন বান্দা ঘুরে সদা মুর্শিদের চরণে,
ঘুইরে ঘুইতে তওহিদ এলেম শিক্ষা করে যতনে
আনেচ বলে কলির যুগে ঘুরে না সে আর কখন।

(৩)
অবদ মনরে মমিনের দেল আরশে আল্লার
কুলবেল মমিনিন বলে দলিলে তার সমাচার ॥
আসল মসজিদ জানো মমিনের কলব তরে
আপনি সাঁই খোদে খোদা, সেখানে আচর করে
সেখানে অজিম ছালাম কিসে হয় সে গুণাগার ॥
মমিনের দরশন জানো খোদে খোদার হয় দিদার,
তাহার খেদমতে হয় হাজারো শুকুর আল্লার

www.pathagar.com

বিশ্বাসে মিলিবে বস্তু বেঈমানের নাই পারাপার,
ধনি মানে গৌরবেতে প্রাচীন পর্দায় আভরণ,
দীনতা-হীনতা বিনে হবে না সাধন ভজন
অধিন আনেচ ভাবনা জেনে জগতে তার অনাচার।

(৪)
আমার ঐ ভাবনায় মন উদাসী আলেপ লামে আছে মিশি
আলেপ লাম মিম তিনের অর্থ জানিলে মন হয় খুশি ॥
দেখিলাম সে কুরআনেতে লাম হরফ রেখে মেঝেতে,
মিম হরফ রেখে দূরেতে তবু মিমের মান বেশী ॥
আছে গুপ্তপ্রেমে আলেপ হরফ মিম হরফকে লাগায় রশি,
যার কুলেতে জন্ম নিলে তাকে কেন ভুলে রইলে ॥
দিন ফুরাইল অবশেষে মন তোর মুক্তি পাবে কিসে,
তাকে চিনে কর ভজন সাধন, ভজনে তার মন হয় খুশি ॥
শোনোবলি মনরে অজ্ঞায়ন জানলো মিমেরি সন্ধান
না জানলে কি হইতে জ্ঞান, আলেপ পাবিত কিসে,
অধিন আনেচ ভাবে মিমের কারণ রশিদ শাঁর ঐ চরণ দাসি।

(৫)
অবদ মনরে আগে কর নূরের অন্বেষণ
হেদায়েতে কইরাছে আল্লা নূরকে অর্পণ ॥
আল্লার নূল ছামাওয়াতে কোরআনের বাণী,
আসমান জমিনের নূর আপে আল্লা গনি ॥
বরকতের চেরাক হইতে রৌশনী চৌদ্দ ভুবন,
জয়তুন নামের সেই কুদরতি গাছ ভরের পর ॥
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিগ দিগন্তর নাতি তার
যে আগুনে উজ্জ্বল করে অন্ধকার আলো দুই লক্ষণ।
আহদ নূরে নূর মোহাম্মদ, নূরে সারে জাহান
নূর চিনিলে নিরাঞ্জনের সর্ব ঘটে পায় নিশান ॥
অধিন আচেন বলে নূর না চিনে জনম যার মোর অকারণ।

পাগল আহম্মদ ফকির (নগরকান্দা উপজেলা)-এর গান

(১)
মন তোর সোনার দিন ফুরায়ে গেল
পিছে খাড়া তোর কাল সমন
তৌহিদের ঘরে যেয়ে ডুবাওরে নয়ন ॥
শুধু বেল গায়েব একিনে রইলি আমার মন
এলমন একিনে তারে করে উত্থাপন

www.pathagar.com

আয়নল একিনে গেলে পাবি দরশন ॥
হক্কেল একিনে যেয়ে তারে কর আবেদন,
হুয়াল একিনে ফানা হবে যখন
সেদিন ফানা হলে যাবে জানা
আছে তোর কাছে তোর আপন জন ॥
পাগল আহম্মদ কয় মোমরেজ মোল্লা ঠিক রাখিও মন
হুয়াল একিনের ঘরে কপাট দেও এখন
দেখবি তুই যেখানে সেও সেখানে
আর নাইরে ঘরে অন্যজন ॥

(২)
মনতোর হৃদ পিঞ্জিরায় বসত করে হিরামন এক তোতা পাখি
এই পাখি কাজল কোঠার ঘরে বসে প্রেম শিকলে দেয় ঝাঁকি।
আমি তারে ফেলে আসলেম ঘরে তবু পাখি না দেখি
শুনি ওয়াজে বলে বসত করে মাটির খাঁচায় সোনার পাখি ॥
ওয়াদেলে এসে পাখি ওহাদ নাম ধরে যখন
মমতে মেলে যেয়ে পাকি সদায় করে নাম কির্তন,
ঐ পাকি উড়ায়ে লাল নিশান করেছে বসে ডাকাডাকি ॥
আছে ওয়াজে বলে অচিন পাখি ধরবি পাখি কেমনে
মুর্শিদের নিকট যেতে সন্ধ্যান জানো গোপনে
ঐ পাখি তবে তোমায় দিবে ধরা খুলবে তোমার দিব্বো আঁখি ॥
পাগল আহম্মদের দফা সারা না জেনে পাখির সন্ধান
ধরবি যদি অধর পাখি ঐ মুর্শিদ রূপে কর ধ্যান
ঘরে নয় দরজায় কপাট মেরে ধরে রেখো সোনার পাখি ॥

(৩)
এই দেহ রতনা নদীর অঘাত জলে ডুব দেহ গুরু বলে
ও তুই ডুবার মত ডুবতে পারলে পাবি রতন পড়বে তোর গলে ॥
সেই নদীতে ডুবতে গেলে কত হীরা-কাঞ্চন পরশ মিলে আনিস না তুই তুলে,
তুই হীরা-কাঞ্চন ঠেলে ফেলে আনিস নীলকান্ত এক মানিক তুলে ॥
ঐ নদীতে কাম কুম্ভীর আর কামট মগর ঘুরতেছে দিবা নিরন্তর চাতকীর ন্যায় হয়ে
তুই ধরবি যদি সেই অধর মানুষ গুরু মহান্তর নাম জাসনে ভুলে ॥
কামিনী কাঞ্চনের বসে, ধনুক ধরগে রঙ্গরসে ধরবি যদি তারে
পাগল আহম্মদ কয় অধর ধরা নিষ্কর্মা ধন নিসনে তুলে ॥

(৪)
মন তোর মনের মানুষ মূলধর দিন থাকিতে সন্ধান কর
সন্ধান করলে পাবি যেয়ে তাহারে আপন ঘরে

www.pathagar.com

মানুষ ভজিলে পাবি তাহারে ॥
যে মানুষ তালাশি তোরা, সে মানুষ সদায় দেয় রূপের পাহারা,
তালাশে পাবি রূপনগরে, আগে ঠিক কর সেই রূপের ঘরে,
অন্তরেতে নিহার কর রূপনগরে গেলেই পাবি তারে ॥
চিন সরদল সদিষ্টান পদ্ম, সেই মানুষে কর সাধ্য,
সাধ্য করিলে পাবি তারে সেই মানুষ বসত করে মনিকোঠায়,
তার ধরতে গেলে বাধে ল্যাঠা,
ধরার সন্ধান কর কামেল মুর্শিদ ধরে ॥
শ্রীবৃন্দন গয়া কাশি, মাইজভাণ্ডার আর মক্কাবাসী
যত দেশ তালাশ কর তারে,
পাগল আহম্মদের মন পাগল, মিটলনা আর গণ্ডগোল
গুরু দয়া করে জাগো হৃদয় পুরে ॥

(৫)
অসত সঙ্গ ভঙ্গ কর সত্যের দরশন হবে রে মন
সত্য হয়ে সত্য পথ থাক তাতে বাধ্য হবে সাঁই নিরাঞ্জন ॥
মন তুমি কার কেবা তোমার, চিন্তা করে দেখা এবার,
তোমার ভাই বন্ধু পুত্র পরিজন এগুলি সব মিছে স্বপন ॥
তোমার মতন হইলে তুমি, দেখা দিবে তোমার অন্তরযামী
দেহে জেগে উঠবে মহামনি যে মানুষ গোপনের গোপন ॥
হইলেরে মন নিষ্ঠারতি দূরে যাবে ভব ব্যাধি,
দয়াল তোমার হবে সাথি, অছেন হইয়া যাবে যখন ॥
ছেড়ে দিয়ে লোভ লালসা, ঠিক করে লও আপন বাসা,
দেখবি ঘরের মানুষ তোর ঘরে বসা, আর সকল কর বিসর্জন ॥
আলাস্ত রব্বেকুম বলছে আল্লা শিকার কয়লি কালোবালা,
পাগল আহম্মদের ঘটলো জ্বালা মুর্শিদ পদে ডুবে না মন ॥

শাহ সুফি মো. আবদুল মজিদ আল চিশতী নিজামী (ফরিদপুর সদর)-এর গান

(১)
মূল নূর তত্ত্ব ছিল গুপ্ত
যতক্ষণ হয় নাই সৃজন।
সৃষ্টির আগে মহাকাল পূর্বে
খোদ অঙ্গে নূর রয় তখন ॥
খোদ অঙ্গ সে খোদ মূলতত্ত্ব, যাতে খোদ নূর ছিল যুক্ত
অংশেতে তাই হয় বিভক্ত
আকার সাকার নাই তখন ॥
দ্বিশক্তিময় গোলক বানে, পরস্পর আকর্ষণ মনে
প্রেম উৎপত্তি সন্ধিক্ষণে

www.pathagar.com

ঐখানের ভেদ রয় গোপনে ॥
সুফি মজিদ বলে এবার, ঐ নূরে হয় বিন্দু তৈয়ার
তাই দিয়ে সব হল আকার
ব্রামাণ্ড বিশ্ব ভুবন ॥

(২)
আহাদ নূরে আহম্মদ হয়
যাতে মুহাম্মদ সৃজন।
সেই আহম্মদ সেই মুহাম্মদ
আদিতে ছিল যখন॥
আওয়ালে সাঁইর নূর ঝরিল, তাতে নবীল সৃষ্টি হইল
তথায় নবী গুপ্ত ছিল, আদম ছিল না তখন ॥
নূর নবীজির সৃষ্টির পরে, সব সৃষ্টি হয় নবীর নূরে
কোটি কোটি বছর পরে, আদমের হয় আগমন ॥
নবীর সৃষ্টি হল যেথায়, খবর নাই আদমের তথায়
সূফি মজিদ বলে সদায়, পাই যেন নবীর চরণ ॥

(৩)
রূপেতে রূপ মিশবে যখন
দেখবি তখন আকার সাকার।
হবে যখন রূপ নিরুপন
পাবি তখন সেই আকার ॥
রোজা পূজা আচার অনুষ্ঠান, তাতে হয়না মূলের সন্ধান
পাবিনা সেই রূপের প্রমাণ
না হলে বস্তু বিচার ॥
আকারে নিরাকার ধরা, রূপে অরূপ আছে ঘেরা
রূপ সাধনে যে জন মরা
আকারে সে পায়না আকার ॥
রূপেতে রূপ নিত্যধামী, রূপ নিত্যে হয় রূপ উদগামী
তুমির সঙ্গে মিশিয়ে আমি
সূফি মজিদ কয় দেখ এইবার ॥

(৪)
সৃষ্টির আগে আদ্যভাগে
শক্তিময় ছিল তখন।
আদিতে হয় শক্তির উদয়
সেই শক্তি খোদ নিরাঞ্জন ॥
আদিমূলে অখণ্ড ধার, যেথায় স্বয়ং আপনি উদগাম
শক্তি স্বরূপ শূন্যে বারাম

www.pathagar.com

আপনাতে আপনি ধারণ ॥
সৃষ্টির বহু পূর্বে যেথা, তার পূর্বেও সে খোদ মূলসত্তা
অনন্তকাল সেই অবস্থা
শাস্ত্রে নাই তার নিরূপন ॥
মহাকাল পর সাঁই এস্কময়, তাইতে হল বারের উদয়
সূফি মজিদ তাইতে বিস্ময়
তখনও হয়নাই সৃজন ॥

(৫)
নিরূপ দিয়ে নিরূপ ঘেরা
যেখানে শক্তির উদয়।
কারেতে কার ছিল রাগের পর
সুরাগে করে আশ্রয় ॥
আব্রমে সেই শক্তি ধারণ, তাইতে হয় অন্ধকার সৃজন
ধন্ধকারে দেত হয় তাইতে তখন
জোসের উদয় হল যখন
নৈরাকারময় তখন হয় ॥
পূর্ণ হলে চতুর কারে, শক্তি আসে দীপ্তকারে
সূফি মজিদ কয় তার পরে
ব্যাপ্ত সৃষ্টি লীলাময় ॥

আব্দুল রাজ্জাক (বোয়ালমারী উপজেলা)-এর গান

(১)
ঘরে বড় ইঁদুরের উৎপাত
আমি থাকলে বলে নির বিবাদে মনে ছিল স্বাদ।
আমি থাকবো বলে নিরবিবাদে
ঘর বেঁধেছি মনের সাথে
একটা চিকা ইঁদুর উঠলো কাধে
ঘর করিল খাদ খাদ ॥
ঘরে জিনিসপত্র যাহা ছিল
সকলি তো বিনাশীলো
শুধু মাত্র ঘরে রইলো
লোহার কয়টি পাত ॥
তারে ধরা যায় না এমনি চতুর
ঘরের যেন পোষা ইঁদুর
করে দিবারাত্র কাটুরকুটুর
জীবন করলি বরবাদ ॥

www.pathagar.com

মাতাল রাজ্জাক কয় শোন মমতী
জীবন ঘরে নিরলে বাতি
নামের যেন হয় ক্ষতি
দিয়া অপবাদ ॥

(২)
মন তোমার এই কপালে কি আছে জোনোনারে মন্য
আর কবে জাত হবা মন ঘাটে তোমার পা গিয়াছে ॥
এমন মন পর নারীর
দেখলেই কাজ হরণ করি
পিছে জম দিয়াছে গলায় দড়ি
রঙ্গের বাড়ি তোর ভাঙ্গায় পড়েছে ॥
সাক্কালের ফল দেখতে ভালো
উপরে লাল তার ভিতরে কালো
বুঝি তোমার দশা তাই হইল
পাইলো মন চৌরাসীর পেচে ॥
লংকা পতি বারণ ছিল
রামের সীতা হোরে নিল
তাই রামের বিমতি হইল
তারে প্রাণে বোদেছে ॥
হলি রং মহলে রঙ্গের রাজ্য
উরালী দুনিয়ারে মজা
আছে মাতাল রাজ্জাকের কপালে সাজা
অনুমানে তা বুঝা গেছে ॥

(৩)
মানব জমিন পতিত রইলো তোর
আবাদ করলে ফলতো সোনা মাত্র দু দিন পর ॥
ভালো ভালো কৃষক যারা
আইল বেঁধে সাইল খায় তারা
উঠে নামের ফসল জমি ভরা
পায় মালিকের আদর ॥
নামের নাই খাজনা পাতি
তাই ফসলের হয়না জুতি
করে আগাছাতে মাতামাতি
হাত তিনি জমিনের ভিতরে ॥
চরে বছরের পর বছর ধরে

www.pathagar.com

ভেরা ছাগল জমির উপরে
তাইতে লাঙ্গল জোয়াল উটচে বাড়ে
পায়া লরদী জর ॥
মাতাল রাজ্জাকের সামান্য জমি
ফসল হয়না থাক্কা নামি
লতা দেবী ভর ডুবলে তরি
সবই হবে তার ॥

(৪)

কার আশায় রইলি বইয়া বেল গেল সন্ধ্যা হইয়া
তর রক্তবরণ হইল মণি ওরে ধনি দেখলি না পিছে চাইয়া ॥
মনরে খাল বিল নদীর তীরে
বক পাখিতে ভীর করে
খুঁজে নীড় সন্ধ্যার আভা পাইয়া
ওরা উড়ে যায় যায় যে গায়
চায়না পিছে ফিরিয়া ॥
মনরে শিশুকাল বাল্যকাল গেল
তারপর যৌবন আসিল
গণার দিন মজাইল কালে খাইয়া
এখন দিবে ফাঁকি পরাণ পাখি
গেছে সমন জারি হইয়া ॥
ঘর খাইয়া মজাইল যারা
পালাইয়া গেছে তারা
ভজন ছাড়া তোমাতে পাইয়া
তরে কাল আধারে খাইছে ঘিরে
দেখনা পিছে চাইয়া ॥

(৫)

কি করবি আর গুণ টানিয়া গুণ গেছে ছিড়িয়া ও মাঝিরা
কালো মেঘে আকাশ গেছে ছাইয়া ॥
নামের গাইনি ভাবের কল
তরিতে নাই বিন্দু রস রে (ও মাঝি)
ঘোরে তোর কু-বাতাস পাইয়া ॥
পাছা নায়ের মাঝি ভালো

www.pathagar.com

তারা বাইয়া আগে গেলরে (ও মাঝি)
তর ভাঙ্গা নায়ের গোলই গেছে খাইয়া ॥
বাহাত্তর বছর তারি বেলা আছে দন্ডচারি (ওমাঝি)
তর দাড়ি-মাল্লা সব গেছে পালাইয়া ॥
নিয়া নামের গুণ ক্ষমতা
মরে যদি অভাগী লতা
তরে ডাকবে কে আর
দয়াল রাজ্জাক কইয়া ॥

খাজা বাবার গান/ফকিরি গান; বিশ্বজাকের মঞ্জিল (সদরপুর উপজেলা)-এর গান

(১)
দাদা পির এনায়েতপুরী তোমার দয়ার সীমা নাই
তোমারই দয়ার গুণে আমরা মহান ওলি পাই।
হাতে দিয়া মোহন বাঁশি, পাঠাইলা আটরশি
বাঁশির সুরে পাগল হইয়া সবাই ঐ দরবারে যাই।
তোমার কথা স্মরণ করে, খাজা বাবার অশ্রুঝরে।
তুমি বিনে খাজা বাবার আরতো কেহ বান্ধব নাই
বাবা যখন শাসন করে, নাতিগণ যায় দাদার ধারে
তুমি দাদু আছো লুকাইয়া আমরা কাহার ধারে যাই।
আসো যাও তুমি বারে বারে, শক্তি নাইতো চিনিবারে
তুমি যদি কর দয়া তবে তোমার দেখা পাই।

(২)
তোরা কে কে যাবি আয়রে, মুজাদ্দেদের নায়
বৈঠা হাতে বইসা আছেন আমার দয়াল খাজায় রে
মুজাদ্দেদের নায়। ঐ
কত মাঝি এলো গেলো, কড়ি ছাড়া পার না করলোরে।
দয়াল খাজায় ডেকে বলে, আয়রে তোরা আয়রে,
মুজাদ্দেদের নায়। ঐ
ঐ নৌকায় যাত্রী যারা, আল্লাহু যিকির করে তারা রে।
কি সুন্দর সেই মধুর ধ্বনি শোনলে প্রাণ জুয়ায় রে
মুজাদ্দেদের নায়। ঐ
দয়াল বাবার রূপ দেখিয়া, যাত্রীরা যায় পাগল হইয়া রে
ওরে এমন নূরের পুতুল, দেখলে চোখ জুড়ায় রে
মুজাদ্দেদের নায়। ঐ
ঐ রূপ ছেড়ে কেমন করে, একা আমি রইবো ঘরে রে

www.pathagar.com

তারে ছাড়া বাঁচবো নারে, তোরা যেতে দে আমায় রে
মুজাদ্দেদের নায়। ঐ
অধম তালেব কয় পুকারি, ওগো বাবা ফরিদপুরী রে
দয়া কইলা কাঙ্গালেরে ওঠাও ঐ নৌকায় রে
মুজাদ্দেদের নায়। ঐ

(৩)
আটরশিতে বসে বাবায়, মাওলার সন্ধান দিতাছে
যে পেয়েছে আল্লাহর দেখা, তার কি আর অভাব আছে। ঐ
যে চেয়েছে মাওলার সন্ধান, সবকিছু তার করেছে দান
পীরের কদমতলে, নেছার হইয়া গিয়াছে।
আটরশিতে বসে বাবায়, মাওলার সন্ধান দিতেছে।
শেখ ফরিদ সাধনা করে অমূল্য চোখ দান করে
ইব্রাহীম তার প্রেমে পরে, শাহী তখত ছেড়েছে।
আটরশিতে বসে বাবায়, মাওলার সন্ধান দিতেছে।
বিনা লাইনে রেল চলে না মুর্শিদ বিনে খোদা মিলে না
আগে ধর পিরের কলম, পৌঁছতে হলে তার কাছে।
আটরশিতে বসে বাবায়, মাওলার সন্ধান দিতেছে।
রহমতের ভাণ্ডার লইয়া খাজা বাবায় রয় বসিয়া
তালেব বলে চল সবে পৌঁছে যাই বাবার কাছে।
আটরশিতে বসে বাবায়, মাওলার সন্ধান দিতেছে।

(৪)
বাবা দেখ না, তোমার লাগি জাকের দিওয়ানা
কলবেতে ডুবে সবাই যিকির করছে জপনা।
কি আংগুল লাগাইলা বাবা জাকেরানদের সিনাতে
আল্লাহ আল্লাহ যিকির শুরু হইয়া গেল কালবেতে
আমি তো ঘুমাইয়া থাকি কলব আমার ঘুমায় না।
বাবা দেখনা, তোমার লাগি জাকের দিওয়ানা
চোখ বুজিলে কাছে এসে, ঝিলিক মেরে চলে যাও
ঐ পাক কদম ধরতে চাইলে, দূরেতে লুকাইয়া রও
খেয়ালের জগতে খুঁজি দেখতে তোমার মুখখানা।
বাবা দেখনা, তোমার লাগি জাকের দিওয়ানা।
নিরাকার ঘোষণা দিয়া, বইসা রয় আকার নিয়া
আশেকানে ধাঁধায় পরে ঘুর তাই পাগল হইয়া
এদের ভিতর তিন গো বাবা, তুমিই তার নিশানা।

www.pathagar.com

বাবা দেখনা, তোমার লাগি জাকের দিওয়ানা।
শেষ জামানার শ্রেষ্ঠ তাপস, জাকেরানদের কাণ্ডারী
বইসা সবা আটরশিতে, নাম নিলা ফরিদপুরী,
তোমার ঐ পাক চরণতলে, রাইখ আমার ঠিকানা,
বাবা দেখনা, তোমার লাগি জাকের দিওয়ানা।

(৫)
কদম ছাড়িস না, বাবার কদম ছাড়িস না,
ঐ কদম ছাড়িয়া দিলে, উপায় রবে না। ঐ
ভাগ্য গুণে এমন ওলী, এই জনমে পেয়ে গেলি।
পাইয়া রতন কর যে যখন, হেলা করিস না।
কদম ছাড়িস না, বাবার কদম ছাড়িস না,
বইসা বাবার ফরিদপুরে, প্রেম রাজ্যে রাজত্বি করে,
সেই রাজ্যের প্রজা মোরা, নাইকো ভাবনা।
কদম ছাড়িস না, বাবার কদম ছাড়িস না,
কাছে ডাকে আদর করে, সামনে গেলে রয় যে ঘুরে
কথা বলে ইশারাতে, করেন বাহানা।
কদম ছাড়িস না, বাবার কদম ছাড়িস না,
মাওলার সন্ধান পেল হলে, নেছার হও ঐ কদম তলে
ঐ চরণে আছে জাকের, মওলার ঠিকানা।
কদম ছাড়িস না, বাবার কদম ছাড়িস না।

(৬)
চিনলি না মন দয়াল খাজা রে
রহমতের ভাণ্ডার লইয়া, আসিলেন ফরিদপুরে। ঐ
সকল ওলীর সর্দার বাবায়, সবার শেষে আসিলেন ধরায়,
কুল মাখলুকাত সবাই খুশী পাইয়া মহান ওলি রে।
চিনলি না মন দয়াল খাজা রে।
আল্লাহকে রাজি করিতে, পইরা রইলেন পিরে পদেতে।
সারা যৌবন কাটাইলেন এনায়েতপুর দরবারে।
চিনলি না মন দয়াল খাজা রে।
যেজন ধরবে ঐ পাক চরণ, নেছার করবে মন-প্রাণ,
সেইজন পাবে আল্লাহ-রাসূল, ভয় রবেনা ওপারে।
চিনলি না মন দয়াল খাজা রে।
অধম তালেব কয় পুকারী, ওগো বাবা ফরিদপুরী,
গুনাহগার বলিয়া মোরে, দিওনা ফেলে দূরে
চিনলি না মন দয়াল খাজা রে।

www.pathagar.com

(৭)
আমি কি বলিব দয়াল বাবা, কি বলি আর
দয়াল বাবার চরণখানি আমার গলার হার। ঐ
তুমি ওলিকুল চুরামণি, আওলিয়া কুল শিরোমণি,
মুর্শিদ কালেম তুমি দোস্ত দুনিয়ার
তোমার হৃদয় আকাশে উদয় শশী আধারে উঠে বিকশি,
মিলাইয়াছে আটরশি প্রেমের হাট বাজার।
জ্বালাইয়াছ নূরের বাতি জ্বলিতেছে দিবারাতি,
তুমি শিকাইতেছ প্রেম-পীরিতি বিশ্ব বিধাতার,
অধম শামছু মনের গোলে তোমায় রয়েছে ভুলে
৩০ পাক তায়াজ্জু বলে ঘুচতি অন্ধকার।

(৮)
আমার ব্যথা অন্তরে। ২
একবিন্দু চরণধুলি দেও আমারে।
শোন বাবা ফরিদপুরী এ মিনতি আমি করি,
তোমার পানে রলেম চেয়ে ফেলোনা মোরে। ঐ
দানের দিনে সবাই আসি, নিয়ে গেল রাশি রাশি,
কি দোষে শূন্যহাতে ফিরাও আমারে।
মনে আমার আশা ছিল পাক দিলেতে দেল মিশাব
স্নেহ দিয়া মিশাও বাবা প্রেমের অন্তরে।
শামছু বলে এই বেদনা আমার মনে
আমি শামছু বলি কারে।

(৯)
এশকের গভীর তত্ত্ব যদিরে জানিতে চাও
কামেলের পদতলে নেছার হয়ে যাও
ফকিরে তড়পন মজা তুমিরে চাখিতে চাও
মাশুকেরেই তলোয়ারে কতল হইয়া যাও
দেখনা ফরিদ করিল দান অমূল্য চক্ষু রতন।
ইব্রাহিত ছাড়িয়া দির মহামূল্য সিংহাসন।
করিল কামেল খুশি উদয় হইল ভাগ্য শশী
অক্ষয় কীরিত তাদের দেখনা ধরায় অন্ধজন।
শাহী তখন দেনা ছেড়ে ধরবে খাজার চরণ,
দুঃখ দৈন্য দূল হবে - পায়ের খোদার দরশন।

(১০)
খোদার নূরের আলোর বন্যা ঢেউ খেলে যায় কাল্‌বেতে
তার থেকে আজ আলোর জ্যোতি পড়েছে ঢেলে ধরাতে। ঐ

www.pathagar.com

আটরশি দরবার শরীফে স্বর্গীয় নূরের প্রদীপে
তামাম জাহান করছে আলো নবীজির মহব্বতে। ঐ
বিশ্বজাকের মনজিলেতে কাঁনছে যেজন দিনে ও রাতে
আল্লাহ আল্লাহ রব তুলে তাই পাপী-তাপী তরাতে। ঐ
নাই ভেদাভেদ জাতি ধর্ম সৃষ্টি প্রীতি তাহার কম।
দয়াল নবীর নায়েব সে যে আসল মাটির ধরাতে
দয়াল নবীর আশেক তিনি পাঠায় যারে কাদের গনি
বান্দারে তাঁর পথ দেখাতে আখেরী জামানাতে। ঐ
সে যে আমার দয়াল খাজা আউলিয়া জাহানের রাজা
শাহ সুফি ফরিদপুরী পরিচয় যাহার ভবেতে।

(১১)
কার নামেরই মোহন বাঁশি জগত ভুলালো
বাঁশি যখন ভোরে বাজে মোমেন লোকের দেলে লাগে
ঘুমের মরা অমনি জাগে ঐ বাঁশির সুরে
কার নামেরই মোহন বাঁশি জগত ভুলালো। ঐ
মদিনাতে উঠে সুর বাঁশি বাজে সমুদুর
বাঁশির সুরে জগতবাসী পাগল হইলরে।
কার নামেরই মোহন বাঁশি জগত ভুলালো। ঐ
হায়রে কোরেশগণ দিলি কত জ্বালাতন
আর না আসিবে ফিরে জন্ম কাঁদিলে।
কার নামেরই মোহন বাঁশি জগত ভুলালো। ঐ
মক্কাতে উঠে রবি মদিনাতে ডুবে
কার নামেরই মোহন বাঁশি জগত ভুলালো।

(১২)
কে যাবি মদিনার পথে
দয়াল নবীর রওয়াজায়,
চির সুখে ঘুমাইয়াছেন
দিনের নবী মোস্তফায়। ঐ
আকুল প্রাণে অঝর নয়নে
চাহিয়া উম্মতের পানে
ভাবিয়া সে আপন মনে
তৌহিদের বাণী শুনায়। ঐ
এই জগত তরাইব বলে
ঘরে ঘরে নাম বিলাইলে
সে নামে যার মন মজিলে
পলকে সে উড়ে যায়। ঐ

www.pathagar.com

দেখাইতে তার নামের জ্যোতি
সদায় কয় ইয়া উম্মতি
উম্মতি উম্মতি বলে
চোখের জলে বুক ভাসায়। ঐ
যাইতে মক্কা মদিনা
মনে মনে এই ভাবা
মায়া বিনে হইয়া দেনা
দিন গেল আশায় আশায়। ঐ
সেই নবীজির নায়েব খাজা, অলিকূলের মহারাজা
শাহ সুফি ফরিদপুরী পরিচয় তাঁর ভবেতে। ঐ

(১৩)
দয়াল খাজারে কোন পথে যাই, পাবো তোমারে
পথ চিনিনা, কোন পথে যাই, বিপদ ঝগড়া সব দ্বারে দ্বারে
কোন পথে যাই, পাবো তোমারে।
বহুরূপী খাজা তুমি জলেস্থলে সব জায়গায়
কাউকে সুখে কাউকে দুঃখে রাখো তোমার ইশারায়
চার তরিকা তোমার জানা তুমি থাকে ভাণ্ডারে। ঐ
চার তরিকার আদি অন্ত জানো তুমি সব খবর
বিনা তারে খবর ধরো মধ্যে রাখো প্রেমের ঘর
ঘর থাকো কি চালাকি, ঘুইরা মারো আমারে
এসব লীলা তোমার খেলা টের করিতে কে পারে। ঐ
অধম জেহাদী কেঁন্দে বলে বাবা আমার আটরশি,
তুমি আমার গাউসুল আযম, তুমি আমার কাণ্ডারী,
দিয়া তোমার চরণ তরী পার করিও আমারে,
কোন পথে যাই পাবো তোমারে। ঐ

(১৪)
আমার দয়াল কেবলাজান, আমার মুর্শিদ কেবলা জান
ফরিদপুরের আটরশিতে বানাইছে বাগান
তুমি গড়াইছা বাগান, তুমি বানাইছ বাগান।
সেই বাগানের মালিক তুমি, তুমি দয়াবান।
সেই বাগানের ফুল যে, তোমার লক্ষ জাকেরান,
বাবা লক্ষ জাকেরান। ঐ
ফুলে ফুলে ভরা সে বাগান, তোমার লক্ষ জাকেরান,
সেই বাগানের মালিক তুমি, তুমি দয়াবান। ঐ
তোমাকে পাইয়া খুশি, কত জ্বিন ও ইনসান।

www.pathagar.com

আর জমিন ও আসমান। ঐ
তোমার দয়ায় ধন্য হলো সারাটি জাহান,
তোমার নামে পাগল বাবা, বিশ্ব জাকেরান।
আমার দয়াল কেবলাজান, আমার মুর্শিদ কেবলাজান। ঐ

(১৫)
খাজা বাবা মাওলানা একবার আমার ধ্যানে আস না
তোমায় না দেখলে বাবা প্রাণে ধৈর্য মানে না।
জল ছাড়া শূন্য ভরে রইতে পারে কতক্ষণ
তোমারে না দেখলে বাবা জ্বলে মোর দ্বিগুণ আগুন,
এক গুণ আগুন দ্বিগুণ জ্বলে নিবারন তো হইল না। ঐ
তোমার খেলা তুমি খেলো আমায় করো বাহানা
তোমার চরণ হইতে বাবা আমায় ফেলে দিওনা
তোমার চরণ তলে হয় যেন মোর ঠিকানা।

(১৬)
দেখবি যদি আল্লার ওলি আয়রে তোরা আয়
আল্লাহর ওলি উদয় হইল আটরশির গায়
ওলিকুল চূড়ামণি, আওলিয়াকুল শিরোমনি,
দিবা-নিশি মুরিদ নিয়া প্রেম খেলা খেলায়।
পিরের আশেক যে জন হয়
খোদার রহমতে গোনার পাহাড় ভেসে চলে যায়।
খোদার আশেক যেজন হয়, খোদা তার সঙ্গেতে রয়,
কেউ বোঝেনা কেউ শুনে না, করে হায়রে হায়।

(১৭)
তোরে পাবো কেমনে তোরে ধরবো কেমনে,
আল্লাহ আল্লাহ শব্দ কেবল নাম শুনি কালে।
যে হামেশা জেকের করে, থাক তুমি তারই কাছে,
ফয়েজ রহমতে থাকে আনন্দ মনে
সব জেকের জারি হইলে, তার সঙ্গে যাও মিলে
সে ফানা হইয়া সদা থাকে তোমারি সনে।
সে তোমার করুনা চাহে, মাফ করে দাও তুমি তারে,
সর্ব গোনাহ মাফ করে দাও দয়া দানে।
ছগিরা কবিরা গুনাহ সবই আছে তোমার জানা
মাফ করে দাও তুমি আমার গাফফার নামে।

(১৮)
গাওছেল আজম ফরিদপুরী এসেছে আজ এ ধরায়।
দেখবি যদি নূরের পাখি, মনের মত দেখো সভায়।

www.pathagar.com

আল্লার ওলি এ ভুবনে আসতে আছে যুগে যুগে
মানবের পথ দেখায়ে হয়ে যায় বিদায়
তাদের বাণী শুনলে যারা অকূলে কুল পাইল তারা
ওরে ছেলে দরিয়ায় ডুববে তারা হয়ে আপন হারা।
পাক চেহারা মনে হলে বুক ভরে যায় নয়ন জলে।
ফেলে আমায় দিও নাহে, রাখছে তোমায় পায়ে।

(১৯)
আমি অধম কপালপুড়া, যেই ডাল ধরি ভেঙ্গে যায়
বল বাবা আমার কি উপায়
পার ঘাটেতে পায়ের আশায়, রইলাম বসিয়া
আগে পিছে কত মানুষ, গেল পার হইয়া গো বাবা, গেল পার হইয়া,
আমি যেই নৌকাতে চড়ি, সেই নৌকা মোর ডুবে যায়।
বল বাবা আমার কি উপায়।
বৃক্ষের তলায় আশ্রয় নিলাম, ছায়ার আশায়
ঝড় আসিয়া পাতা ছিড়ে রৌদ্র লাগে গায় গো বাবা রৌদ্র লাগে গায়
আমি যেই কূলেতে দাঁড়াই, সেই কূল আমার ভেঙ্গে যায়।
বল বাবা আমার কি উপায়।
নদীর পারে থাইকা মরি পানির পিপাসায়,
হাত বাড়ালে নদীর পানি শুকাইয়া যায় গো বাবা শুকাইয়া যায়,
আমাকে দেখিয়া ঘৃনায়, বাঘ ফিরিয়া যায়।
বল বাবা আমার কি উপায়।
অধম তালেব কেন্দে বলে, বাবাজান ফরিদপুরী,
তুমি দয়া না করিলে, উপায় কি করি, গো বাবা উপায় কি করি
তোমার রাঙ্গা চরণ তলে রাইখ মোর আশ্রয়।
বল বাবা আমার কি উপায়।

সুরেশ্বরি গান

মাইজভাণ্ডারি বাবা সুরেশ্বর
আপন পর নাই চেনা জানা (হায়)
চোখ থাকিতে হইলাম কানা
জানিনা রে কোথায় আমার ঘর ॥
মওলা প্রেমের এমনি ধারা (হায়)
মহৎ পাগল ফকির যাঁরা
একযোগে পায় দীনের খবর
দমের ঘরে জিন্দা করি দম (হায়)
পাক দরবারে গাউসেল আজম
মনরে তোর কিসের এত ডর ॥

www.pathagar.com

নামকীর্তন

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম, হরে রাম
রাম রাম
হরে হরে।

কীর্তন

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রী গৌরহরি
শ্রী গৌরহরি নবদ্বীপ বিহারী
দিন দয়াময় দিন হিতকারী।
এসো এসো মহাপ্রভু করি নিবেদন,
শান্তিপুর মোর গৃহ কর আগমন
প্রভুর লয়ে সীতানাথ করিলেন গমন,
আনন্দেতে উলু দেয় যত নারীগণ।
শাক শুকতাভাজি অন্ন দিলেন সারি সারি,
ভোগের উপরে দিলেন তুলসি মঞ্জুরি।
গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে ভোগ করলেন নিবেদন,
আনন্দে ভোজন করেন শক্তির নন্দন,
দধি দুগ্ধ ঘৃতছানা নানা উপচার
আনন্দে ভোজন করে শচির কুমার।

বিচ্ছেদি গান

আমার ভাবতে জনম গ্যালরে
আমার কাঁনতে জনম গ্যালরে
কেন তারে মনরে দিলাম ॥
তোরা তো কইছিলি সখি ফসনে যমুনায়
শুনিসনা কদম্বতলে কে বাঁশি বাজায়,
আমার অন্তরও যমুনা হয়ে
ভাঙ্গিছে দুই কূলও লইয়ে
পুরানো বাঁশির বাঁশি শতছিদ্র তার
ওরে দূরন্ত বেদনা সেথায় নিমিদিমি ধায় ওরে ॥
সেই কালে কইছিলাম সখি হাসিতে খেলিতে
এখন বিষে অঙ্গ কাইড়া নিল কাল সাপে মেলিতে
আর কত কাল রাখবি
সখি বুঝাইয়া আমায়
আমার বুকেতে আগুনও দিয়ে অঞ্চলেতে ঝাপাই রে
আর কত কার রাখবি সখি বুঝাইয়া আমায়।

www.pathagar.com

হ্যাচড়া পূজার গান

১.
হ্যাচরা ঠারেন হ্যাচরা ঠায়ের কোন দেশেতে যাও
পদ্মা গাঙ্গে ছাইড়া তোমার ময়ূর পঙ্খি নাও,
সোনার নাও পবনের বৈঠা ঝামুর ঝুমুর করে
আমি যাবো মামার বাড়ি ঐনা নদীরে পারে।

২.
হ্যাচরা ঠারেন নারে ফ্যাচরা চুল
তাইতে শোভেনারে লোহাগাড়ার ফুল,
লোহাগাড়ার ফুল নাড়ে বেড়ার মাটি
আমাগো ভাইবোন লোহারকাঠি।

পালকির গান

(১)
বিদায় দেন বিদায় দেন হারে মাধন
বিদায় দেন আমারে রে
ওরে হাসি মুখে দিলে হারে বিদায়
মাধন যাইতাম হাপন বাড়ি রে,
বিদায় দেন বিদায় দেন হারে মাধন
বিদায় দেন আমারে।
বিদায় দেন বিদায় দেন হারে বাপজান
বিদায় দেন আমারে রে
ওরে হাসি মুখে দিলে হারে বিদায়
যাইতাম হাপন বাড়ি রে,
বিদায় দেন বিদায় দেন হারে বাপজান
বিদায় দেন আমারে রে।

(২)
হারে ও ওরে
কোথায় রইলেন দামান্দের দুলাভাই
দেখা দেন আইস্যা - হারে ও ওরে
ওরে খাল দিবেন না কলসি করবেন দান ওহে
হারে - ও - ওরে
যা দিবেন তা জলদি দিবেন বকশিস হে
হারে - ও - ওরে
হারে এই সভাতে দামান্দের দুলাভাই
কলসি করলেন দান ওরে
হারে - ও - ওরে

www.pathagar.com

কোথায় রইলেন দামান্দের মামুজান
দেখা দেন আইস্যা,
হারে - ও - ওরে
ওরে থাল দিবেন না কলসি করবেন দান ওরে
হারে - ও - ওরে
যা দিবেন তা জলদি করবেন দান হে
হারে - ও - ওরে,
হারে এই সভআতে দামান্দের মামুজান
দশ টাকা করলেন দান ওরে
হারে - ও - ওরে।

(৩)
ও যাবো গাবতলার আটে
ও নতুন চুড়ি উইঠাছে
বাইছ্যা বাইছ্যা কিনবো চুড়িরে
ও সাধের আয়না বসায়ছে।
ও চুরির মূল্য দশ আনা
পয়সা নাইকো পাঁচ আনা -
ও চুরি দাও বাম হতো
ও যাবো পাড়ায় বেড়াইতে
ও হারে হাত বুলাইয়া কইবো কথারে
ও আমার প্রাণবন্ধুরসাথে,
ও আমার শ্বশুর চোকিদার
ও আমার ভাশুর দফাদার
মোর সোয়ামি চাকরি করে লো সই
হুগলী জেলার পর,
ও পতি যাইসনা বৈদ্যাশে
একলা ঘর শুইয়া থাকি কেবল
পাগলের ব্যাশে,
ও আমার প্রাণ বাঁচ কিসে?
ও যাবো গাবতলার আটে।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

উৎসব মানে আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান। উৎসবকে ইংরেজিতে ceremony, আবার festival (ব্যাপক অর্থে) বলা হয়। আতোয়ার রহমান তাঁর 'উৎসব' গ্রন্থে উৎসবের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে : 'প্রচলিত সর্বসাধারণ বা বহুজনের জন্যে নির্দিষ্ট দিন, সময় বা ঋতুতে এক বা একাধিক স্থান কিংবা বিশেষ কোনো সমাজে বা সম্প্রদায়ে অনুষ্ঠেয় আনন্দজনক ক্রিয়াকর্মই উৎসব'।

উৎসবের উদ্ভব কখন কোথায় হয়েছিল, তা নিখুঁতভাবে বলা কঠিন। তবে আদিমকালে খাদ্য অন্বেষণে জীবন-জীবিকার তাগিদেই মানুষ একত্রিত হয়েছে। এইভাবেই উৎসবের সূচনা ঘটেছে। প্রথম উৎসব ছিল মূলত শিকারকেন্দ্রিক। পরবর্তী সময়ে কৃষি উৎসবের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে এসেছে। ঋতুবদল তথা প্রাকৃতিক পরিবর্তন প্রাচীন কৃষিজীবী মানুষের মনে উৎসবের ধারণা সৃষ্টি করে। ধর্মীয় বিধিবিধান বা নির্দেশও বহু উৎসবের উদ্ভবের কারণ। বড়দিন, ঈদুর-ফিতর, ঈদুল-আযহা, শবে-বরাত, দুর্গাপূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা ইত্যাদির মত বড় ধর্মীয় উৎসবগুলোর জন্ম কোনো না কোনো ধর্মীয় অনুশাসন বা ভক্তিমূলক আবেগ থেকে। বাঁচার তাগিদে পৃথিবীতে অসংখ্য সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক আর সামাজিক উৎসবের উদ্ভব ঘটেছে। এমনকি রাজনীতি থেকেও অনেক উৎসব জন্ম নিয়েছে। পৃথিবীতে অতীত এবং বর্তমানকালে উৎসবের অন্ত নেই।

উৎসবের শ্রেণিবিভাগ : প্রত্নতাত্ত্বিক আর সমাজবিদদের মতে উৎসবের বৈচিত্র্যমুখী শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। উৎসবকে ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. জীবিকার উৎসব– বৃষ্টি কামনার উৎসব, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি।
২. ধর্মীয় উৎসব– ঈদ, বড়দিন, দুর্গোৎসব, পৌষমেলা ইত্যাদি।
৩. সাংস্কৃতিক উৎসব– দোল পূর্ণিমার উৎসব, বাৎসরিক নাট্যোৎসব, সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদি।
৪. স্মরণ উৎসব - মহররম, একুশে ফেব্রুয়ারি, মে দিবস ইত্যাদি।
৫. রাজনৈতিক উৎসব - জাতীয় দিবসের উৎসব, যুব উৎসব ইত্যাদি।
৬. সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব– বিবাহ, জন্মদিন, আকিকা, অন্নপ্রাশন, খাৎনা ইত্যাদি।

ফরিদপুরের উৎসব অনুষ্ঠান

ফরিদপুরে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত লোকাচার ও সংস্কারভিত্তিক অনেকগুলো উৎসব অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বৃষ্টি উৎসব, নবান্ন উৎসব, পৌষ উৎসব, নববর্ষোৎসব, হোলি উৎসব, রথযাত্রা, চড়ক, বিবাহ-উৎসব, জন্মদিন এছাড়া ধর্মীয় উৎসব হিসেবে রয়েছে ঈদ, বড়দিন, দুর্গোৎসব মহররম এবং জাতীয় দিবসের উৎসব। কয়েকটি উৎসবের উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

www.pathagar.com

১. নবান্ন উৎসব

কৃষিভিত্তিক সমাজে শস্য উৎসব একটি প্রধান উৎসব। প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি ঋতুভিত্তিক উৎসব হিসেবে নবান্নউৎসব পরিচিত। এই উৎসবের পূর্বে ধান কেটে এনে ঝেড়ে-ঝুড়ে রৌদ্রে শুকিয়ে ঘরে তোলে। প্রয়োজনমতো জালা, আউড়ি, মটকি, ডোল এবং গোলায় সংরক্ষণ করা হয়। কিছু ধান সিদ্ধ করে চাউল তৈরি করে। পিঠার জন্য ঢেঁকিতে আলা চাউল তৈরি করা হয়। ঘরে ঘরে পিঠাপুলি, চিড়ামুড়ি তৈরির ধুম পড়ে। হিন্দুসমাজ দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যের থালা সাজানো হয়। ধারণা এঁদের কৃপায় মাটি সুফলা হয়েছে, ফসল ঘরে এসেছে।

সচ্ছল গৃহস্থের বাড়িতে 'নবান্ন' উৎসবের আয়োজন করা হয়। অসচ্ছল চরিদ্র লোকেরা ধনবান গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে নিজেদের গবাদি পশুর জন্য খড়বিচালি সাহায্য প্রার্থনা করে। প্রাপ্তিতে তাদের জন্য দোয়া করা হয়। মুসলমান সমাজে নবান্নে আলা চাউলের সিন্নি রান্না করে মসজিদে পাঠানো হয়। যা মুসল্লি, গরিব-মিসকিন, ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করে। নতুন ভাত খাওয়া উপলক্ষে নবান্ন উৎসব পালিত হয়।

২. নববর্ষোৎসব

বাঙালির জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বৃহৎ সর্বজনীন ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব হলো নববর্ষোৎসব। পুরাতন জীর্ণতাকে বিসর্জন দিয়ে চিরনবীনতার আমন্ত্রণ জানানো হয় নববর্ষোৎসবে। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে এর যোগ ওতপ্রোতভাবে। আম আঁটির ভেঁপু, বৈচি ফুলের মালা ছাড়া বৈশাখ কামনা করা যায় না। শাস্ত্রে বলে, বৈশাখ মাসে গৃহারম্ভ বা গৃহনির্মাণ করলে 'ধনরত্ন লাভ' হয় (বিশ্বকোষ)। নিজের জীবনের কল্যাণ প্রত্যাশার পাশাপাশি অন্যের কল্যাণ কামনাও নববর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। নববর্ষের দিনে ফরিদপুরের বিভিন্ন এলাকায় গৃহস্থরা ঘরের খুঁটি বদলায়। সামনের বছর জমিতে বীজ বোনার জন্য কত পরিমাণ বীজ লাগবে, সংসার চালানোর জন্য কত পরিমাণ ধান লাগবে, এ বছর নতুন জমি এবং হালের বলদ কিনবে কিনা ইত্যাদি বৈষয়িক যাবতীয় হিসাব নিকাশ করে ১লা বৈশাখ। ব্যবসায়িরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সুগন্ধি আগরবাতি জ্বালায়। হিন্দু সম্প্রদায় ব্যবসা কেন্দ্রের সামনে দুই পাশে দু'টি ছোট আকারের কলাগাছ পুঁতেন। কলাগাছের গোড়ায় একটি করে দু'টি নতুন পানির কলসি থাকে যার ওপরে আমপাতাসহ দুটি কচি ডাব রাখা হয়। কেউ কেউ দেশীয় ফলমূলের সমাহারে থালা ভর্তি করেন। লালসালু কাপড়ের মলাটে মুড়ানো হালখাতা খোলা হয়, যাকে খেরো খাতা বলে। ক্রেতাদেরকে হালখাতা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণপত্র (কার্ড) দিয়ে দাওয়াত করা হয়। ক্রেতাগণ পুরো পাওনা, কখনো আংশিক পাওনা পরিশোধ করেন। তাদেরকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। ঐদিন ব্যবসায়িরা সারা বছরের লাভ-লোকসানের খতিয়ান করেন। সংস্কারে বিশ্বাসী ব্যবসায়িরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে 'আরবি আয়াত' কিংবা 'গণেশের পট' বসায়। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ফরিদপুরে হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়িরা পৃথক পৃথক দিবসে ১লা বৈশাখ উদযাপন

www.pathagar.com

করে। মুসলমান ব্যবসায়িরা প্রথম দিন এবং হিন্দু ব্যবসায়িরা পরের দিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হালখাতার আয়োজন করেন। পুরনো দিনে জমিদারগণ খাজনা হালনাগাদ করতেন ১লা বৈশাখ। এটি ছিল একটি পুণ্যাহ অনুষ্ঠান। ঐ দিন প্রজারা ভালো পোশাক-আশাক পরে জমিদারের কাছারিতে খাজনা-নজরানা দিতে যেতেন। যেন পুণ্য করতে যাচ্ছেন। পুণ্য থেকে পুণ্যাহ কথাটি এসেছে।

নববর্ষের দিনে একে অন্যের মধ্যে কোলাকুলি, প্রীতি বিনিময়, বার্ষিক মেলা, আমানি, ষাঁড় দৌড়, লাঠিখেলা, নৌকা বাইচ, মোরগের লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। মেঘের কাছে জলভিক্ষা করাও বাংলা নববর্ষের আর একটি সর্বজনীন অনুষ্ঠান। নববর্ষের দিনে ফরিদপুরের বিভিন্ন এলাকায় বৈশাখি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈশাখি মেলা এখানে 'আড়ং' নামে পরিচিত। এই মেলা থেকে গৃহস্থরা দা, কুড়াল, লাঙল, কাস্তে, লাঙলের ফলা, কুন্তা, বঁড়শি, মৃৎশিল্পের হাঁড়ি-পাতিল, জালা, বেলোয়ারি চুড়ি, নলখাগড়ার রঙিন বাঁশি, লাটিম, মাটির ঘোড়া, বাঘ, মুড়ি-মুড়কি, ঢেঁপের খৈ, বাতাসা, নতুলদানা, গজা, জিলাপি ইত্যাদি কেনা-কাটা করে।

৩. রথযাত্রা

রথযাত্রা একটি জনপ্রিয় স্মরণোৎসব। সাধারণত আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব হয়। পুরির জগন্নাথের স্মরণে এই উৎসব। কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রার মাতুলালয়ে গমনকে কেন্দ্র করে রথযাত্রা উৎসবের উদ্ভব। তাই একটি রথে জগন্নাথ, তার ভ্রাতা বলরাম ও ভগ্নী সুভদ্রাকে বসিয়ে উপাসকেরা আনন্দোল্লাস সহকারে কোনো নদী তীরে টেনে নিয়ে যায় এবং স্নান করিয়ে ফিরিয়ে আনে। এই প্রত্যাবর্তনই 'উল্টোরথ' নামে পরিচিত। ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা সত্ত্বেও এগুলো প্রধানত আনন্দ উপভোগের উপলক্ষ হিসেবেই লোকের নিকট সমাদৃত। একদা ফরিদপুর শহরের কুমার নদের পশ্চিম তীরে 'রথখোলা' নামের উৎপত্তি রথযাত্রা মেলা থেকে। ফরিদপুর শহরের শ্রীঅঙ্গনে একটি মনোরম রথ নির্মাণ করা হচ্ছে।

৪. পৌষ উৎসব

শস্য উৎসবের মধ্যে পৌষ উৎসব বা 'পোষলা' একটি প্রধান উৎসব। পৌষ উৎসব উদ্‌যাপনের সময় সম্পর্কে নির্মলেন্দু ভৌমিক লিখেছেন: কোথাও পয়লা পৌষ, কোথাও সারা পৌষ, কোথাও আবার সংক্রান্তির দিন। সময়ের স্থিরতা নেই, কোথাও ভোরবেলায়, কোথাও সন্ধ্যাবেলায়, কোথাও বা বিকেলে বা সন্ধ্যাবেলা। পৌষসংক্রান্তিতে সনাতন ধর্মাবলম্বীয় নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করেন পৌষমেলা। শাস্ত্রীয় কোনো বিধান না থাকলেও পৌষসংক্রান্তিমূলত বাঙালি সনাতন তথা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরই লোকজ উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে তাদের বাড়িতে বিশেষ পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব চলে। কোথাও দেখা যায়, আমন ধানের চাল দিয়ে অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসে এই অনুষ্ঠান করা হয়। পূর্বে ঘরে ঘরে এই অনুষ্ঠান ও আনুষঙ্গিক উৎসবের প্রচলন ছিল। অনুষ্ঠানের মুখ্য অঙ্গ ছিল নতুন চালে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা।

www.pathagar.com

৫. বৃষ্টি উৎসব

এই উৎসব কৃষিনির্ভর সমাজের এবং কৃষিভিত্তিক। পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, সমাজে এ জাতীয় উৎসবের আয়োজন ছিল। মায়া সভ্যতায় বৃষ্টির জন্য দেবতা ইয়ুকচাক'এর স্মরণ করা হতো। দীর্ঘস্থায়ী খরার হাত থেকে বাঁচার জন্য দেবতা ইয়ুকচাকের স্মরণে নরবলি উৎসব করা হতো। এমনকি নরমাংস ভোজের ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয় উপ-মহাদেশের অনেক অঞ্চলে আজও মেঘ বাজার গান' প্রচলিত রয়েছে।

যেহেতু কৃষিকর্ম বৃষ্টি মুখাপেক্ষী, আর বৃষ্টির অনিশ্চয়তায় কখনো সুলভ, কখনো দুর্লভ; তাই কৃষিজীবী সমাজের জন্য বৃষ্টিতোষণ স্বাভাবিক, বস্তুত অপরিহার্য। এই বৃষ্টি তোষণই জীবনের প্রয়োজনে বৃষ্টিদেবতার জন্ম দেয়। বৃষ্টিকামনার জন্য কৃষিজীবী সমাজে বিভিন্ন যুগে পূজা-অর্চনা এবং যাদুমন্ত্রের জন্ম হয়েছে। যদিও পূজা-অর্চনা সর্বত্রই দেবতা নির্ভর কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সাধারণত দেবতা অনুপস্থিত, কেবল কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বয়ং বৃষ্টি বা বৃষ্টির উৎস মেঘ এক শরীরী শক্তিরূপে কল্পিত। বৃষ্টি সম্পর্কিত যাদু বা মন্ত্রাদির কাজে একসময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলসহ ফরিদপুর জেলায় কিছু পেশাদার ব্যক্তি নিয়োজিত ছিল। কর্মগত বৈশিষ্ট্যে ওঝা শ্রেণির এরা শিরালি, হিরালি বা হিডাল নামে পরিচিত। এদের অস্তিত্ব এখন আর চোখে পড়ে না। মুখ্যত অর্থনৈতিক কারণে এবং বৃষ্টিসম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণাদির ব্যাপকতা লাভের ফলে বৃষ্টির ওঝাসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের অবসান ঘটেছে। এই শিরালি সম্প্রদায় ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ এবং পেশাদার ওঝা, প্রধানত বৃষ্টিবিষয়ক।

ফরিদপুর জেলায় বৃষ্টি প্রার্থনায় মেঘরাজার গান, নইলাগান ও বদনা বিয়ের প্রচলন আজও কোনো কোনো এলাকায় চোখে পড়ে। বৃষ্টি মওসুমে যথাসময়ে বৃষ্টি না হলে কয়েকজন কিশোরী মেয়ে 'বদনাবিয়ে' নামক অনুষ্ঠান করে। এই বিয়ে অনুষ্ঠানে পাঁচজন কিশোরী যাদের একজন মধ্যমণি সুরূপা– তার মাথায় কুলোর উপর বসানো থাকে তেল-হলুদ দেওয়া বদনাসহ বড়কচুর পাতা। এই অনুষ্ঠানে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পানিসহ অন্যান্য উপকরণ মাগুন করে। পরে মাগুনকৃত দ্রব্যাদি দিয়ে সিন্নি রান্না করা হয়। বাড়ি বাড়ি মাগুন করার সময় মেঘরাজার গান গাওয়া হয়। যেমন :

১. দেওয়া নামে হিন্দু-বিন্দু তুলসী পাতায় পানি
সাধুর আগে কইও খবর ভিজে মরলাম আমি।

২. কালা দেয়ারে, তুই না আমার ভাই
আরও ফুটিক জলকদে, চিনার ভাত খাই।

ঐ সময় চৌরাস্তায়, প্রতিবেশীর উঠানে পানি ঢেলে পা দিয়ে ঘষে ঘষে মাটি পিছল করে এবং স্বেচ্ছায় আছাড় খায়।

কৃষিজীবী সমাজে বৃষ্টিকে আবাহন জানিয়ে 'নইলাগানের' আসর বসায়। এই গানে একজন মূল গায়েন 'সরকার' এবং তার সহযোগী 'দোহার' আসরে গান পরিবেশন করে। সরকার আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রথমে একটি চরণ শুরু করে, পরে দোহারগণ সমস্বরে 'ধুয়া' ধরে। তখন সকলের গলায় ভিজা কাপড় জড়ানো থাকে।

www.pathagar.com

নইলাগানের নমুনা

ওরে বাগিলা উড়ে
ধুলা উড়ে বায়,
ঐ যে দেখা যায় কালা ম্যাঘ খান
জলদি কইরা আয়
এই আসরে না আইলি তোর
নামের বেরম যায়।

ওরে বাগিলা উড়ে
ধুলা উড়ে বায়,
ঐ যে দেখা যায় হাইড়্যা ম্যাঘ খান
জলদি কইরা আয়,
এই আসরে না আইলি তোর
নামের বেরম যায়;
এই আসরে না আইলি তোর
জাত মারা যায়,
ওরে বাগিলা উড়ে
ধুলা উড়ে বায়,
ঐ দেখা যায় ঘোলা ম্যাঘ খান
জলদি কইরা আয়।

www.pathagar.com

লোকমেলা

আবহমান বাংলার মেলাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ।

ধর্মীয়

চৈত্রসংক্রান্তি, রথযাত্রা, গাজন, চড়ক, ঝুলন, দোল, অষ্টমী, বারণী, দশহরা, শিবরাত্রি বুদ্ধপূর্ণিমা, মাঘিপূর্ণিমা, মহরম, ঈদ, শবেবরাত, গাজিপির, আঞ্চলিক কোনো লৌকিক দেবতা, দরবেশ, পির বা সন্ন্যাসীর নামে মেলা।

ধর্মনিরপেক্ষ

বিভিন্ন লোকায়ত মেলা: নববর্ষ, কৃষিমেলা, পৌষমেলা, নৌকাবাইচের মেলা, ঘোড়া বা গরু দৌড়ের মেলা, লাঠি খেলার মেলা, কুস্তি প্রতিযোগিতার মেলা, কিংবদন্তির মেলা, পুরানকাহিনীমূলক মেলা, পশু প্রদর্শনীর মেলা, বউরানীর মেলা বা বউ নির্বাচনের মেলা, সহেলা বা সইপাতাবার মেলা, ঘুড়ি উড়ানোর মেলা, কোনো জমিদার, আঞ্চলিক ব্যক্তিত্ব বা কবির নামে মেলা, বিভিন্ন খেলাধুলার মেলা, উৎসব অনুষ্ঠানের নামে মেলা, বইমেলা, কুটির শিল্পের মেলা প্রভৃতি।

এ সকল মেলায় উৎসবমুখর পরিবেশে সম্মিলন ঘটে সৌহার্দ্য, প্রীতি ও প্রেমের। আবহমানকাল ধরে প্রচলিত মেলায় প্রদর্শিত হয় বিভিন্ন আঞ্চলিক পণ্যসামগ্রীর। যাতে প্রতিফলন ঘটে এলাকার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির। মেলায় নানা ধরনের শৌখিন ও নিত্যব্যবহার্য পণ্য বিক্রয়ের পাশাপাশি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদিও হয়ে থাকে। লোকগান, কবিগান, গম্ভীয়া, বিচারগান, পালাগান, যাত্রা, নাটক, গীতি-নকশা, সার্কাস, নাগরদোলা, পুতুল নাচ, চর্কিঘূর্ণি ইত্যাদি লোকসংস্কৃতিভিত্তিক আয়োজন মেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

মেলায় আবহমানকালের কুটির শিল্পজাত পণ্য প্রদর্শিত, বিক্রি হয়। যেমন: বাঁশবেত সামগ্রী, কাঠের খেলনা, পুতুল, বাঁশের বাঁশি, চামড়াজাত দ্রব্যাদি, মৃৎশিল্প, পোড়ামাটির সামগ্রী, হাতপাখা, চালা, চালুনি, পূজার উপকরণ, কাগজের খেলনা ও ফুল, কাঁচের চুড়ি, অলংকার, ফিতা, নকল গয়না, হুক্কা, পাটের শিল্প, শোলার তৈরি খেলনা, তাঁতের কাপড়, মনোহরি দ্রব্যাদি, শামুক ও শঙ্খশিল্প প্রভৃতি।

বিভিন্ন ধরনের লোকজ খাদ্য সামগ্রীর সমাবেশ ঘটে মেলায়। যেমন: পাঁপড় ভাজা, বাদাম, কাজুবাদাম, মুড়ি, মুড়কি, মোয়া, খৈ, খাজা, বাতাসা, কদমা, চিড়া লাড়ু, মিষ্টিজাত খাদ্য, বিভিন্ন প্রকার ফলমূল, পান-মসল্লা ইত্যাদি। মেলা উপলক্ষে কোথাও লাঠিখেলা, গরুরদৌড় ও নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। বিসিকের সূত্র মতে বাংলাদেশে

www.pathagar.com

বিভিন্ন সময়ে ১৩৮৭টি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফরিদপুরে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত মেলার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ফরিদপুর জেলায় অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য মেলা

মেলার নাম	স্থান	উপলক্ষ/পার্বণ	সময়/স্থায়িত্ব
জসীম পল্লীমেলা	অম্বিকাপুর, ফরিদপুর সদর	পল্লীকবির জন্মজয়ন্তী	১জানুয়ারি হতে ১৫ দিন
খাগশানা মেলা	খাগশানা, বোয়ালমারী	কালিপূজা	কালিপূজার দিন হতে ৬ দিন
কাটাগর মেলা	কাটাগর, বোয়ালমারী	দেওয়া সাগর শাহের উৎসব	১২ চৈত্র হতে ৩ দিন
তেলজুরি মেলা	তেলজুরি, বোয়ালমারী	বাৎসরিক নৌকা বাইচ	৯ আশ্বিন
বোয়ালমারীর মেলা	বোয়ালমারী সদর	দুর্গাপূজা	আশ্বিন মাস ১ দিন
কালীনগর মেলা	কালীনগর, বোয়ালমারী	রথযাত্রা	আশ্বিন মাস ১ দিন
সাতৈর মেলা	সাতৈর, বোয়ালমারী	মাঘীপূর্ণিমা	মাঘিপূর্ণিমার দিন হতে ২ দিন
বাজিতপুর মেলা	বাজিতপুর, বোয়ালমারী	চৈত্রসংক্রান্তি	চৈত্রসংক্রান্তির দিন হতে ২ দিন
আলফাডাঙ্গা মেলা	আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর	দুর্গাপূজা	আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী দিন
শিবপুর মেলা	শিবপুর, আলফাডাঙ্গা	লক্ষ্মীপূজা	আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার দিন
তিতুরকান্দি মেলা	তিতুরকান্দি, আলফাডাঙ্গা	নববর্ষ	১ বৈশাখ
সাগরদি মেলা	সাগরদি, নগরকান্দা	বাৎসরিক	১৪ অগ্রাহয়ন হতে ৭ দিন

www.pathagar.com

মুকডবা মেলা	মুকডবা, ভাঙ্গা	অষ্টমীস্নান	চৈত্র মাসের শুক্লাপক্ষের সপ্তমী ও অষ্টমী
ভাঙ্গা মেলা	ভাঙ্গা সদর	বারুণীস্নান	চৈত্র মাসের সপ্তমী স্নানের দিন
কাঁতরা মেলা	কাঁতরা, ভাঙ্গা	রথযাত্রা	১ আষাঢ়
সাতীর মেলা	সাতীর, বোয়ালমারী	বাৎসরিক	১ চৈত্র
নগরকান্দা মেলা	নগরকান্দা সদর	বাৎসরিক	১৪ অগ্রহায়ন
শ্রীঅঙ্গন মেলা	শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর সদর	মহানাম কীর্তন	২ কার্তিক হতে ৮ কার্তিক
রথখোলার মেলা	রথখোলা, ফরিদপুর সদর	দুর্গাপূজা	আশ্বিন মাসে ১ দিন
কাটিয়া কালীবাড়ির মেলা	কাটিয়া, নগরকান্দা	দুর্গাপূজা	আশ্বিন মাসে ১ দিন
বিজয় দিবস মেলা	ফরিদপুর, কোর্ট কম্পাউণ্ড	বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর
বৈশাখি মেলা	ফরিদপুর, কোর্ট কম্পাউণ্ড	বাৎসরিক	নববর্ষ উপলক্ষে ১ দিন
চন্দ্রবাড়ির মেলা	নিখুঁরদি (সদর)	চৈত্রসংক্রান্তি	চৈত্রসংক্রান্তির দিন ১ দিন

ত্রিনাথের মেলা

ত্রিনাথের পূজার আঞ্চলিক নাম ত্রিনাথের মেলা। ত্রিনাথ পন্থিরা তিন দেবতার একই অখণ্ড ব্যক্তিকে পূজা করে। এই তিন দেবতা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ত্রিনাথ হলেন নাথসম্প্রদায়ের গুরু, গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও জালন্ধরী-পা। ত্রিনাথের পূজাকে 'সেবা' বা 'মেলা' বলা হয়। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল এই তিন জগতের অধিশ্বর হলেন ত্রিনাথ। তার উদ্দেশ্যে যে পূজা করা হয় তাতে উপকরণ হিসেবে এক পয়সার পান-সুপারি, একপয়সার তিনটি মাটির প্রদীপ, একপয়সার তিনটি গাঁজার কলকে একদামে ক্রয়

www.pathagar.com

করতে হয়। তবে প্রধান উপকরণ হলো গাঁজা। দেবতাকে নিবেদন করার পর ভক্তগণ তা গ্রহণ করে থাকে। সর্বমঙ্গলের জন্য হিন্দুবাউল একত্রিত হয়ে তিনটি গাঁজার কলকে সাজিয়ে 'বোম ভোলানাথ' বলে সম্মিলিতভাবে গাঁজায় টান দেয়।

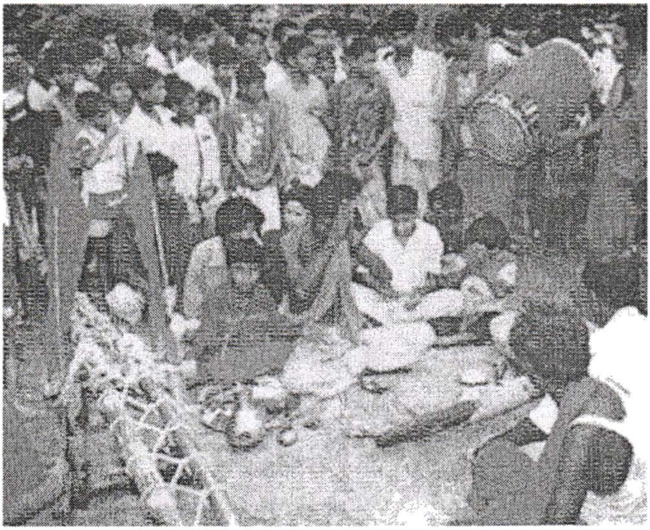

আমার ঠাকুর ত্রিনাথ/যে করিবে হেলা
তার হাত পা খসিয়া যাবে/চোখ দিয়া বের হবে ঢেলা।
দিয়া গাঁজায় দম/বলছে বোম
বোমায় বলে বোম ভোলা/কলিতে ত্রিনাথের মেলা।

www.pathagar.com

লোকাচার

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো ফরিদপুরেও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের লোকাচার। নিম্নে কয়েকটি লোকাচারের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. জামাইষষ্ঠী

ফরিদপুরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় জামাইষষ্ঠী পালন করে। বৈশাখ মাসে আম পাকলে জামাইকে নিমন্ত্রণ করে দুধ-আমসহ বিভিন্ন প্রকার পিঠা-পায়েস খাওয়ানো হয়। ঐ সময় জামাইকে নতুন জামাকাপড় উপহার সামগ্রী হিসেবে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে জামাই মিষ্টি, পান-সুপারি এবং মাছ নিয়ে শ্বশুরালয়ে গমন করে। সেও শাশুড়িকে নতুন কাপড় উপহার দেয়।

২. বিয়ে

ফরিদপুরে দুই ধরনের বিবাহের প্রচলন আছে। এক. অভিভাবক কর্তৃক পাত্র-পাত্রী নির্বাচন। দুই. ছেলে-মেয়ে নিজেদের পছন্দ মতো জীবনসঙ্গী নির্বাচন। বিবাহের বয়স হলেই পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিবাহযোগ্য কন্যা বা পাত্রের জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করেন। তারা আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্র-পাত্রীর বাড়িতে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। এক্ষেত্রে 'ঘটক' নামধারী তৃতীয় ব্যক্তির সহযোগিতা কামনা করা হয়। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পারিবারিক অবস্থা, বংশ, রূপ, গুণ, শিক্ষা, স্বভাব-চরিত্র, কোষ্ঠী, দৈহিক লক্ষণ এবং মানসিক অবস্থা বিচার্য হয়। ফরিদপুরের কোনো কোনো অঞ্চলে ঘটককে নিয়ে পাত্রি দেখার উদ্দেশ্যে গমনকালে সুন্দরী পুত্রবধূ প্রাপ্তির কামনায় ঘটকের পরিধেয় বস্ত্রে একটি লাল কুঁচফল কিংবা রক্তজবাফুল বেঁধে দেয়া হয়। হিন্দু সমাজে পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠী বিচার করা হয়। বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হবার পর তাকে পাকারূপ দেবার উদ্দেশ্যে 'পানচিনি'র আয়োজন করে। কোথাও কোথাও এই অনুষ্ঠান 'সোনাকাপড়' নামে পরিচিত। এই অনুষ্ঠানে কন্যার সামর্থ অনুসারে হাতে আংটি অথবা গলায় 'হার' পড়িয়ে দেয়া হয়। ঐ সময় পনের টাকা, দেনমোহর, কাবিনের টাকা, দেনাপাওনা, যৌতুক বা গিনি দিয়ে কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। কোথাও কোথাও চন্দনের টিপ দেয়া হয। এই সমাজে 'পাটিপত্র' বা লগ্নপত্র করার রীতিও চোখে পড়ে। বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হলে উভয়পক্ষ কেনাকাটা করেন। এই কেনাকাটাকে ফরিদপুরে 'সোহাগপুরা' বলে। হিন্দু বিবাহে 'জায়পত্র' প্রস্তুত করা হয়। ফরিদপুরে বিবাহের অপরাপর অনুষ্ঠান নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ঢেঁকিবরণ (হলুদকোটা)

বিবাহের সাত, নয় বা এগারো দিন পূর্বে বিবাহের লোকাচার শুরু হয়। বিভিন্ন সমাজে 'ঢেঁকিপূজা'র প্রচলন দেখা যায়। বিবাহ উপলক্ষে ধান, হলুদ, মেহেদি ইত্যাদি ঢেঁকিতে প্রস্তুত করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে স্বজনেরা পাত্র-পাত্রীর বাড়িতে আগমন করে সুনির্দিষ্ট লোকাচারের মাধ্যমে ঢেঁকিবরণ করে।

www.pathagar.com

ক্ষৌরকর্মের অনুষ্ঠান

বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীকে ক্ষৌরকর্ম করানো হয়। ফরিদপুর জেলায় বরের পক্ষ থেকে কন্যার বাড়িতে নাপিত পাঠায়। ক্ষৌরকর্মের অনুষ্ঠানে উঠোনে একটি কাঠের পিঁড়ি বা জলচৌকি বসানো হয়। নাপিত এসে পাত্র-পাত্রীর ক্ষৌরকর্ম ও নখ কর্তন করে। আত্মীয়-স্বজন ক্ষৌরকর্মের পর ঘটা করে তাদের গোসল করান। উপস্থিত সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। অনুষ্ঠান সমাপ্তিতে নাপিত অর্থকড়ি, নতুন পোশাক লাভ করে।

গায়েহলুদ

গায়ে হলুদ বিবাহের একটি প্রধান স্ত্রী আচার। মূলত এটি একটি দেহশুদ্ধি অনুষ্ঠান। দেহের উজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য ভেষজ দ্রব্যাদির সঙ্গে দুধের সর মিশ্রণ করা হয়। সুগন্ধির জন্য মেথি, আফসান, আমলা ও গিলার শাঁস মেশানো হয়। কোথাও সুন্দা, গিলা, মেথি ও সরিষা বেঁটে বর-কনের গায়ে লাগানো হয়। ফরিদপুরে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয় বিবাহের দুই তিনদিন পূর্বে। আগে কনের এবং পরে ছেলের গায়ে হলুদ হয়। দুইপক্ষে হলুদের ডালা সাজানোর রেওয়াজ আছে। নতুন কুলা ও ডালা হলুদ, সিঁদুর এবং আলতা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। এতে ধান, দুর্বা, হলুদ, মেহেদি, মেথি, গিলা, আফসান, আমলা প্রভৃতি থাকে। পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষ পরস্পরের বাড়িতে হলুদের ডালা পাঠায়। সর্বপ্রথম পাত্র-পাত্রীর মা দুধের সর মিশ্রিত হলূদ বাটা, গিলা, কপালে স্পর্শ করেন। এরপর চাচি, ফুফু, খালা অথবা অন্যরা তা অনুসরণ করেন। ফরিদপুরের কোনো কোনো অঞ্চলে ঢেঁকিবরণ করে হলুদ কোটার পর পাঁচ/সাতজন এসে সারিবদ্ধভাবে মাথায় আঁচলঢাকা কুলা নিয়ে গোসলের স্থানে যায়। সেখানে মেয়ের মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কী মোছো? মা বলেন, 'সোহাগ মুছি।' এইভাবে মা তাকে সাতবার হলুদ মাখান এবং তা মুছে ফেলেন। এরপর মা মেয়ের মাথায় একঘটি পানি ঢেলে দিয়ে চলে যান।

অধিবাস

হিন্দু সমাজে বিবাহের পূর্বদিন অধিবাস হয়। এ উপলক্ষে বরণডালা, ধান, দুর্বা, হলুদ, চন্দন, পুষ্প, মালা, ঘৃত, দধি প্রভৃতি দ্রব্য সাজানো হয় এবং পৃথক একটি পাত্রে আতপ চাউল রাখা হয়। অধিবাসের স্থান আলপনায় সজ্জিত করা হয়। এই দিন পাত্র-পাত্রী নিরামিষ আহার করে। অধিবাসের দিন বর কনেকে গায়ে হলুদ মাখিয়ে স্নান করানো হয় এবং স্নান শেষে বরের ডান হাতে এবং কন্যার বাম হাতে 'মঙ্গলসূত্র' বেঁধে দেয়া হয়। বরের মা বরের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেন। একে অধিবাসের ফোঁটা বলে। হিন্দু সমাজে 'চোরপানি' বা জলতোলা আচার পালনের রেওয়াজ রয়েছে।

আইবুড়ো ভাত

ফরিদপুরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে আইবুড়ো ভাতের প্রচলন রয়েছে। হিন্দু বিবাহে পঞ্চব্যঞ্জন, পরমান্ন এবং মুসলমান সমাজে ক্ষীর, নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। বর-কনের আত্মীয়-স্বজন পালাক্রমে বর কনেকে নিমন্ত্রণ করেন। এই অনুষ্ঠানে 'সোহাগমাখা' নামক স্ত্রী আচার চোখে পড়ে।

www.pathagar.com

পানিভরণ অনুষ্ঠান

ফরিদপুরে পানিভরণ, কোথাও জলসাহা নামক স্ত্রী আচার অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানে বর-কনেকে ত্রয়োস্ত্রীরা গোসল করান। একটি জলচৌকি বা পিঁড়ির উপর বসিয়ে বর-কনেকে গোসল দেয়া হয়।

বরসজ্জা

মুসলমান সমাজে বরকে গোসলের পর নতুন পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়ে গলায় মালা ও মাথায় পাগড়ি বা টুপি পড়ানো হয়। হিন্দু সমাজে বরের মাথায় শোলার তৈরি টোপর বা মুকুট, ললাটে চন্দন ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা, হাতে মঙ্গলসূত্র এবং জাঁতি বা সাজদপন দেখা যায়। বর সাজানোর পর একটা বড় থালায় দুধভাত দেয়া হয়। প্রথমে বরের মা তাকে তিন লোকমা ভাত খাওয়ান, ফরিদপুরে একে 'ক্ষীরপূজনী' বলে।

বরযাত্রা

ফরিদপুর অঞ্চলে বরযাত্রার প্রাক্কালে পাত্র তার মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মা তাকে 'দুধের ধার শোধ' করার কথা বলে। ছেলে বিবাহ করে ফিরে এসে মাতৃদুগ্ধের ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বলে, সে মায়ের জন্য দাসি আনতে যাচ্ছে। মা তখন তাকে দাসি নয়, দোসর বা গৃহের লক্ষ্মী আনার কথা বলে। মা ছেলেকে কোলে বসিয়ে এক গ্লাস চিনিমিশ্রিত দুধ খাওয়ান এবং আদর করে কপালে চুম্বন করেন। ঐ দিন ছেলের মা রোজা রাখেন। হিন্দু সমাজে বরযাত্রী বাড়ি থেকে বের হবার সময় উলু ধ্বনি দেয়।

বরাগমন

বরের আগমন বার্তা শোনামাত্রই হিন্দুমতে শঙ্খধ্বনি এবং উলুধ্বনি দেয়া হয়। 'শুভবিবাহ' লেখা সুদৃশ্য তোরণের কাছে অপেক্ষারত কন্যাপক্ষের লোকেরা পথ আগলিয়ে তর্কযুদ্ধ করেন। দাবি মিটানোর পর বরযাত্রীদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে বসানো হয়। হিন্দুমতে বরকে ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে বর আগমনের পূর্বক্ষণ থেকে কনে দুগ্ধপূর্ণ গামলায় হাত ডুবিয়ে বসে থাকে। বর আসার খবর শোনার পর গামলা থেকে হাত তোলা হয়। ফরিদপুরের কোথাও কোথাও কন্যার মাতা ত্রয়োগণসহ পঞ্চপ্রদীপ ও বরণকুলা দিয়ে জামাতা বরণ করেন। বিবাহপিঁড়িতে পূর্বামুখী আসীন জামাতার মুখে পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিয়ে তার মুখদর্শন করেন এবং বরণকুলা তার কপালে স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেন। বর তাকে প্রণাম করেন।

ছাদনাতলা

হিন্দুসমাজের বিবাহে যেখানে কন্যা সম্প্রদানের বিভিন্ন কার্যবিধি সম্পাদিত হয় সেই স্থানকে 'ছাদনাতলা' বলা হয়। কোথাও একে 'কলতলা'ও বলে। ছাদনাতলার জন্য নির্দিষ্টস্থান লেপেমুছে আলপনা আঁকা হয়। এর চারপাশে চারটি ছোট আকারের কলাগাছ পোঁতা হয়। এই স্থানে সম্প্রদানের অব্যবহিত পূর্বে কন্যা বরকে দক্ষিণাবর্তে রেখে সাতবার প্রদক্ষিণ করে এবং তাদের শুভদৃষ্টি বিনিময় হয়। মুসলমান বিবাহে বরের বসার জন্য একটি বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করা হয়। সেই স্থানটি রঙিন কাগজ, দেবদারু গাছের পাতা অথবা অন্য কোনো উপকরণের সাহায্যে সজ্জিত করা হয়।

www.pathagar.com

বিবাহের মূলকার্যাদি (বরার্চনা)

মুসলমান মতে, বরকে পশ্চিমমুখী করে বসানো হয়। তার সামনে সুসজ্জিত একটি বালিশ থাকে। বর রুমাল মুখে নীরবে বসে থাকে। সহযাত্রীরা কন্যাপক্ষের লোকদের সঙ্গে বিয়ের শর্তাদি, দেনমোহর, মাসিক খরপোষ ঠিক করে কাবিনামা লিপিবদ্ধ করেন। মেয়ের সম্মতি গ্রহণের জন্য একজন উকিল ও দুইজন সাক্ষী অন্দরমহলে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কন্যার সম্মতি চান। তিনবার স্পষ্টবাক্যে কন্যা সম্মতি গ্রহণ করার পর তারা বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রত্যাবর্তন করেন। অনুরূপভাবে বরের মতামত গ্রহণ করে ধর্মীয়রীতি অনুসারে সুরা-কিতাব উচ্চারণ করে বিবাহ পড়ানো হয়।

হিন্দুমতে বরকে সম্প্রদানের স্থানে আনা হয়। নিকটে বরসজ্জা ও শালগম এবং মধ্যস্থান অধিবাসের ঘট থাকে। শুভলগ্নে বর এসে সম্প্রদানস্থানে উপবেশন করলে সম্প্রদাতা তাকে পুণ্যাহবাচন উচ্চারণ করে গন্ধপুষ্প ও বস্ত্রাদি দিয়ে অর্চনা করেন। বরকে নববস্ত্র ও আঙ্গুরীয় পড়ানো হয়। অতঃপর ছাদনাতলায় নিয়ে বিবিধ স্ত্রী আচার সম্পন্ন করা হয়। পরে ছাদনাতলায় কন্যা আনায়ন, বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ ও মুখচন্দিকা বা শুভদৃষ্টি করানো হয়।

কন্যা সম্প্রদান

বিবাহকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর বরকে অন্দরমহলে এনে সামনাসামনি দুটি পিঁড়িতে কন্যা ও বরকে বসানো হয়। তাদের মাঝখানে একটি কাপড় থাকে। কন্যা পক্ষ সেই পর্দা তুলে নেওয়ার পর উভয়ের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়। এটিই "শাহনজর"। শাহনজর হবার পর বরের কেনি আঙুল ধরে কন্যাকে ঘরে মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। উভয়কে পাশাপাশি বসিয়ে উভয়ের সামনে একটি আয়না ধরা হয় তখন উভয় দ্বিতীয়বার শুভদৃষ্টি বিনিময় করে। এরপর আংটির সাহায্যে উভয় উভয়কে ক্ষীর বা পায়েশ খাওয়ায়। একে ফরিদপুরে 'ক্ষীরপূজনী' বলে। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে পরিচয় পর্ব শুরু হয়। তখন বরপক্ষ কনেপক্ষের পরিচায়কারীকে সেলামি প্রদান করে। কন্যাপক্ষও বরকে উপহার সামগ্রী প্রদান করে। একে 'সিহারাবাঁধা' বলে।

হিন্দু বিয়েতে বর-কন্যাকে ঘরে এনে দুখানি পিঁড়িতে বসানো হয়। এই সময় মেয়েরা উলুধ্বনি দেয়। তারপর কন্যাপক্ষের ত্রয়োস্ত্রীগণ একটি প্রদীপ ঘুরিয়ে বরের মুখ দর্শন করেন। বরের আনীত শাঁখা, সিঁদুর, বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হয়ে কনে কোনা আত্মীয়ের কোলে উঠে বরের সামনে হাজির হয়। তার হাতে জলের ঝারি দেয়া হয়। বরকে প্রণাম করে সে তার পায়ে জল ঢেলে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। তারপর আঁচল দিয়ে তার পা মুছিয়ে দেয়। বর কনে সামনাসামনি পিঁড়িতে বসে পরস্পরের মধ্যে শুভদৃষ্টি হয়। এরপর পিতা কন্যাকে বৈদিকশাস্ত্রাদি পাঠ করে জামাতার হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন। শুভদৃষ্টি বা মুখচন্দ্রিকার পর উভয়ের মধ্যে মালা বদল হয়।

পাশাখেলা

ফরিদপুর জেলায় হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে পাশাখেলার প্রচলন রয়েছে। বর-বধূ পাশাখেলার সময় একটি পাটিতে বসে। মাটির পাত্রে ধান কিংবা পানের উপর কতগুলি কড়ি রেখে একটি সরায় তা ঢেকে দেয়া হয়। পালাক্রমে একবার বর ও একবার বধূ

www.pathagar.com

সেগুলি পাটির উপর ঢেলে দেয় এবং তুলে নেয়। বধূর বান্ধবী এবং ত্রয়োস্ত্রীরা গণনা করে এবং হারজিতের হিসাব রাখে।

কন্যার পতিগৃহে যাত্রা (কন্যা বিদায়)

কন্যার পতিগৃহে যাত্রা অর্থাৎ কন্যা বিদায়ের ক্ষণ অত্যন্ত বেদনাময় এবং মর্মস্পর্শী। স্ত্রী আচার পালনের মধ্য দিয়ে কন্যা বিদায় সম্পন্ন হয়। মুসলমান পরিবারে বিদায়ের পূর্বক্ষণে বর-কনে বাস্তুঘরের দুয়ারে বসে। এয়োরা তাদের সামনে ধান-দুর্বা ডালা ধরে। বর কনের ডান হাত ধরে বসে। কন্যা ডালা থেকে ধান-দুর্বা নিয়ে মাথার উপর দিয়ে পেছনে ফেলে দেয়। এইভাবে তিনবার করে। কন্যা বিদায়ের প্রাক্কালে তার আঁচলে সুপারি বেঁধে দেয়া হয় এবং তার সঙ্গে ডাব ও এক বদনা পানি দেয়ার লোকাচার চালু আছে। নববধূর সঙ্গে দুই-তিনজন মেয়েও পাঠানো হয়। হিন্দু বিবাহে যাত্রাকালে বর-কনে গৃহদ্বারে দুটি আলপনাযুক্ত পিঁড়িতে বসে। তাদের সামনে মঙ্গলঘট, মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ধান-দুর্বা থাকে। অনুরূপভাবে মুষ্টিধান পেছনে ফেলে দেয়া হয়। পর পর তিনবার এই কাজটি করা হয়। এতে নাকি পিতৃগৃহের ঋণ শোধ হয়।

বধূবরণ

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে বধূবরণ সাড়ম্বরে পালিত হয়। বর যখন নববধূকে নিয়ে নিজ গৃহে আগমন করে তখন এক পিঁড়িতে দুজনকে দাঁড় করিয়ে প্রথমে পুত্রের ও পরে বধূর মাথায় তিন মুষ্টি ধান দিয়ে মাতা এবং পরে অন্যান্যরা বরণ করে। হিন্দু সমাজে শাঁখ বাজে, উলুধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়। বরণকুলায় সজ্জিত বিবিধ মঙ্গলদ্রব্যের দ্বারা বর ও বধূকে বরণ করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। যাবার পথে ঘরের মেঝে হতে দরজাপর্যন্ত কাপড় বিছানো থাকে, বর-বধূ তা মাড়িয়ে যায়। বধূ আগে থাকে, বর পেছনে, হাতের জাঁতি দিয়ে সে বধূর মাথা হতে দু-চারটি করে ধান সেই কাপড়ে ফেলে দেয়। ত্রয়োস্ত্রীরা নববধূর মুখে চিনি-সন্দেশ দেন। ফরিদপুরের কোথাও কোথাও নববধূ ও বরকে পালকি থেকে নামিয়ে ধান-দুর্বা দিয়ে বরণ করে বধূকে কোলে করে চাদর বিছানো পথ দিয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদেরকে ঘরে এনে পশ্চিমমুখী করে বসানো হয়। এরপর নববধূর মুখদর্শনের পালা শুরু হয়। আত্মীয়-স্বজনেরা নববধূর মুখ দর্শন করে টাকা পয়সা উপহার দেন।

কালরাত্রি ও ফুলসজ্জা (বাসররাত)

নববধূর পতিগৃহে আগমনের দিবাগত রাত্রি হলো কালরাত্রি। ফরিদপুর অঞ্চলে মুসলমান সমাজে কালরাত্রিতে সংযম পালনের রেওয়াজ আছে। অর্থাৎ ঐদিন স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন হয় না। ফুলসজ্জার রাতই বাসররাত। হিন্দুবিবাহে প্রায়শ কন্যার পিতৃগৃহে এটি করা হয়। মুসলমান সমাজে বরের নিজ বাড়িতে। কালরাত্রির পরে আসে এই রাত। বলা বাহুল্য, এই রাত থেকে দাম্পত্যজীবন শুরু। এই রাতে নববধূর ভরণপোষণের অঙ্গীকার করা হয়। অনেক স্বামী তার নববধূর নিকট থেকে দেনমোহরের দাবি মওকুফ না করিয়ে তাকে স্পর্শ করে না।

www.pathagar.com

বাসিগোসল বা বাসিবিবাহ

ফুলসজ্জা বা বাসর জাগার পরদিন মুসলমান সমাজে বাসিগোসল হয়। বউকে হলুদ শাড়ি পরানো হয়। প্রাতঃভোজনের পর অর্থাৎ বেলা নয়টা-দশটার মধ্যে সাধারণত বাসিগোসলের সময়। বরের ভাবী, বোন মূলত বর কনেকে গোসল করিয়ে থাকে। অন্দরমহলে একটি পিঁড়িতে বরবধূকে পাশাপাশি বসানো হয়। কাঁসার থালায় দুধ, পানি, কাঁচা হলুদ, দুর্বা প্রভৃতি রাখা হয়। আনন্দ উৎসবের মধ্যে গোসলকর্ম সম্পন্ন করা হয়। তারপর তাদের বরণ করে ঘরে তোলা হয়। ঘরে তোলার সময় বরের যাত্রা পথে মাটির সরা বসানো থাকে যা মাড়িয়ে/ভেঙ্গে বর ঘরে প্রবেশ করে। বিশ্বাস, সরা ভেঙে যে কয়খণ্ড হবে ততগুলি সন্তান হবে। হিন্দুমতে, বর-কন্যাকে গায়ে হলুদের পর স্নান করানো হয়। আটদিন পর্যন্ত হলুদের রেশ থাকে বলে সাবান দিয়ে গোসল করানো নিষেধ। স্নানপর্বে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়া হয়। স্বামীর জীবিতাবস্থায় স্ত্রীলোকের সিঁথিতে সিঁদুর স্থায়ী থাকে।

বৌভাত

বিবাহের তৃতীয় দিনে বরের বাড়িতে বউভাতের আয়োজন করা হয়। বরের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। নববধূকে 'পাক' স্পর্শ করানোর রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। বধূকে অন্দরমহলে সুন্দর করে সাজিয়ে একটি চেয়ারে বসানো হয়। তার সামনে পান-সুপারি ভর্তি একখানা পানদানি থাকে। বধূদর্শন করে তার হাতে টাকা-পয়সা, গয়না ও উপহার সামগ্রী দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়।

মেলানি বা ফিরানি

বৌভাত সমাপ্তির পর নববধূকে কন্যার বাপের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। একে 'মেলানি' বা 'ফিরানি' বলে। হিন্দু পরিবারে বর এসে আটদিন কন্যার পিত্রালয়ে অবস্থান করে। এই অবস্থানকে 'অষ্টমঙ্গলা' বলা হয়। মুসলিম সমাজে চার থেকে পাঁচদিন কন্যার বাড়িতে অবস্থানের লৌকিক আচার লক্ষ করা যায়।

৩. অন্নপ্রাশন

হিন্দু শাস্ত্র মতে, জন্মের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে পুত্রের এবং পঞ্চম বা সপ্তম মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন করার নিয়ম। বৌদ্ধ সমাজে পঞ্চম বা নবম মাসে ভাত ছোঁয়ানি বা অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম সামজে পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে শিশুর অন্নপ্রাশন বা মুখে ভাত দেয়ার নিয়ম পালিত হয়। অন্নপ্রাশনের আগে শিশুকে অন্ন জাতীয় কোনো আহার্য দেয়া হয় না। অন্নপ্রাশনের দিনে শিশুর মাতা শিশুর মুখে আহার দেয়ার পর আঁচল দিয়ে শিশুর মুখ মুছিয়ে দেয়।

ফরিদপুরে অন্নপ্রাশনের পূর্বে শিশুর মস্তক মুণ্ডন করা হয়। পিঁড়ির উপর বসিয়ে তেল হলুদে গোসল করিয়ে নতুন লাল গামছা, নতুন তাগা, চন্দন ও কাজল পরানো হয়। স্নানের দুটি থালায় যাবতীয় উপকরণাদি রাখা হয়। একটি থালা দেওয়া হয় দাইকে। অপর থালায় রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যাদি থেকে একটু একটু করে শিশুর মুখ দেয়া

www.pathagar.com

হয়। হিন্দু মতে, পুরোহিত পূজোর কাজ সম্পন্ন করেন। বেলা শেষে একটি থালায় একখণ্ড মাটি, একটি টাকা, বই-খাতা, পেন্সিল, দোয়াত-কলম রাখা হয়। তারপর বাজনা বাজিয়ে শিশুকে বাড়ির চারিদিকে কিংবা বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়ে থালার সামনে এনে বসায় এবং থালায় রক্ষিত দ্রব্যাদি শিশুর হাতে দেয়া হয়। পর্যায়ক্রমে মুসলিম সম্প্রদায় 'আকিকা' পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রে সুন্নতে খাতনা দেয়া হয়।

৪. ছয়হ্যাটুরে বা নামকরণ

নবজাতকের জন্মের ছয়দিনে, কখনো নয় দিনে ছয়হ্যাটুরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি মূলত একটি নামকরণ অনুষ্ঠান। সচ্ছল পরিবার এই অনুষ্ঠানে 'আকিকার' আয়োজন করে। মুসলিম পরিবারে মৌলবি ডেকে কুরাআন কেতাব দেখে আল্লাহর ৯৯ নামের মধ্য থেকে নাম বাছাই করা হয়।

৫. সুন্নতে খাতনা

ফরিদপুর অঞ্চলে সাধারণত হাজাম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে সুন্নতে খাতনা করা হয়। হাজাম শিস্ন কর্তনের সময় সহযোগীরা দুহাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে রাখে এবং হাজাম উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবর' বলে শিস্ন কর্তন করে। হাজাম শিস্ন কর্তনের পর পোড়ামাটির গুড়া দিয়ে কাপড়ের সাহায্যে ব্যান্ডেজ করে। ৪ থেকে ৫ দিন ঘিয়েভাজা, দোভাজা চিড়া খাওয়ানো হয়। এই সময় বালিভর্তি পুটুলি বরই গাছের খড়ি পুড়িয়ে তৈরিকৃত আগুনে গরম করে কর্তনকৃত শিস্নে ছ্যাক দেয়া হয়। লোকবিশ্বাস, এতে যথাশীঘ্র ঘা শুকিয়ে যায়। সুন্নতে খাতনা অনুষ্ঠানটি ঘটা করে আয়োজন করা হয়। পঞ্চম দিবসে বিভিন্ন মেয়েলি আচার অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে ছেলেকে গরম পানিতে গোসল করিয়ে নতুন জামা কাপড় পরিধান করানো হয়। ঐদিন জ্ঞাতী-গোষ্ঠীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। দাওয়াতিরা উপহার সামগ্রী নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। মেয়ে মহলে মেয়েলি গীত পরিবেশনের পাশাপাশি 'চোরপুলিশ' খেলা হয়। কারো কারো বাড়িতে রং খেলার পাশাপাশি কাদামাটি খেলা হয়। উল্লেখ্য যে, ফরিদপুরে দুধরনের হাজাম রয়েছে। একশ্রেণির হাজাম একাই সুন্নতে খাতনা করে। আরেক শ্রেণি দলবদ্ধভাবে একাজে অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ তার সহযোগীরা শিস্ন কর্তনের সময় নেচে নেচে গান পরিবেশন করতে থাকে এবং হাজাম তখন শিস্ন কর্তন করে। এই শ্রেণির হাজামকে 'নাচনাহাজাম' বলে। সুন্নতে খাতনা অনুষ্ঠানটি গ্রামাঞ্চলে একটি উৎসবমুখর আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান।

৬. ভাদ্রমঙ্গল চণ্ডি

নববধূ ভাদ্রমাসে তার পিত্রালয়ে অবস্থান করে। এই অবস্থানই ভাদ্রচণ্ডি। কোথাও 'ভাদ্ররমঙ্গলচণ্ডি' নামে পরিচিত। ভাদ্র মাস শুরুর আগ থেকেই নববধূকে তার পিত্রালয়ে নাউয়র নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সারামাস তার পিত্রালয়ে অবস্থান করে। হিন্দু পরিবারে এই প্রবণতা বেশি। অবশ্য অনেক মুসলমান পরিবারেও 'ভাদ্রমঙ্গলচণ্ডি' পালন

www.pathagar.com

করতে দেখা যায়। বিবাহ হবার পর প্রথম ভাদ্র মাসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা করতে দেয়া হয় না। তাদের ধারণা, প্রথম ভাদ্রমাসে স্বামী-স্ত্রীর দেখাদেখি হলে এই দম্পতির অমঙ্গল হয়। স্ত্রীর মুখোদর্শন করলে স্বামীর চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। সংসারে অভাব-অনটন দেখা যায়। এই কারণে একমাস নববধূ বা সন্তানসম্ভবা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে। আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে জামাই বধূ নেয়ার জন্য শ্বশুরালয়ে আসে, তখন তাকে তালের পিঠাসহ বিভিন্ন ধরনের পিঠা খাওয়ানো হয় এবং উপহার সামগ্রী হিসেবে নতুন জামা-কাপড় দেয়া হয়।

৭. কৃষকের লোকাচার

১.

ধান বোনার দিন বেলা ওঠার আগে হালচাষের গরুগুলোকে গোসল করানো হয়। গৃহস্থ নিজেও গোসল করে। হাল জোড়ার আগে বীজধান থেকে কিছু ধান নিয়ে ঢেঁকিতে কুটে গরুকে খেতে দেয়। তারপর মাঠে লাঙ্গল নামায় এবং চাষ শেষে বীজ বোনা হয়। বীজ বোনার আগে মাঠে পানি ছিটিয়ে দেয়। ধানের শীষে দুধ এলে কোথাও কোথাও সাধ দেওয়া হয়। কৃষকেরা মাঠে ধান কাটার আগে 'আগধান' কেটে নিয়ে কেউ ঘরের মধ্যখানে ঝুলিয়ে রাখে, কেউ বড়ঘরের মাচায় তুলে রাখে। কোনো কোনো অঞ্চলে আগধান থেকে কিছু ধান নিয়ে ঢেঁকিতে ভেনে চাল করে নয়াভাত বা নবান্ন তৈরি করে প্রথমে কোনো গৃহদেবী, দরগা বা পিরবাড়ি শিন্নি দেওয়া হয়। যে দিন ধানকাটা শেষ হয় সেদিন কিছুটা ধানের ডগা রেখে বাকি ধান কেটে একসঙ্গে আঁটি করে বেঁধে বাড়ি নেওয়া হয়।

২.

ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকেরা বিনা পারিশ্রমিকে শুধু অনুরোধে এক কৃষক অপর কৃষকের জমি চাষ করে দেয়। একে 'নিয়ারানেওয়া' (on request) বলে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনে এক কৃষক তার স্বগোত্রীয় অপর কৃষককে তার জমি চাষ করে দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানায়। এভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে জমিতে দশ-বারো জোড়া লাঙ্গল নামে। বিনিময়ে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

৩.

ধান কাটার মওসুমে একশ্রেণির লোক সংঘবদ্ধভাবে গেরস্তের বাড়িতে এসে ধান কাটে। পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা-পয়সা নয়, ধান সংগ্রহ করা হয়। এটাই ভাগাধান কাটা। অর্থাৎ ধান কেটে ধান সংগ্রহ। দেখা যায়, ধানপাকার পূর্বে কৃষকদের দলনেতা অন্য অঞ্চলের গেরস্তের বাড়িতে এসে তার জমিতে লাগানো ধান কেটে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায় এবং একে অপরের মধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ধান পাকলে তারই নেতৃত্বে গেরস্তের বাড়িতে এসে গেরস্তের চাহিদা অনুসারে লোকবল সরবরাহ করা হয়। দিনের বেলা ধান

www.pathagar.com

কেটে রাত্রিবেলা ধান মাড়াই করা হয়। দশ থেকে পনেরো দিন ধান যথাসময়ে কাটা ও মাড়াই করা শেষ হলে কে কতভাগ ধান পাবে তার হিসাব-নিকাশ করা হয়। ঐ দিন 'ভাগাওঠার' রেওয়াজ আছে। অর্থাৎ গেরস্ত কতভাগ বা কত দামা ধান পাবে এবং শ্রমিকেরা কতভাগ তা নির্ধারণ করা হয়। ভাগের পরিমাণ প্রায় সকল পাড়ায় একই রকম হতে দেখা যায়।

৪.

ফরিদপুরের কৃষকসমাজে অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্পদ ও প্রাণহানীর কারণ ঘটায়। অনাবৃষ্টি নিরসনের জন্য লোকায়ত সমাজে 'ব্যাঙবিয়া', 'পুতুলবিয়া', 'বদনা বিয়া', 'মেঘরাজারা গান', 'হুদমা দেওয়ার গান, মানিক পিরের জারি, নৈলাগানের প্রচলন রয়েছে।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

আমরা জানি, পুকুর ভরা মাছ এবং গোয়ালভরা গরু গ্রামীণ ঐতিহ্য। ফরিদপুরের প্রাচীন গ্রাম মাছে, ভাতে পরিপূর্ণ ছিল। এই ভাত খাওয়ার অভ্যাস ও সংস্কার অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর দান। উচ্চবিত্ত কি নিম্নবিত্ত সকলের প্রিয়খাদ্য ভাত। ভাত তৈরির উপকরণ হচ্ছে ধান যা অতীতকাল থেকেই চাষাবাদ করা হচ্ছে। ফরিদপুরের গ্রামীণ ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচিত্র রকমের ধান আবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। আনন্দনাথ রায়ের 'ফরিদপুরের ইতিহাস (প্রকাশকাল- ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে এ অঞ্চলের বাহারি ধানের নাম পাওয়া যায়। যেমন : বাঘা, লেপা, মহিষকান্দি, বালিয়াবেত, বানসামর্থ, লক্ষ্মীদিঘা, দাদকালাম, লক্ষ্মীকাজা, ললজ, রাঙ্গীললজ, ঝুল, ধুলাই, বাগবাই, দলকচু, গিলা সইতা, গেবরুয়া, ভোজনকপূর, বয়রা, কালাপুরা, গন্ধকস্তুরি, পিটীরাজ (পাতিরাজ), মাইচাল, কাঁচকলঙ্গা, বড়দিঘা, বোর, ষাইঠা, শ্রীবইলাম, বাগুনবিচি, রাজামোড়ল, হইলনে, কালামানিক, গবেশ্বর, খাইরামটর, গইরাকাজলা। বর্তমানে এ অঞ্চলে আমন, আউশ এবং বোরো এই তিন শ্রেণির ধান চাষ করা হয়। পূর্বে বেশিরভাগ জমিতে এক ফসল করা হতো।

গাঙ্গের উপত্যকার পলিমাটিতে উৎপন্ন ফসল ও শাকসবজির এলাকা ফরিদপুর। এখানকার অসংখ্য খাল-বিল, নদী-নালা এবং পুকুর বা জলাশয়ে বিচিত্র ধরনের মাছ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানকার মানুষেরা দিন-রাতে সাধারণত তিনবার আহার করে। অসচ্ছল পরিবারে সকালে কাঁচা মরিচ, পিয়াজ-লবণ; বেগুন ভর্তা, আলুভর্তা, ডাল বা বাসি তরকারি সহযোগে পান্তা খায়। কোনো কোনো পরিবারে গমের রুটি, চাপড়ি, ডাল-চালের খিচুরি, সবজি খিচুরি, ফেনাভাত, মটরশুটি, ডিম দিয়ে ভাজাভাত খায়। জলখাবার হিসেবে চিড়ামুড়ি, খই-মুড়কি, দুধচিড়া, দুধকলা, নারিকেলের নাড়ু, টেপের খই এর প্রচলন রয়েছে। দুপুর এবং রাতের খাবারই প্রধান। খাদ্য তালিকায়- ভাত, মাছ, ডাল, শাক-সবজি ও মাংস থাকে। বিভিন্ন ধরনের মাছের ঝোল বা উস্তা, কুমড়া, পোটল, ঝিঙ্গা ভাজি, কচু, কচুলতা, কলার মোচা, ভাজা সীমবীচি, কাঁঠালের বীচির চরচরি, কলমিশাক, ডাটা ও ডাটাশাক, শশা, পেপে, সীম, বরবটির বিচিত্র নিরামিষ বা চরচরি, মুগডালের মুড়িঘন্ট, চিতল মাছের কোফতা, সর্ষে বাটা ইলিশ, নারিকেলের দুধে চিংড়ি, মাছের শুটকি, কাঁচকলা, বেগুন, পেপে, আলু, ডালভর্তা, ডালবড়া, বেসম মাখানো বকফুল, কাকরুল, কুমড়ো ফুল, কাঁচা আম করমচা-কামরাঙ্গা মিশ্রিত ডাল, কচি পাটশাকের ডাল, সজনে ডাটা, পাঁচফোড়নের ডাল, কলার থোড়, নটেশাখের বড়া, কচি কুমড়োর ঝোল, ঝালের নাড়ু, পালংশাক প্রভৃতি রীতিমত লোভনীয় মধ্যবিত্তের খাবার। এছাড়া জলপাই টক, কাসুন্দি, কুল-করমচা, জলপাই, আমের আচার, আম বা চালকুমড়োর মোরব্বা খাদ্য রুচিতে পরিবর্তন আনে।

www.pathagar.com

আখের গুড়ের পাটালি, তালের গুড়, খেজুরের ঝোলাপুড়, হাজারিগুড়, দানাগুড়, আমসত্ব, আম-কলা-সবেদা মিশ্রিত দুধভাত খাবার প্রথা চালু আছে।

আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে বিয়ে-শাদি, সুন্নতে খাতনা, কুলখানি-চল্লিশায় ঘৃত মিশ্রিত পোলাও, কুরমা, মাছ-মাংস, পায়েস, দধি, মিষ্টি পরিবেশন করা হয়। হিন্দুসম্প্রদায় তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে মাংসের পরিবর্তে বড় মাছ ও পঞ্চব্যঞ্জনের আয়োজন করে। তাদের সকল আয়োজনে দধি-মিষ্টির বিপুল সমাহার থাকে। পূর্বে এসকল অনুষ্ঠানে কলার পাতায় খাবার পরিবেশন করা হতো। মুসলমান সম্প্রদায় কলার পাতার ভেতরের অংশ এবং হিন্দু সম্প্রদায় বাইরের অংশ ব্যবহার করত। বর্তমানে ডেকোরেটর থেকে কাঁচের, স্টিলের অথবা সিরামিকের থালা-বাসন সংগ্রহ করা হয়। খাবার শেষে খয়ের-চুন-সুপারি সহযোগে পান খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। কেউ বা হুক্কা, বিড়ি-সিগারেট পান করত।

১. পিঠাপুলি

পিঠাপুলি এতদঞ্চলের উল্লেখযোগ্য খাবার। সারা বছর কিছু কিছু পিঠাপুলির আয়োজন করা হলেও শীতকালে, নবান্নে, ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিকে পিঠাপুলি তৈরির ধুম পড়ে যায়। ঋতুভেদে শীতকালে রসের পিঠা, বর্ষায় তেলের ভাজা পিঠা তৈরি করা হয়। পিঠা তৈরির প্রধান উপকরণ আতপ চাউল পানিতে ভিজিয়ে নরম করে ঢেঁকিতে কুটে গুড়ি করা হয়। খেজুরের রসের গুড়, ঘনদুধ, নারিকেল, তেল ইত্যাদি পিঠা তৈরির মূল উপকরণ। পরিবারের সকলের হাতে সাধারণত পিঠার মান ভালো হয় না। মা-খালা, বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে সাধারণত সুস্বাদু পিঠা তৈরি হয়। নির্দিষ্ট ধানের চাউল, দিন-ক্ষণ বেছে নিয়ে পিঠা তৈরি করতে হয়। লোকবিশ্বাস : একশ্রেণির মন্ত্রতন্ত্র জানা লোক পিঠা তৈরির গন্ধ পেলেই মন্ত্র যপে পিঠা নষ্ট করে দেয়। তাই পিঠা তৈরি করতে অনেক সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

ফরিদপুরের উল্লেখযোগ্য পিঠাপুলি হলো : চিতোই, দুধ চিতোই, পাটি-সাপটা, দুধকদু, তালাপিঠা, তালবড়া, আন্দোশা, ধুপিপিঠা, রুটি, ছিটরুটি, দুধপুলি, কাটাপিঠা, ক্ষীরপুলি, ক্ষীরমুরলী, পাকান (পুলি), কুলিপিঠা, ক্ষীরের কুলি, দুধকুলি, নারিকেলের কলসীপিঠা, চন্দ্রপুলি, শেত্তইপিঠা, ঝাল শেত্তই, সমসাপিঠা, হাজারিগুড়ের পায়েস, তাল বা খেজুরের রসের পায়েস, কাঁচা রসের ক্ষীর, দুধসিন্নি, দুধবরফি, কাউনের ক্ষীর, দুধশেমাই, ফির্নি, জর্দা, পুডিং, হালুয়া প্রভৃতি।

ফরিদপুরের ময়রার দোকানে বিচিত্র ধরনের পাকা মিষ্টি তৈরি হয়। যেমন : কাচাগোল্লা, রসগোল্লা, দধি, বরফিসন্দেশ, রসমালাই, পানতুয়া, কালোজাম, ছানার সন্দেশ, ছানার জিলাপি, মোহনভোগ, লালমোহন, কমলাভোগ, ছানামুখী, ক্ষীরের চমচম, গুড়ের সন্দেশ, দানাদার, খাজা, গজা, জিলাপি, আমেত্তি, বুন্দা, শাহীজিলাপি প্রভৃতি। এতদঞ্চলের মধ্যে কামারখালী ও বাগাটের দধি, মিষ্টি, ফরিদপুর ময়রা পাট্টির চমচম, রাজভোগ, রসগোল্লা, দানাদার, আলফাডাঙ্গার কাচাগোল্লা, ভাঙ্গার লেংচা, রসগোল্লা ও রাজভোগ এবং মুন্সীবাজারের গুড়ের সন্দেশ প্রসিদ্ধ।

www.pathagar.com

ফরিদপুরের লোক খাদ্য তালিকায় প্রচলিত বা অপ্রচলিত ফলফলাদীর মধ্যে রয়েছে : ছিটকিফল, বেতুল, চামফল, কাউফল, বিলিম্বি, জিলিপি ফল, বেতফল, ডোয়া, মহুয়া, নলিজাম, ক্ষুদিজাম, সরবতি, কৈতর, পিছিন্দি, আঁশফল, আমড়া, কাউবাদাম, অরবড়ই, ট্যাংফল, বনতারা, করমজা, রক্তগোল্লা, পানিফল, ডোওয়া, সরুফা, আতাফল, সফেদা প্রভৃতি।

২. বাগাটের দধি-মিষ্টি

ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার বাগাটে দধি-মিষ্টির কারুপাড়া গড়ে ওঠেছে। এ-অঞ্চলের প্রায় শতাধিক লোক এই পেশার সঙ্গে জড়ত। এদের উৎপাদিত বিভিন্ন জাতের মিষ্টি দ্রব্যাদি দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়। বিশেষ করে বিয়ে-সাদিতে বাগাটের দধির তুলনা হয় না। এখানকার বাগাট মিষ্টান্ন ভাণ্ডা এবং রাজকুমার মিষ্টি ভাণ্ডার তুলনামূলকভাবে প্রসিদ্ধ। ফরিদপুর শহরে এদের বেশ কয়েকটি বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এদের দধি, ছানার মিষ্টি, রাজভোগ, রসমালাই, কালোজাম, বরফি সন্দেস, ছানার চমচম, দানাদার ছানার জিলাপি, ক্ষীরের চমচম প্রসিদ্ধ।

৩. বিবির ডাল

প্রাচীনসমাজে বিবির ডাল নামে একধরনের মিশ্রণজাত খাদ্য তৈরি করা হয়। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারে এধরনের বিবির ডাল প্রচলিত। ভাতের মাড়ের সঙ্গে পিয়াজ, মরিচ, হলুদ মিশ্রিত করে পাত্রে তৈলি দিয়ে পিয়াজ-রসুন, জিরার সংমিশণে সম্ভার দিয়ে এ ডাল তৈরি করা হয়। এ দেখতে অনেকটা সুপের মতো।

৪. কাজীর ভাত

এক সময় প্রায় বাড়িতেই কাজীর ভাত রান্না করা হতো। এখন প্রচলন অনেকটা কমে গেছে। কাজির ভাত রান্নার জন্য রান্না ঘরের চুলার পাড়ে একটি মাটির হাঁড়ি রাখা হয়। প্রতিদিন রান্নার সময় চুলায় চাপানো হাঁড়ি থেকে পরিমাণমতো চাল ঐ হাঁড়িতে রাখা হয়। এভাবে সপ্তাহখানেক রাখার পর পুরোনো ভেজা চাল নতুন চালের সঙ্গে রান্না করা হয়। এই ভাতের সঙ্গে তেঁতুল, রসুন ও তেজপাতা দেয়া হয়। এই ভাত একটু টকযুক্ত থাকে। এই ভাতের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ভর্তা দিয়ে পরিবেশন করা হয়।

৫. টক জাউ

সাধারণত পাতলা খিঁচুড়ির সঙ্গে তেঁতুল, টক আম ইত্যাদি দিয়ে খিঁচুড়ি রান্নার ন্যায় এগুলো রান্না করা হয়। অনেক সময় ক্ষুদ চাল দিয়ে টক জাউ রান্না করা হয়।

৬. তাল পিঠা ও তালবড়া

আতবচলের গুড়া, গুড়, তালের গুলা ইত্যাদি ঘন করে মিশ্রিত করে কলার পাতার পুড়ে টিনের পাত্রে বিছিয়ে আগুনে ছেক দিয়ে এই পিঠা তৈরি করা হয়। উপরের উপকরণগুলো বড়া আকারে তেলে ভেজে তাল বড়া তৈরি করা হয়, তবে উল্লিখিত উপকরণে ভাদ্র-আশ্বিনে এই পিঠা তৈরি করা হয়।

৭. চাপড়ি

চাল অথবা আটার গুলা পরিমাণমত লবণ পানির সঙ্গে ঘন করে মিশ্রিত করে মাটির পাত্রে পাতলা করে ছাড়িয়ে আগুনে তাপ দিয়ে চাপড়ি তৈরি করা হয়। এই চাপড়ি

www.pathagar.com

পাতলা গুড় দিয়ে খাওয়া হয়। এছাড়া উল্লিখিত উপকরণের সঙ্গে হলুদ, মরিচ ও পিঁয়াজ মিশ্রিত করে একই পদ্ধতিতে ঝাল চাপড়ি তৈরি করা হয়।

৮. নটাসুটা

সাধারণত বন-বাদাড় থেকে কচুর মুখি সংগ্রহ করে হলুদ, পিঁয়াজ, মরিচ ও লবণ মিশ্রিত করে গুটে ঘন করে জ্বাল দিয়ে এ ধরনের খাবার তৈরি করা হয়। দেখতে অনেকটা সুপের মতো।

৯. খাটা

অফলা আম চারফলা করে কেটে ভেতর থেকে শাষ ফেলে গুড়, লবণ, মরিচ, হলুদ মিশ্রিত করে জ্বাল দিয়ে ঘন হয়ে নামিয়ে পাঁচফোড়ন, শুকনা লংকা এবং তেলসহ সম্ভর দিয়ে খাটা তৈরি করা হয়। চালতা ফল দিয়েও খাটা রান্না করা যায়।

১০. শিরনি

যেকোনো মাঙ্গলিক কাজের জন্য মসজিদ, মন্দির অথবা অন্য কোনো পীর বা দেবতার উদ্দেশ্যে আতব চাল, দুধ, লবণ মিশ্রিত করে শিরনি তৈরি করা হয়। কখনো উল্লিখিত উপকরণের সঙ্গে চিনি, অথবা গুড় কলা মিশ্রিত করে মিষ্টিজাত শিরনি তৈরি করা হয়। ফরিদপুর বিভিন্ন অঞ্চলের গৃহস্থরা নতুন বীজ সংগ্রহ করে প্রথমেই শিরনি রান্না করে মসজিদ বা মন্দিরে দেয়। শুধু চাল এবং লবণ মিশ্রিত করে যে খাবার তৈরি করা হয় তাকে জাউ বলে।

চালভাজা : সাধারণত খুদের চাল তিলের শাষ পিঁয়াজ, কাঁচামরিচ, লবণ মিশ্রিত করে এক ধরনের খাবার তৈরি করা হয়। অনেক সময় খুদের চাল তিলের শাষ এবং পাতলা গুড় একত্রে জ্বাল দিয়ে আঠার মতো হলে ঠাণ্ডা করে মোয়া তৈরি করা হয়।

১১. নাড়ু

নাড়ু বিভিন্ন রকমের হয় যেমন : গুড়ের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, তিলের নাড়ু, চিড়ার নাড়ু, ছাতুর নাড়ু, কলাইর নাড়ু, ঢ্যাবোর নাড়ু, খুদের নাড়ু, চেচড়ার নাড়ু। এগুলো তৈরির প্রণালী প্রায় একই রকম শুধু উপকরণের মধ্যে পার্থক্য। বিভিন্ন প্রকার নাড়ু সাধারণত : পূজা-পার্বণে নৈবেদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত খাদ্য-খানা ছাড়াও বিভিন্ন এলাকার ছাতু, মুড়ি, মরিচ, পোড়া, লাবড়া, সরিষাবাটা, চাল কুমড়ার ভেদা, বকফুল ও ডালের বড়া, কলার মোড়, কলার মোচা, টাকি পোড়া, কাসুন্দি প্রর্বতি সহজাত খাবার প্রচলন রয়েছে।

১২. জুলাভাতি

সাধারণত আশ্বিন সংক্রান্তিতে গানশি অনুষ্ঠানের পরদিন ১ কার্তিক প্রত্যুষে জুলাভাতি খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন রাতে রান্নাকৃত খাবার নিম্নোক্ত ছড়া আবৃতির পর ছোট ছেলে- মেয়েরা এধরনের খাবার খায়।

আশ্বিনে রান্ধে
কার্তিকে খায়
যে বর মাঙ্গে
সেই বর পায়

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

ফোকলোরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ লোকক্রীড়া। লোকক্রীড়া চিত্তবিনোদনের বিষয় হলেও একটি জাতির উৎসাহ উদ্দীপনা ও সাহসিকতার পরিচয় খেলাধুলার মধ্যে নিহিত থাকে। বাঙালির নিজস্ব খেলাধুলা বলতে লৌকিক খেলাধুলাকেই বুঝায়। গ্রামীণ অধিবাসীদের সংস্কৃতির একটি বলিষ্ঠধারা এই লোকায়ত খেলাধুলা। কবে কোথায় এ সকল খেলার উদ্ভব হয়েছিল তা বলা দুষ্কর। তবে কিছুকিছু খেলার প্রকৃতি, উপকরণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অনেক খেলাই প্রাগ-ঐতিহাসিক কালের স্মৃতিবহ। 'গাচ্ছুয়া মাওচ্যা' খেলাটি অনার্য বা দ্রাবিড় যুগের। 'মাইটাভূত তেলেঙ্গা' দ্রাবিড়, 'ষোলঘুটি বাঘবন্দি' মোর্য বা মৌর্য পূর্ব যুগের বলে ধারণা করা হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্যান্য খেলা : কড়িখেলা, পাশাখেলা, ছুটকিখেলা, লাঠিখেলা, পাইকখেলা, নৌকাবাইচ, একহৈল্লা, হাঁড়াইয়া, সিক্কুখেলা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি। মেঘামাগা, পেঁখাই, পাশাখেলা প্রভৃতিতে প্রাচীন সামাজিক প্রথা ও জাদু বিশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। অনেক খেলা রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, রীতিনীতি, বিধিবিধান, বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের স্মৃতিবহ যেমন : পলাপলি, ভিক্ষাখেলা, চোর-চোর, কাঁঠাল চুরি, চোর-পুলিশ; সমাজজীবনের প্রতিচ্ছায়ায় সাপ, হাতি-ঘোড়া, বাঘ-ভাল্লুক, গরু-ভেড়া, বানর মোষ, বেজি ইত্যাদি খেলা জীবজন্তুর প্রতি মানুষের অপরিমেয় কৌতূহল ও সহসিকতার পরিচায়ক।

ফরিদপুরের লৌকিক খেলাধুলাকে দুইভাগে ভাগ করে এ সম্পর্কে একটি তালিকা প্রণীত হলো : ঘরের খেলা : পুতুলখেলা, রসকস খেলা, আদাকেনা, ঘুঘুসই, পাশাখেলা, আগডুম-বাগডুম, হাতটাবুটি, বাঘবন্দি, ছয়গুটি, ষোলগুটি, বত্রিশগুটি, জোলাভাতি, ইকড়ি মিকড়ি, ঢেঁকিভানা, ঘোড়াখেলা, আবুর টাবুর, পলাপলি (লুকোচুরি), চোর-চোর, বাগুনভাজা, জোড়-বেজোড়, লাটিম, গুলি খেলা প্রভৃতি।

বাহিরের খেলা : গাচ্ছুয়া-মাচ্ছুয়া, ওপেনটিবাইস্কোপ, লাঠিখেলা, এলাডিং-বেলাডিং, ডেংগুটি, কানামাছি, চোর-পুলিশ, ছি-বুড়ি, কাছি টানাটানি, ডুগডুগ, দাড়িয়া-বান্দা, নৌকাবাইচ, ঘোড়দৌড়, ষাঁড়ের দৌড়, মোরগ লড়াই, পালকি খেলা, ঢেঁকি খেলা, গোল্লাছুট, কুৎকুত, চিক্কাখেলা, কাঠিছোঁয়া, পাতাচেনা খেলা, ছাগলধরা, চিল ও হাঁস খেলা, হৈলডুবি, পানিঝুপ্পা খেলা, ছুটাবাড়ি, ছোঁয়াছুঁয়ি প্রভৃতি খেলা। ফরিদপুরের উল্লেখযোগ্য লাঠিখেলার বিচিত্রধরণ হলো : বত্রিশ আনির খেলা, বাগানখেলা, রং পশরি, কাউন্সিল খেলা, তুড়মি ও আড়খেলা। এর কসরত হলো : বেনট, পাট্টা, আলী প্যাঁচ, রংভাজ, উস্তাদি, পায়তারা, গরম ও সেলামি। এর বিচিত্র নৃত্য হলো : সখা নৃত্য, হাজরা নৃত্য, পেট্টা নৃত্য, আলী আলী নৃত্য, রায়বেশেঁ নৃত্য, নৌকা বাইচের নৃত্য, মানুষ পোঁতা নৃত্য, ঢেঁকি নৃত্য, জেকের নৃত্য ও ময়ূর নৃত্য প্রভৃতি।

www.pathagar.com

ফরিদপুর অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের লোকখেলার চিত্র

লুডু খেলা

কড়ি খেলা

কুতকুত খেলা

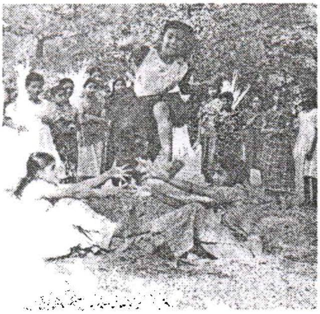

ইচিং বিচিং খেলা

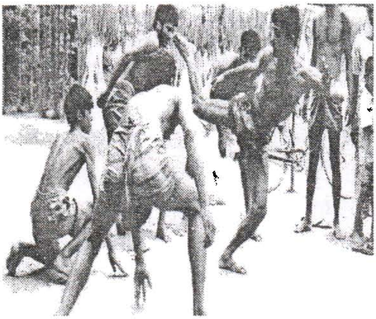

হাডুডু খেলা

লাটিম খেলা

www.pathagar.com

ফুলের টোকা

ফুলের টোকা

ওপেনটি বাইসোকপ খেলা

১. হাতটাবুটি খেলা

হাতটাবুটি বা আঙ্গুল গণনা খেলা ছেলে-মেয়েরা সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই খেলায় যে বেশি অভিজ্ঞ তাকে 'রাজা' অথবা 'বুড়ি' নির্বাচন করা হয়। খেলার শুরুতেই সকলেই বৃত্তাকার পরিধিকে কেন্দ্র করে বসে পড়ে। আঙ্গুল গণনার মাধ্যমে খেলাটি শুরু করা হয়। সর্বপ্রথম হাতের উপর হাত রেখে ছড়া আবৃত্তি করে:

হাতটা বুটি
চুনের খুটি
কে খেলাবি
আয়রে সখি।

www.pathagar.com

ছড়া পাঠ শেষ হলে প্রত্যেকেই দুটি হাত মাটিতে উপুড় করে রাখে। এরপর 'বুড়ি' ক্রমানুসারে ছড়া কেটে আঙ্গুল গুণতে থাকে:

এবর ঢেবর কুঞ্চিমালা
রাইকুঞ্চি চৌ-চালা
চৌ-চালাতে মারলাম বাড়ি
ধোপা বাড়ির কেঁথা চুরি,
রাই রোস সীতা
হাতি মইলো, মইষ মইলো
গগন বাইয়া তেল পইলো,
উঠো উঠো ভাইরে
সোনার ছাতি ধরো রে
ছাতির উপর এলনকাঠ
ফালদ্যা উঠলো তোমার হাত।

ছড়াকাটা শেষ হলেই হাত দুটি কপালে উঠে যায়, তারপর পুনরায় ছড়া কাটার মাধ্যমে খেলা শুরু হয়। বর্তমান ছড়াটিতে কথোপকথনের দৃশ্য লক্ষণীয়:

বুড়ির প্রশ্ন - তোমার কপালে কী?
উত্তর - সিন্দুরের ফুটা।
প্রশ্ন - ধুইয়া ফেলাও?
উত্তর - যায় না।
প্রশ্ন - রাজার বাড়ির কুত্তা ডাক দিলাম?
উত্তর - গ্যাছে, গ্যাছে, গ্যাছে।

এরপর হাত দুটি খেলোয়ারের নাভির উপর নেমে আসে। আবার বুড়ি প্রশ্ন করতে থাকে:

প্রশ্ন - তোমার নাভিতি কী?
উত্তর - উড়াঝাবা।
প্রশ্ন - উড়াঝাবার মধ্যি কি?
উত্তর - কুসুমডি।
প্রশ্ন - কুসুমডির মধ্যি কি?
উত্তর - ছাউডি।
প্রশ্ন - ছাউডি চেঁচায় ক্যা?
উত্তর - দুধ ভাতের জন্যি।
প্রশ্ন - রাজার বাড়িত্যা দুধ ভাত আইন্যা দিলাম।
উত্তর - রাজার বাড়ির বিলেইতি খাইয়া ফেলাছে।
প্রশ্ন - বিলেই গ্যাছে কোথায়?
উত্তর - মইরা গ্যাছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন - মরা কো?
উত্তর - ভাইস্যা গ্যাছে।
প্রশ্ন - ভাসা কো?
উত্তর - শুকুনে খাইছে।
প্রশ্ন - শুকুন কো?
উত্তর - ডালে বইছে।
প্রশ্ন - ডাল কো?
উত্তর - ভাইঙ্গা গ্যাছে।
প্রশ্ন - ভাঙ্গা কো?
উত্তর - জমিনে পরছে।
প্রশ্ন - জমিন কো?
উত্তর - দূর্বা জালাইছে।
প্রশ্ন - দূর্বা কো?
উত্তর - গরুতি গাইছে।
প্রশ্ন - গরু কো?
উত্তর - বেইচ্যা হেলাইছি।

উল্লিখিতভাবে পরস্পরের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে চলতে থাকে খেলাটির আনন্দপূর্ণ মুহূর্ত। একের পর এক করে চলতে থাকে আঙ্গুল গণনার পালা। দলের সবার আঙ্গুল গণনা শেষ হলে খেলাটি ভেঙ্গে যায়।

২. জলকেলি খেলা

কোনো জলাশয়ে দুটি দলের মধ্যে জলকেলি বা ছুটছুট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত দু'টি দলের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে খেলাটি শুরু হয়। একদল প্রশ্ন করে, অন্যদল উত্তর দেয়।

প্রশ্ন - একি (হাত ভরে পানি উঠিয়ে)
উত্তর - দুধ।
প্রশ্ন - অত দূর না গেলে খাও কুত্তার মুত। (পানি নিক্ষেপ করে দু'দলের দূরত্ব নির্ণয়)
প্রশ্ন - একি (হাতের দু'টি আঙ্গুল কেঁচি অনুকরণ করে দেখানো হয়)
উত্তর - কেঁচি।
প্রশ্ন - মাথায় কী? (মাথায় হাত রেখে)
উত্তর - টাকা।
প্রশ্ন - আমরা চললাম ঢাকা (বলেই প্রশ্নকারী দলটি সাঁতার কাটতে শুরু করে, বিপক্ষ দল তাদের ছোঁয়ার জন্য ছুটতে থাকে)

খেলা শেষ হলে সুর করে নিম্নের ছড়াটি আবৃত্তি করা হয়:

দুয়া নিয়া বাড়ি যাও
ব্যাঙ পুড়া দ্যা ভাত খাও।

www.pathagar.com

৩. লাঠিখেলা

লাঠিখেলা ফরিদপুর অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য একটি ঐতিহ্যবাহী লৌকিক খেলা। বর্তমানে মহরমের মেলা, নববর্ষ এবং অন্যান্য নানাবিধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে লাঠিখেলার আয়োজন করা হয়। ফরিদপুর চর দখল অথবা অন্য কোনো জায়গা-জমি নিয়ে কাইজা বা মারামারি হলে লাঠি খেলোয়াড়দের একটি ভূমিকা রয়েছে। এ খেলায় শুধু লাঠিই নয়, ঢাল, সড়কি, কাতরা, ছোরা অথবা অন্য কোনো দেশীয় অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। লড়ায়ের পাক্কালে আলী-আলী, অ, অ উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে লোক জড়ো করা হয়। গাজিপিরের বন্দনাও দেয়া হয়। ফরিদপুরে বিচিত্রধরনের লাঠিখেলার প্রচলন রয়েছে। এগুলো হলো: বত্রিশআনির খেলা, বাগানখেলা, রংপশারি, কাউন্সিল খেলা, তুড়মি ও আড়খেলা। লাঠির অনেকগুলো কসরতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বেনট, পাট্টা, আলী প্যাচ, রংভাজ, উস্তাদি, পায়তারা, গরম, সেলামি ইত্যাদি। লাঠিখেলার মধ্যে কিছু কিছু নাচও থাকে। যেমন: সখানৃত্য, হাজরানৃত্য, পেট্টানৃত্য, আলী-আলী নৃত্য, রায় বেঁশে নৃত্য, নৌকাবাইচের নৃত্য, মানুষ-পোতা নৃত্য, ঢেঁকিনৃত্য, জেকের নৃত্য, ময়ুরনৃত্য প্রভৃতি। আজকের দিনে লাঠিখেলা একটি আনন্দদায়ক বিষয় হলেও লাঠি আদিম যুগের হাতিয়ার এবং মধ্যযুগে সামন্ত জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার উদ্ভব হয়েছে। সেকালে আত্মরক্ষায়, শত্রু হননে, শিকারে এবং যুদ্ধে লাঠির ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। আমাদের সংস্কৃতিতে শৌর্যবীর্য ও কলাকৌশলে লাঠি খেলা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

লাঠিখেলা

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

ফরিদপুর অধিবাসীর সমাজ-সংস্কৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মঙ্গোলীয়, আদি অস্ট্রেলীয়, আর্য, সেমেটিক, অনার্য প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন মাত্রার সংমিশ্রণ এদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এরা বেশির ভাগই বিস্তৃত শিরস্ক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘ শিরস্কদের সংখ্যা কম। কর্ম ও বর্ণাশ্রমেরভিত্তিতে হিন্দুসম্প্রদায়ের সংখ্যা ৭২ শ্রেণির এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা ৬০। হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিষ্টান এই তিন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিয়ে ফরিদপুরের সমাজ গঠিত। মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ হানাফি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত সুন্নি মুসলমান ও হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নশ্রেণির সংখ্যাই বেশি। এ সকল নিম্নবর্ণের মধ্যে থেকেই দেশীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের উদ্ভব।

ফরিদপুর জেলার পেশাভিত্তিক গোত্র পরিচয়: (হিন্দুসম্প্রদায়)

১. ব্রাহ্মণ: পূজারীরূপে ধর্মীয় অনুশীলন করেন।

২. কায়স্থ: প্রাচীনকাল থেকে তাদের গোত্রগত পেশা ছিল মসিজীবী।

৩. বৈদ্য: তাদের গোত্রগত পেশা ছিল চিকিৎসা সেবা।

৪. গণক: শুভাশুভ গণনা করা ও নবজাতকের কুষ্ঠী প্রস্তুত।

৫. নাপিত: তাদের গোত্রগত পেশা ক্ষৌরকর্ম।

৬. ধোপা: তাদের গোত্রগত পেশা অপরের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা।

৭. তিলি: তাদের গোত্রগত পেশা ছিল তেলবীজ থেকে ভোজ্যতেল উৎপাদন।

৮. কামার: তাদের গোত্রগত পেশা গৃহস্থালীর সরঞ্জাম যেমন দা, ছুরি, বটি ও অন্যান্য প্রস্তুতকরণ।

৯. বণিক: স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার তৈরিকরণ।

১০. কুম্ভকার: মাটির গৃহস্থালী দ্রব্যাদি যেমন- মাটির হাড়িপাতিল, কলসি ও দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করণ।

১১. বারুই: পানের বরোজ থেকে পান উৎপাদন।

১২. ঋষি: বাঁশ বেত দিয়ে গৃহস্থালীর সামগ্রী যেমন- ডালা, চালুন উৎপাদন।

১৩. ডোম: মৃত্যু ব্যক্তি সৎকার করণ।

১৪. চামার: জুতা-সেন্ডেল তৈরি করণ।

১৫. কৈর্বত/মালো/জেলে: মৎসজীবী অর্থ মাছ ধরা ও বিক্রি।

১৬. মালি: পূজা-পার্বণ উপলক্ষে পুষ্পমাল্য উৎপাদন।

১৭. গোয়ালা: গোত্রগত পেশা গোদুগ্ধ আহরণ।

১৮. জোলা: গোত্রগত পেশা কাপড় উৎপাদন।

www.pathagar.com

১৯. সূতার/সূত্রধর: কাঠের আসবাবপত্র তৈরি, গৃহসামগ্রী নির্মাণ।
২০. সাহা: প্রধান ব্যবসায়ী।
২১. আগরওয়ালা: বস্ত্রসামগ্রী ব্যবসায়ী।
২২. ময়রা: মিষ্টিজাত সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রি।
২৩. শাঁখারি: শাঁখা সামগ্রী তৈরি।
২৪. কাঁসারি: কাঁসার গৃহস্থালী সামগ্রী উৎপাদন।
২৫. ধাঙর/মেথর: মলমূত্র পরিষ্কার।
২৬. বিন্দু: মাছ ধরা ও বিক্রি।
২৭. কাহার: পালকির বাহক।
২৮. গন্ধবণিক: ব্যবসা-বাণিজ্য।
২৯. নবশাখ: ব্যবসা-বাণিজ্য।
৩০. বৈষ্ণব: গান-বাজনা করা।
৩১. বাদক: সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার।
৩২. চুনারি: ঝিনুক ও শামুক থেকে চুন উৎপাদনকারী।
৩৩. মাঝি: নৌ-জীবী।
৩৪. পাটনি: নৌকায় লোকজন পারাপার।
৩৫. বেহারা: বেহারা (এক জাতীয় লোকযান) বহনকারী।
৩৬. ধনুকার: লেপ-তোষক উৎপাদনকারী।
৩৭. বাগদি: শ্রমজীবী।
৩৮. কাহার: কাহার (এক জাতীয় লোকযান) বহন করা।
৩৯. রাজবংশি: গান-বাদ্য পরিবেশন।
৪০. বুনা: শ্রমজীবী ও মাছ ধরা।
৪১. ক্ষত্রিয়: কৃষিজীবী।
৪২. ভট্ট: ভাট কবিতা রচনা।
৪৩. ঢোলুক: ঢোলবাদক।
৪৪. নট: রামায়ণ গান পরিবেশন।
৪৫. পাল: মৃৎপাত্র উৎপাদনকারী।

মুসলমান সম্প্রদায়

১. জোলা: গোত্রগত পেশা তাঁতের কাপড় উৎপাদনকারী।
২. দর্জি/খলিফা: ব্যবহার্য জামা-কাপড় উৎপাদনকারী।
৩. কুলু/তেলি: ঘানিতে তৈলবীজ থেকে তৈল উৎপাদনকারী।
৪. কাহার: কাহার ও পালকিবহনকারী সম্প্রদায়।
৫. হাজাম: গোত্রগত পেশা মুসলমানী বা খাৎনা করানো।
৬. বয়াতি: গান-বাদ্য পরিবেশনকারী।

www.pathagar.com

৭. কারিকর: গোত্রগত পেশা তাঁতের কাপড় উৎপাদন।
৮. মাঝি: নৌকার মাঝিগিরি করা।
৯. বয়াতি: গান-বাজনা পরিবেশন।
১০. মৌলবি: ধর্মীয় শিক্ষাদান এবং মসজিদে ইমামতি করা।
১১. ফকির: লোকচিকিৎসা প্রদান।
১২. লস্কর: পূর্বে রাজা, বাদশা বা জমিদারের পেয়াদা।
১৩. খালাসি: জাহাজে খালাসিগিরি করা।
১৪. সরদার: জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর নেতৃত্বদানকারী।
১৫. বেপারি: ব্যবসা-বাণিজ্য করা।
১৬. মোড়ল/মাতুব্বর: গ্রাম্য সালিশে নেতৃত্বদানকারী।
১৭. ধনুকার: লেপ-তোষক প্রস্তুতকারী।
১৮. ছাতিসারা: ছাতা মেরামতকারী।
১৯. মিস্ত্রি: গৃহ নির্মাণকারী।
২০. রাখাল: কৃষিশ্রমিক। এরা বছরভিত্তিক চুক্তিবদ্ধ হয়ে ভূ-স্বামীর বাড়িতে শ্রম বিক্রি করে।
২১. কামলা: দৈনিকভিত্তিক শ্রমিক।
২২. বাইদ্যা: নৌকায় বসবাস করে। মনোহারি দ্রব্যাদি বিক্রি এবং তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে টোটকা চিকিৎসা ও সাপ এবং বানরের খেলা দেখায়।
২৩. গোয়ালা: দুগ্ধ বিক্রিকারী।
২৪. বাজাইরা: দুগ্ধ বিক্রিকারী।
২৫. রাজমিস্ত্রি: দালানকোঠা নির্মাণকারী।
২৬. রং মিস্ত্রি: দালান-কোঠা এবং আসবাবপত্র রং ও বার্নিশ করে থাকে।
২৭. ঘরামি: গৃহনির্মাণকারী সম্প্রদায়।
২৮. গাড়োয়ান: মূলত গরুর গাড়ির চালক।
২৯. পাটিকর: গোত্রগত ভাবে শীতল পাটি উৎপাদনকারী।
৩০. গাছি: খেজুর অথবা তালের রস আহরণকারী। পরবর্তীতে এই রস দিয়ে গুড় উৎপাদন করে।
৩১. পৈরাত: দৈনিকভিত্তিক শ্রমবিক্রিকারী।

১. বাদ্যকার

কানাইলাল শীল : ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার কড়িয়াল গ্রামে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আনন্দ চন্দ শীল ও মাতা সৌনামিনী। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি শিল্পী। অল্প বয়সে পিতৃহারা হন। প্রথমে বেহালা বাদক বসন্তলাল শীলের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর মাত্র ১১ বছর বয়সে বসন্তলালের গুরু মতিলাল ধুমপির নিকট

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ নেন এবং বেহালা বাদক হিসেবে এক যাত্রা দলে যোগদান করেন। অতঃপর তাঁর ঘটনাবহুল জীবন শুরু হয়। বেহালা ছেড়ে দোতারা বাদক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তারুচন্দ্র সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কৃষ্ণলীলা নামে একটি গানের দলে যোগ দিয়ে অম্বিকা পুরে যান এবং কবি জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পরে আব্বাসউদ্দিন ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হন। উভয়ে তাঁর দোতারা শুনে মুগ্ধ হন। কোলকাতা গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ এবং ক্রমান্বয়ে দোতারার বাদক হিসেবে মুকুটহীন সম্রাটের খ্যাতি অর্জন করেন। কবি জসীমউদ্‌দীন তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দোতারা বাদক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তার 'স্মৃতিরপট' গ্রন্থে। আব্বাসউদ্দিন 'শিল্পী জীবনের কথা' গ্রন্থে কানাইলাল শীলকে পাক-ভারতের বিরল প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমরা দেখেছি, কানাইলালবিহীন শচীনদেব বর্মনের পল্লিগান বেরই হতো না। তিনি আমৃত্যু পাকিস্তান বেতারে শিল্পী হিসেবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে কুমুদকান্ত, আশুতোষ ও অবিনাস প্রত্যেকেই দোতারা বাদক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন।

আনন্দমোহন বিশ্বাস : বাইতিপাড়া, চৌমুখী ফরিদপুরের অধিবাসী। বাঁশি, দোতারা ও খমব বাদক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার বাঁশি শুনে জসীমউদ্‌দীন অভিভূত হন। তিনি তার প্রসঙ্গে বলেছেন– 'মনে হইল, এই বাঁশির সুর যেন কোনদিন শেষ হয় না। অনন্তকাল বসিয়া বসিয়া আমার যত না পাওয়া ব্যথা, যত আঁখিজল, যত কামনা, বাসনা সব এই বাঁশির সুরে ভরিয়া আকাশে বাতাশে ছড়াইয়া দিতে পারি।' তিনি গণসংযোগ বিভাগে তবলা বাদক হিসেবে তাঁকে চাকরির ব্যবস্থা করেন।

দিনু লেংড়া : চরভদ্রাসন, ফরিদপুরের অধিবাসী। সারিন্দা বাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। কবি জসীসউদ্‌দীন তার সম্পর্কে লিখেছেন সে যে এত বড় সারিন্দা বাজায় তাহা প্রথমে আমিও বুঝিতে পারি নাই। আর গ্রামবাসীও জানিত না।

কানা কুরমাইনা : উজানচর ফরিদপুর। এর চোখ অন্ধ ছিল, এজন্যে তার নামের সঙ্গে 'কানা' শব্দ যুক্ত হয়। কুরমাইনা ছিলেন গায়ক ও সারিন্দা বাদক। শ্রুত আছে, তিনি সারিন্দাকে দিয়ে কথা বলাতে পারতেন।

মেঘু বয়াতি : ১৩০৭ বঙ্গাব্দে গোয়ালেরটিলা ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লোককবি ও জারিগানের বয়াতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পাক বেতারের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। তিনি খুনজুরী বাদক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ফকির আলমগীর : ১৯৫০ সালে ফরিদপুর জেলা ভাঙ্গা থানার কালামৃধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গণসংগীত শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও তিনি অসাধারণ বাঁশি বাজাতে পারেন। জসীমউদ্‌দীনের পল্লিগানে তিনি উচ্চ মার্গের বাঁশির সুর তুলতে পারদর্শী। তিনি ঢাকাস্থ-ঋষিজ শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা।

www.pathagar.com

সাদেক আলী : অম্বিকাপুর, ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লোকশিল্পী হিসেবে ঢাকা বেতার এবং বিভিন্ন মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করতেন। অসাধারণ সারিন্দা বাদক ছিলেন। তার সারিন্দা বাজানো শুনলে মনে হতো তিনি সারিন্দা দিয়ে কথা বলাচ্ছেন।

পান্না আহমেদ : ১৯৪৮ সালে ফরিদপুর শহরের আলীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নূরুউদ্দীন ছিলেন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী। তিনি হারমোনিয়াম বাজাতে পারদর্শী।

আবদুল আহাদ : পৈতৃক নিবাস ভাঙ্গা থানার ফুকুরহাটি গ্রামে। জন্ম ১৯২০ সালে। তিনি শৈশব থেকে সংগীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে সংগীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য শান্তি নিকেতন এবং যথাসময়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রথম মুসলমান যিনি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শান্তি নিকেতন থেকে রবীন্দ্র সংগীতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত হন। তারই তত্ত্বাবধানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তালাত মাহমুদ, উৎপল সেন এবং পঙ্কজ মল্লিকের গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকা বেতারে মিউজিক কম্পোজার ও প্রযোজক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বহু দেশ ভ্রমণে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৭৮ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার পান। তানপুরায় অসাধারণ সুর তুলতে পারদর্শী ছিলেন।

ফাহিম হোসেন চৌধুরী : ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর শহরের কমলাপুরস্থ চৌধুরী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও অসাধারণ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হলেও সংগীতের অন্যান্য শাখায়ও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। হারমোনিয়ামে অসাধারণ সুর তুলতে সক্ষম ছিলেন।

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী : জন্ম কুমিল্লায় কিন্তু ফরিদপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সেতার বাদক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

প্রাণবন্ধু সাহা : জন্ম রথখোলা ফরিদপুর শহর। এস্রাজ, তবলা ও কণ্ঠ সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিতানন্দ অধিকারীর কাছে এস্রাজ, আবদুল লতিফ মিয়ার কাছে তবলা এবং সুধীর লাল চক্রবর্তীর কাছে কণ্ঠ সংগীতে তালিম নেন। তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের সকল ধারায় পারদর্শী ছিলেন।

করুণাময় অধিকারী : পৈতৃক নিবাস রথখোলা, ফরিদপুর শহর। জন্ম ১৩৪০ বঙ্গাব্দে। পিতা ছিলেন ধ্রুপদী গায়ক। তিনি দাদা নিত্যানন্দের নিকট সংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত ও তবলা বাজাতে পাঠ নেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতে তিনি মূলত বিষ্ণুপুর ঘরানার। ফরিদপুরে উত্তরণ সংগীত স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। অসাধারণ তবলা বাজিয়ে ছিলেন।

অবিনাশ শীল : জন্ম কড়িয়াল, নগরকান্দা। পিতা : প্রখ্যাত দোতারা বাদক কানাইলাল শীল। তিনি পিতার ন্যায় অসাধারণ দোতারা বাদক। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত শিল্পী।

কিরিটিভূষণ অধিকারী : অসাধারণ তবলা বাদক। ঢাকা মিউজিয়াম কলেজে তবলা

www.pathagar.com

শিক্ষক।

আয়নাল বয়াতি : জন্ম : বোয়ালমারী কিন্তু ভাঙ্গার সদরদিতে স্থায়ী বসবাস করেছেন। লোকগানের প্রখ্যাত শিল্পী। দোতারা এবং সারিন্দায় খুবই পারদর্শী।

মো. আলাউদ্দিন : জন্ম দক্ষিণ টোপাখোলা, হরিসভা, ফরিদপুর। ১৯৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : মনিরউদ্দিন। সেতার, বাঁশি, দোতারা এবং গীটারে পারদর্শী। বর্তমানে ফরিদপুরে শিল্পকলা একাডেমীতে কর্মরত।

আসাদ বয়াতি : জন্ম : ধুলদি, সদর ফরিদপুর। লোকগানের শিল্পী। তার উস্তাদ বিচারগানের সম্রাট আবদুল হালিম মিয়া। তিনি সারিন্দা বাজাতে খুবই দক্ষ ছিলেন।

২. কুম্ভকার (কুমার) বা পাল সম্প্রদায়

ফরিদপুর জেলার প্রাচীন পেশাজীবী সম্প্রদায়ের অন্যতম কুম্ভকার বা পাল সম্প্রদায়। স্থানীয় ভাষায় এদের ‘কুমার’ সম্প্রদায় বলা হয়। মূলত এরা আমাদের আবহমান লোকশিল্পের অন্যতম কারিগর। মৃৎশিল্পী হিসেবে এদের পরিচয় সর্বজন ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের নৃতাত্ত্বিক কৃষ্টি ও নৈপুণ্যের ধারক-বাহক এই সম্প্রদায়। আমরা জানি, প্রকৃতির অফুরন্ত উপাদান যে মাটি আর জলীয় পদার্থ তাপ দ্বারা নিষ্কাশন করে যে রাসায়নিক পরিবর্তন করানো হয় তারই বিকাশ মৃৎশিল্প যা উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে এই সম্প্রদায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইতিহাস বলে, নব্য প্রস্তর যুগে অন্তত দশ-বারো হাজার বছর আগে মৃৎশিল্পের আবিষ্কার। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক লুই হিনরি মর্গান মৃৎশিল্পের আবিষ্কারকে বন্য অবস্থা থেকে বর্বর অবস্থায় মানবজাতির উত্তরণের সূচনা বলে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশের মৃৎশিল্প মূলত হরপ্পা ও মহেনজোদারো সভ্যতার উত্তরসূরী। মহাস্থানগড়, ময়নামতি থেকে পোড়ামাটি নিদর্শনে শক-কৃষাণ শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুমারপাড়া, কুমার খাঁ, কুমারখালী, কুমারটোলী, কুমারডাঙ্গা ইত্যাদি স্থানে নাম মৃৎশিল্পীদের পরিচয় বহন করে।

ফরিদপুরে কুমার বা পাল সম্প্রদায় মূলত এ অঞ্চলের দরিদ্র অনুন্নত সরল ধর্মবিশ্বাসী প্রকৃতজন। তাদের অনাবিল চারিত্রিক সারল্য, সাবলীলতা ও বলিষ্ঠতা এ অঞ্চলের মৃৎশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এদের হাতে হাড়ি, ঘোড়া, বাঘ বিভিন্ন ধরনের পুতুল, দেবদেবী মূর্তি এবং লোকায়ত জীবনে ব্যবহৃত হাঁড়ি, পাতিল এবং অন্যান্য সামগ্রী তৈরি হয়। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে এ অঞ্চলের খেলনা পুতুল, দেবদেবীর মূর্তি, মঙ্গলঘট, মনসাঘট, শখের হাঁড়ি, লক্ষ্মীঘট, লক্ষ্মীসরা, রাগঘট, মৃন্ময়পত্র, পিঠার ছাঁচ, ফসল রাখার মটকা, দই রাখার পাত্র, কুপি, প্রদীপ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

ফরিদপুর কুম্ভকার সম্প্রদায়ের তালিকা : (সূত্র : বিসিক)

www.pathagar.com

উপজেলা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	উৎপাদন	উৎপাদিত পণ্য
ফরিদপুর সদর	খলিলপুর	১০	৮৫	গৃহস্থালির তৈজসপত্র
ঐ	চিলারকান্দি	১০	৮০	ঐ
ঐ	ভবনন্দপুর	২০	১৫০	তৈজসপত্র, পুতুল, পিঠার ছাঁচ, দেব-দেবীর মূর্তি ও লক্ষ্মীসরা
ঐ	গুহলক্ষ্মীপুর	১১	১৪০	ঐ
ঐ	বাহিরদিয়া	১০	৮০	ঐ
ঐ	ভাজনডাঙ্গা	৮	৫০	গৃহস্থালির তৈজসপত্র, লক্ষ্মীসরা ও রসের হাঁড়ি
বোয়ালমারী	বাগুয়ান	১০	২৮	ঐ
ঐ	বান্দুগ্রাম	২০	৫০	ঐ
আলফাডাঙ্গা	জটিগ্রাম	৩৩	৮১	ঐ
ঐ	তিতুরকান্দি	১৫	৩০	ঐ
ঐ	জয়দেবপুর	১৪	৪০	পিঠার ছাঁচ ও তৈজসপত্র
ভাঙ্গা	চান্দ্রা	১	৬০	তৈজসপত্র
ঐ	ঘাড়ুয়া	১২	৩৮	ঐ
নগরকান্দা	গোপালপুর	২০	৮০	ঐ
ঐ	সোনাপুর	১৫	৬০	তৈজসপত্র ও মটকা
ঐ	ফুলবাড়িয়া	২০	৮০	ঐ
নগরকান্দা	যদুরদিয়া	২০	৯০	তৈজসপত্র
ঐ	রসুলপুর	১০	৪০	ঐ
সদরপুর	ঠেঙ্গামারি	৭	২৭	ঐ
ঐ	শ্যামপুর	৭	২৮	ঐ

ঋষি সম্প্রদায় : বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বাঁশ-বেতের শিল্পকর্ম প্রধানত ডোম, চাঁড়াল, বাগদী ইত্যাদি অন্ত্যজ বর্ণের বৃত্তি। ফরিদপুরে ভূমিহীন, বিত্তহীন বা প্রান্তিক চাষীশ্রেণি এই পেশায় বংশানুক্রমে জড়িত। সাধারণত এদেরকে ঋষি সম্প্রদায় বলা হয়। বাঁশের চাঁই, চাটাই, খাচা, ডুলা, খালই, ঝুড়ি, মাছ ধরার ফাঁদ, কোচ, হোচা, আওড়া, পলো, চালনি,

www.pathagar.com

ঝুলা, ডালা, বাঁশের বেড়া, ঝাঁপ, ভেলকি, হাতপাখা, ছড়ি, লাঠি, মাখাল প্রভৃতি দ্রব্যাদি পরিবারের সকল সদস্য পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য নৈপুণ্য অর্জন করেন। এরা উৎপাদন কৌশাল সাধারণত পরিবারের বাইরে নতন কাউকে শেখাতে অনিচ্ছুক। উদ্যোক্তা নিজেই মালিক, নিজেই কারিগর, নিজেই করনিক এবং নিজেই বিপনণকারী।

ফরিদপুর ঋষি সম্প্রদায়ের তালিকা (বিসিক সূত্র)

উপজেলা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	মোট উৎপাদন
ফরিদপুর সদর	শিবরামপুর	১১	৬৪
ঐ	মৃগী	১০	৫০
ঐ	চাঁদপুর	১৪	৫৬
আলফাডাঙ্গা	জয়দেবপুর	১৫	৪৫
ঐ	পাকুরিয়া	১০	২২
ভাঙ্গা	তুজারপুর	১০	২৫
ঐ	বাকপুরা	৬০	১৫০
ঐ	চুমুরদি	১০	২০
সদরপুর	ইব্রাহিম মুন্সি কান্দি	৬	২৪
ঐ	চররামনগর	১৪	২৮
ঐ	কৃষ্ণনগর	১৯	২৯
ঐ	চরচানপুর	৭	১৪
ঐ	সাতরশি	৮	১৬
ঐ	চাররশি	৬	১২

উল্লেখ্য যে বৃহত্তর ফরিদপুরে ৯৯টি কারুপল্লিতে ৯৭৬টি পরিবারে ৩৩৯৬ জন এই শিল্পকর্মে নিয়োজিত।

৩. সুতার/সূত্রধর

আবহমান বাংলার নৃতাত্ত্বিক শিল্পের মধ্যে কারুশিল্প (কাঠ শিল্প) অন্যতম। এই শিল্প লোকায়ত সমাজ থেকে আগত সুতার বা সূত্রধর সম্প্রদায়ের বৃত্তি। 'বর্ণশ্রম ব্যবস্থায়' অধম সংকর বা অসংসূত্রের তালিকায় এদের স্থান। কিন্তু এদের ঐতিহাসিক নিখুঁত কারুকার্যময় খোদাই করা নকশা উচ্চমানের এতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাবলিতে মূর্তি তৈরির উপাদান কাঠের অগ্রাধিকার থাকায় এই সূত্রধর সম্প্রদায়ের হাতেই তা নির্মিত হয়েছে।

www.pathagar.com

পৌরাণিক কাহিনি সম্বলিত চিত্র কাঠের বেড়া, ঘরের খিলান, পদ্মঠাকুরের সিংহাসন, বৃষকাষ্ঠ, পাঠ ঠাকুর, অঙ্কিত রথ, জোড়া ময়ূর নৃত্য সম্বলিত পালঙ্ক, বাঘ-সিংহের থাবার মতো খোদাই করা পালঙ্কের পায়া, ময়ূরপঙ্খি ও টিয়া পাখির ঠোঁট সম্বলিত নৌকা, চিত্রিত নৌকার গলুই, পিতলের চোখ বসানো গলুই, লতা-পাতা অলংকৃত সিন্দুক, আসবাবপত্র, পিঁড়ি, খঞ্জা, পিলসুজ, তৈজসপত্র, হুক্কার নল, ছুরির বাঁট, দরজা-জানালার পাল্লায় খোদিত লতাপাতা, ফুল, পদ্ম ইত্যাদির আলপনা চিত্র ও জ্যামিতিক ছক।

ফরিদপুর জেলায় সূত্রধর সম্প্রদায়ের হাতে তৈরি প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। এক সময় এই অঞ্চলে কাঠের কারুকার্যময় বেড়া, দরজার পাল্লায় লতাপাতার চিত্র, সিংহদ্বার এবং হিন্দু প্রধান এলাকায় বৃষকাষ্ঠ স্থাপনের রীতির প্রচলন ছিল।

সূত্রধর সম্প্রদায়ের তালিকা

উপজেলা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	মোট উৎপাদন
ফরিদপুর সদর	বিলটুলী	২৫	১০০
ঐ	টেপাখোলা	১০	৪০
ঐ	কানাইপুর	১০	৪০
ঐ	খলিলপুর	৮	২৪
ঐ	শিবরামপুর	৫	১৫
সদরপুর	গজারিয়া	৫	১৫
ঐ	কৃষ্ণপুর	৬	২০
ঐ	আটরশি	৫	১৫
ঐ	সদরপুর	১০	২০
ভাঙ্গা	পুখুরিয়া	৫	১৫
ঐ	ভাঙ্গা	৮	৩০
ঐ	মুনসুরাবাদ	৫	১৫
ঐ	চান্দ্রা	৫	১৫
ঐ	কাউলিবেড়া	৪	১২
ঐ	ঘাড়ুয়া	৩	১০
ঐ	সাতৈর	৫	১৫
বোয়ালমারী	মাছকান্দি	৬	১৮

www.pathagar.com

ঐ	বোয়ালমারী	৮	২৪
নগরকান্দা	নগরকান্দা	৮	১৫
ঐ	তালমা	১০	১৫
ঐ	রসুলপুর	৫	১০
আলফাডাঙ্গা	আলফাডাঙ্গা	১০	২৫
ঐ	দিগনগর	৫	১২
ঐ	বড়াইচ	২	৫
সালতা	সোনাপুর	৬	১৫
ঐ	সালতা	৪	৮

৪. ময়রা

সাধারণত যারা মিষ্টিজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করে তাদেরকে ময়রা বলা হয়। পূর্বে শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের পেশাজীবী শ্রেণি দেখা যেতো যারা ঘোষ সম্প্রদায় বলে পরিচিত ছিল। বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পেশার সঙ্গে জড়িত। স্বাধীনতাপূর্ব এ জেলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউ এই পেশায় জড়িত ছিল না। ফরিদপুরের বিভিন্ন হাটে বাজারে এই পেশার লোকজনদের দেখা যায়। বলা বাহুল্য, শুধু পরিবারের পুরুষ লোকেরা এই কাজ করে থাকে। ফরিদপুরের উল্লেখযোগ্য মিষ্টি তৈরি শিল্পী (ময়রা) কারিগর হলো : মধুখালীর বাজার, কামারখালী, ডাঙ্গা বাজার, চান্দ্রা, কাউলিবেড়া, পুখুরিয়া, নগরকান্দা, তালমা, রসুলপুর প্রভৃতি। তবে বাগাটের ময়রা সম্প্রদায়ের হাতে উৎকৃষ্ট মানের দধি মিষ্টি তৈরি হয়। এছাড়া ভাঙ্গা, আলফাডাঙ্গা এবং মুন্সিবাজারের যথাক্রমে লেংড়া, রাজভোগ, কাঁচাগোল্লা, গুড়ের সন্দেশ প্রসিদ্ধ।

৫. ধাঙর/মেথর

ধাঙর বলতে নিম্নশ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়কে বুঝায়। এই সম্প্রদায়ের আদিম পেশা ঘর-দুয়ার, রাস্তাঘাট, নর্দমার ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার এবং মলমূত্র অপসারণসহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। এদের ঝাড়ুদার বা মেথর বলা হয়। বেতন বা অর্থের বিনিময়ে কাজ করাই এই সম্প্রদায়ের বৃত্তি বা কাজ। ধাঙর (মেথর) শ্রেণি মূলত তিন ধরনের অনুজাতিগত সম্প্রদায়। এরা হলো ডোম, হাড়ি, হেলা। বর্তমানে কেউ কেউ এই শ্রেণির লোককে অঙ্গন সুন্দর বলে থাকেন। তাদের ব্যাখ্যা হলো : সভা সমাজের লোকেরা ময়লা-আবর্জনা বা মলমূত্র ত্যাগ করে পরিবেশ নোংরা বা অপবিত্র করে

www.pathagar.com

তোলে, ঝাড়ুদার বা সম্মার্জন শিল্পীরা সে সমস্ত অঙ্গন নির্দ্বিধায় শুদ্ধ, সুন্দর বা পবিত্র করে থাকে তাই এরা অঙ্গন সুন্দর। বর্তমানে অফিস, আদালতে অথবা অন্যত্র এক শ্রেণির ঝাড়ুদার নিয়োগ করা হলেও এরা প্রায় অনেকেই সাধারণ সম্প্রদায়ের লোক। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জন্মসূত্রে ধাঙর বা মেথর শ্রেণির লোকেরা তাদের নিজেদের সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষায় মনোনিবেশ করছে, ফলে তাদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ শিক্ষার্জন করে পেশা পরিবর্তন করছে। পূর্বে এরা সমাজে ছিল অবহেলিত, উপেক্ষিত কিন্তু আজ এরা উপেক্ষিত এবং অশ্রদ্ধার নয়।

ফরিদপুর জেলা শহরের আলীপুরের যে 'বান্ধব পল্লী' গড়ে ওঠেছে মূলত এখানেই অত্র জেলার ধাঙর বা মেথর শ্রেণির বসবাস। জানা যায়, প্রায় দুশত বছর পূর্বে ব্রিটিশ শাসনামলে যখন ফরিদপুরে মিউনিসিপ্যালেটি প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন এই সম্প্রদায়কে ভারতের এলাহাবাদ, ভাগলপুর, কাঠিয়া থেকে আনায়ন করা হয়েছিল। নগর পত্তনের সাথে এদের আগমন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। উল্লেখ্য যে, এরা যথেষ্ট কর্তব্য পরায়ণ সম্প্রদায়। ঝড়, বৃষ্টি অথবা অন্য যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়িয়ে প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বেই ফরিদপুর শহরের বিভিন্ন রাস্তা, অলিগলি এবং নর্দমা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে থাকে। পূর্বে এই শহরে পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য খোলা পায়খানা থেকে মলমূত্র সংগ্রহ করে ড্রামে ভর্তি করে তাদের এক গরুর গাড়িতে করে 'ময়লাগাড়ি' নামক স্থানে ফেলত। আজ অবশ্য তা চোখে পড়ে না। এই শহরে সর্বসাকুল্যে বর্তমানে তাদের সংখ্যা দুইশতাধিক।

৬. বণিক/স্বর্ণকার

বণিক বা স্বর্ণকার নৃতাত্ত্বিক লোকশিল্পে কারিগর। এদের আবির্ভাব প্রাচীনকাল থেকেই। ঋগবেদ, মনসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, কামসূত্র, নিরুক্ত, মানসোল্লাম, পানিনি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের কর্মকৌশলে কথা বলা হয়েছে। ইতিহাস বলে, সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত সোনা-রূপা ব্রোঞ্জের অলংকার এদের প্রাচীন নিদর্শনের নামান্তর। বগুড়ায় মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি থেকে প্রাপ্ত কলা চিত্রেও গহনার উল্লেখ দেখা যায়।

বণিক বা স্বর্ণকার সম্প্রদায়ের কাজ এক সময় পরিবারভুক্ত ছিল। বিশেষ করে পরিবারের পুরুষ ছেলেরা বংশানুক্রমে পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমানে অবশ্য এ ধারণা বদলে গেছে। যে কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা এই পেশায় জড়িত হয়ে পড়েছে। এই পেশার সঙ্গে যারা বংশানুক্রমিক অথবা অভিজ্ঞতার আলোকে জড়িত তারা মূলত এক ধরনের শিল্পী। প্রশিক্ষণ এবং নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে এরা মানুষের সৌন্দর্য বর্ধনে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-মাথা, নাক, কান, গলা, বাহু, হাতের কব্জি, কোমর ও পায়ের অলংকার তৈরি করে থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত শঙ্খ বা শাঁখা নামক

www.pathagar.com

নৃতাত্ত্বিক গহনাও এই বণিক সম্প্রদায়ের হাতে প্রস্তুত হয়। বাঙালি সমাজে নাকফুলবিহীন বিবাহ কল্পনা করা যায় না। কারণ স্বামীর দেয়া নাকফুলে স্ত্রীর উপর অধিকার জন্মে। স্বামীর মৃত্যু ঘটলে তৎক্ষণাৎ নাকফুল খুলে ফেলা হয়। অর্থাৎ আমাদের হাজার বছরের সংস্কার পরিচর্যাও হচ্ছে এই শ্রেণির হাতে নির্মিত অলঙ্কারের মাধ্যমে।

ফরিদপুর জেলার প্রত্যেকটি উপজেলা সদরে, হাট-বাজারে বণিক তথা স্বর্ণকার সম্প্রদায়ের অবস্থান দেখা যায়। ফরিদপুর শহরের নিলকুটিতে এতদঞ্চলের প্রসিদ্ধ গহনা শিল্পের কারখানা গড়ে উঠেছে। সেখানে সহস্রাধিক লোক এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি লোকচিকিৎসা। এ চিকিৎসা কোনো ভুঁইফোঁড় চিকিৎসা পদ্ধতি নয়; ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এ চিকিৎসা পদ্ধতির একটি ইতিহাস আছে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন গোষ্ঠী রোগমুক্তির জন্য প্রকৃতির সাহায্য প্রার্থনা করত। এক্ষেত্রে আগুন, তাপ, কয়লা, ছাই, মাটি, ঝরনার পানি, শিশির, কাদা, লতাপাতা, শিকড়-বাকলের রস চর্বি, গিরিমাটি এবং নানাবিধ রং ব্যবহৃত হতো। লোকচিকিৎসা শুধু রোগীর রোগ মুক্তি বা উপশমের উপরই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের অনিষ্টের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানুষকে দেহরক্ষা, শত্রুনিধন ও জীবন সংরক্ষণের জন্য তার সহযোগী প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির সহায়তা যেমন- মাটি, গাছ, লতা-পাতা, শিকড়-বাকড় ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করতে দেখা গেছে। বস্তুত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এসকল লোকচিকিৎসার ঐতিহ্য বিদ্যমান। ইতিহাস, সাহিত্য, পুথি-কিতাব, লোকগাথায়, উপকথায়, প্রবাদ-প্রবচনে ও কিংবদন্তিতে এর নজীর দেখা যায়।

ক. লোকচিকিৎসা

লোকচিকিৎসার উপাদান

গাছ-গাছড়া, তন্ত্র-মন্ত্র, যাদু-টোনা, উচাটন, শিঙ্গা লাগানো, ঝাঁড়ফুঁক, তেলপড়া, পানিপড়া, গুড়পড়া, কড়িপড়া, ফলমূল, কবজ ছাড়াও কালিকাগজ, সুতা, আয়াত প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয়। লোকচিকিৎসকগণ বিভিন্ন প্রকার গাছ-গাছড়ার ছাল, শিকড়-বাকড়, লতাপাতা, ফুল-ফল ও শিকড়ের রস, জলজ ও স্থলজ প্রাণীর রক্তমাংস, হাড়-গুলম প্রভৃতি রোগীর মাথায়, কোমরে, হাতে ও পায়ে লাগায় অথবা বেঁধে দিয়ে চিকিৎসা করে। কোনো কোনো রোগে (ভয় পাওয়া) আগুনের ভলকা, আবার কখনো (ভূত-প্রেত, জীনে ধরা) কর্কশ কথায়, গালি-গালাজ, চপেটাঘাত এমনকি লাঠিপেটা করে রোগীর চিকিৎসা করা হয়। মন্ত্রতন্ত্র যপে ঘরবন্ধ, দেহবন্ধ এমনকি পুরো বাড়িটাই বন্ধ করে দেয়া হয়।

লোকচিকিৎসা সম্প্রদায়

পির-দরবেশ, সন্ন্যাসি-পুরোহিত, ফকির, ওঝা, গুণীন, ইষৎ বদ্দি, দাই, হাজাম, হাকিম, কবিরাজ। অঞ্চল বিশেষে এসব নামের ভিন্নতাও রয়েছে।

www.pathagar.com

রোগের বিবরণ

দাঁতের রোগ (দাঁতের পোকা), বাগী, গর্মী, চোখের রোগ, সাপেকাটা, গলায় মাছের কাটা আটকানো, কলেরা, বসন্ত, বিষলাগা, শিয়াল-কুকুরের কামড়, বিড়ালের কামড়, শিশুরোগ, মাথাধরা, বিছের হুললাগা, জণ্ডিস, হাড় মচকানো বা ভাঙ্গা, শিং মাছের কাঁটা, জোঁক লাগা, প্রসবকষ্ট, সূতিকা, ভয় পাওয়া, হাপানি, চোখে ধুলিপড়া, শিশুর বিছানায় প্রসাব করা, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, বুকে দুধ হ্রাস পাওয়া অথবা বৃদ্ধি, শরীর ক্ষয়, আধ-কপালী, মাথা ব্যথা প্রভৃতি। এছাড়া লোকচিকিৎসকগণ শিশুর ক্রন্দন, জীবনে ভূত-পেতনি আছর, বাওলাগা, চোরবন্ধ, মৌমাছি বন্ধ, সাপের উপদ্রব থেকে ঘরবাড়ি বন্ধ, নারী-পুরুষ বশীকরণ, কু-নজর, খেলোয়াড় বশীকরণ, বাণমারা, ছিড়া-মুড়ি-পিঠা নষ্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। গৃহপালিত পশু-পাখির বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাও এরা দিয়ে থাকে। বিশেষ করে গরুদাগান, কাঁধে দাদ, গরুর খুড়া রোগ, মুখের অরুচি, গাভীর দুধ বৃদ্ধিজনিত চিকিৎসা উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ যে, লোকচিকিৎসার ক্ষেত্রে পেশাদার অথবা অপেশাদার এই দুই শ্রেণির চিকিৎসকের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। সাধারণত বয়স্ক মহিলা অথবা পুরুষ এ পেশায় নিয়োজিত। এরা কখনও শুনে, কখনও রোগী দেখে ঔষধপত্র দেন। জানের সদকা হিসেবে এরা সামান্য পয়সা-কড়ি যেমন- পাঁচআনা, পাঁচসিকা, পাঁচপয়সা নেন, কখনও একশত টাকাও গ্রহণ করতে দেখা যায়। কেউ কেউ বাৎসরিক ওরসের সময় অর্থকড়ি অথবা অন্য কোনো দ্রব্যাদি গ্রহণ করে থাকে। এরা প্রাপ্ত অর্থকড়ির একটি অংশ নিজ বাড়িতে অথবা মসজিদ-মন্দিরে অথবা আশ্রমে সিন্নি করে দেয়। এরা নিজেদের চিকিৎসা পদ্ধতির গুণাগুণ বজায় রাখার স্বার্থে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, তিথি এবং সময়ক্ষণ অনুসারে বিভিন্ন নিয়মাচার পালন করে এবং কখনও কখনও তিথি-ক্ষণ বিচার করে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকে। কোনো কোনো চিকিৎসক এবং তার ভক্তরা রোববার-মঙ্গলবার মাছ খায় না আবার কেউ কেউ সারা জীবনেও গরুর মাংস ভক্ষণ করে না। তাদের পোশাক-আশাকেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

এ জেলার কতিপয় লোকচিকিৎসক

ফরিদপুর জেলার কতিপয় লোকচিকিৎসকদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো। এক সময় এই সকল লোকচিকিৎসকের বাড়িতে শত শত লোকের আগমন ঘটত।

রোকন ফকির (মৃত্যু)

গ্রাম- বিলনালিয়া, ইউনিয়ন-কৈজুরী, উপজেলা-ফরিদপুর সদর। সর্বরোগের চিকিৎসা করতেন। তিনি রোগী অথবা রোগী কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তির নালিশ গ্রহণ করে স্বপ্নে পাওয়া তদবীর মনে মনে পড়তেন; কোনো ব্যবস্থাপত্র দিতেন না এবং চিকিৎসার জন্য কোনোরূপ অর্থকড়ি গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। মূল পেশা কৃষিকাজ।

ধুনাই মণ্ডল (মৃত্যু)

গ্রাম-বাখুণ্ডা, ইউনিয়ন-গেরদা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর। শিশু রোগের চিকিৎসা দিতেন। বিশেষ করে ভয় পাওয়া রোগীকে আগুনের 'ভলকা' দিতেন। 'জানের ছদকা'

www.pathagar.com

হিসেবে যে যা দিতেন তাই গ্রহণ করতেন। বৃষ্টির ওঁঝা বলে খ্যাত ছিলেন। মূল পেশা শ্রমজীবী।

হাচন ফকির (মৃত্যু)

গ্রাম-রঘুয়াপাড়া, ইউনিয়ন-গেরদা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর। তিনি শিশুরোগ, মহামারী, যৌনরোগ, ভূত-প্রেত ইত্যাদির চিকিৎসা দিতেন। বশীকরণ কাজে পটু ছিলেন। মূল পেশা লোকচিকিৎসা।

ইসহাক ফকির (মৃত্যু)

গ্রাম-বাখুণ্ডা, ইউনিয়ন-গেরদা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর। সাপের ওঁঝা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মূল পেশা শ্রমজীবী।

কুলীন মাঝি (মৃত্যু)

পশ্চিম খাবাসপুর, ফরিদপুর। ধীবর সম্প্রদায়ের লোক। ইনি বিষ-ব্যথার জন্য শশুকের তৈল দিয়ে এক ধরনের মালিশ প্রস্তুত করে চিকিৎসা দিতেন। মূল পেশা মৎস্য শিকার।

শমসের ফকির

গ্রাম-বাখুণ্ডা, ইউনিয়ন-গেরদা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর। ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করেন। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। মূল পেশা চায়ের দোকানদার।

আবদুল মান্নান মোল্লা (৬০)

গ্রাম-বাখুণ্ডা, ইউনিয়ন-গেরদা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। পিঠা ও মুড়ি নষ্টের মন্ত্র জানেন। মূল পেশা কাঠমিস্ত্রি।

মহিউদ্দীন (৬০)

পাকিস্তান পাড়া, ফরিদপুর শহর। শুধুমাত্র জ্বিন-পরি, ভূত-প্রেতের আসর ছাড়িয়ে থাকেন। চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থকড়ি লাগে। সম্পূর্ণ পেশাধারী। মূল পেশা মাদ্রাসা শিক্ষক।

জুলেখা বেগম (রহমানের মা)

গ্রাম-বাখুণ্ডা, ইউনিয়ন-গেরদা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর। উত্তম 'ধাত্রী' হিসেবে সুনাম আছে। সান্নিপাত জ্বরে গাছের শেকড় দিয়ে তাবিজ করে দেন। কোনোরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। মূল পেশা গৃহিণী।

আবুল হাশেম (৬০ মৃত্যু)

গ্রাম-বাখুণ্ডা, ইউনিয়ন-গেরদা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর। সাপের ওঁঝা বা গুণীন নামে পরিচিত। মূল পেশা মাছ ধরা।

www.pathagar.com

ইয়াছিন ফকির (৬৫)

গ্রাম-সাঁচিয়া, ইউনিয়ন-কৈজুরী, ফরিদপুর সদর। শুধুমাত্র হাড়ভাঙ্গা চিকিৎসা করে থাকেন। চিকিৎসার সেলামী গ্রহণ করেন। জেলার বাইরে নাম ডাক রয়েছে। মূল পেশা লোকচিকিৎসা।

হাসান হুজুর (৪০)

গ্রাম-শোভারামপুর, ফরিদপুর শহর। জ্বিন-পরী ছাড়ানোসহ বিভিন্ন মেয়েলি রোগ ও মনবাসনা পূরণের তদবীর দিয়ে থাকেন। জানের ছদকা হিসেবে নামমাত্র অর্থকড়ি গ্রহণ করেন। মূল পেশা মসজিদের ইমামতি।

ছবর চান ফকির (মৃত্যু)

কুতুবপুর, ফরিদপুর। তিনি চিশতিয়া তরিকার একজন মুরিদ ছিলেন। ঝাড়-ফুঁক ও তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা দিতেন।

মুফতি আবদুল কাদের (মৃত)

নগরকান্দা উপজেলা নিবাসী। ফরিদপুর শামসুল উলুম মাদ্রাসার মুফতি ছিলেন। জ্বিন-পরী আসর ছাড়ানোসহ শিশুরোগের তাবিজ-কবজ পানিপড়া, ঝাড়ফুঁক দিতেন। অর্থকড়ি গ্রহণ করতেন।

ইউনুচ মোল্লা (মৃত্যু)

গ্রাম-বাখুণ্ডা, ইউনিয়ন-গেরদা। শুধুমাত্র দাঁতের পোকার চিকিৎসা জানতেন। বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতেন। মূল পেশা কৃষিকাজ।

বাতেন মাস্টার (৬৫)

গ্রাম-বাখুণ্ডা, ইউনিয়ন-গেরদা। ভয় পাওয়া রোগীকে আগুনের 'ভলকা' দিয়ে চিকিৎসা দিতেন। মুর্শিদি, মারফতি ও বিচারগানের তত্ত্বজ্ঞানী। পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

খ. তন্ত্রমন্ত্র

প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বশ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে তন্ত্রমন্ত্রের উদ্ভব। যাদুবিদ্যার একটি প্রধানত তাৎপর্যময় অংশ হলো তন্ত্রমন্ত্র। অলৌকিক বা অতিলৌকিক শক্তির প্রতি মানুষের বিশ্বাস থেকে তন্ত্র মন্ত্রের সৃষ্টি। সভ্যতার শুরু থেকে তন্ত্রমন্ত্র এবং যাদুবিদ্যা প্রচলিত হয়ে আসছে। আজকের পৃথিবীর সর্বত্রই তন্ত্রমন্ত্র চর্চা করতে দেখা যায়।

মন্ত্র হল একটি বিশেষ অতিপ্রাকৃত শক্তি। যে শক্তির সাহায্যে ভালো অথবা মন্দ দুইই করা চলে। যারা তন্ত্র-মন্ত্রের চর্চা করেন তারা গুণী, গুণীন ও ওঁঝা নামে পরিচিত। স্ত্রীলোক এই শক্তির অধিকারী হলে কোনো কোনো সমাজে তাকে ডাইনিও বলা হয়। এরা পানিপড়া, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ প্রভৃতি পদ্ধতিতে অসুস্থ রোগীকে আরোগ্য লাভ করায়। সাপের ওঁঝা মন্ত্র বলে সাপকে বশ করে এবং সর্পদংশনে কাতর ব্যক্তিকে

www.pathagar.com

মন্ত্রের দ্বারা আরোগ্য করেন। বাংলার লোক সমাজে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের সঙ্গে চণ্ডি, কামাখ্যাদেবী, মহাদেব, কালী, ষষ্ঠী, আল্লাহ-রসুল, রামলক্ষণ, সীতা, নরসিংহ, কংসাসুর, গুরু, মুর্শিদ প্রমুখের নাম উচ্চারণ করেন। বিশ্বাস করা হয়, এদের উল্লেখে মন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগে প্রায়শই যে সকল উপাদান ব্যবহৃত হয় তা হলো : শশ্মানের মাটি, মানুষের শরীরের ময়লা, চুল, নখ, বিশেষ কয়েকটি জীবজন্তুর হাড়, চামড়া, দাঁত, মাংস, রক্ত, বিশেষ বিশেষ পাখির নখ, রক্ত, মাংস, কোনো কোনো বিশেষ সরীসৃপ, বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল, শিকড়, ফুল-দুল; সোনা-রূপা, তামা ইত্যাদি ধাতু; পাথর, কড়ি, ঝাটা, চালুনি প্রভৃতি।

তন্ত্রমন্ত্র, উচাটন, মারণ, বশিকরণমূলক অভিচার-শিক্ষণ সাধারণত দেয়া যায় নির্দিষ্ট তিথিতে, বিশেষত অমাবশ্যার রাতে এবং তে-মাথার মোড়ে অথবা কোনো বটবৃক্ষের তলায়। মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে শিলাবৃষ্টি, ঝড়-তুফান থেকে রক্ষা, অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বৃষ্টি নামানো, ভূত-প্রেত তাড়ানো, জ্বিন হাজির; চোরের হাত থেকে গৃহবন্দি, সাপের বিষ নামানো, বশীকরণ, জটিল রোগের চিকিৎসা; কলেরা-বসন্ত রোগের দেবী ওলাবিবি ও শীতলা দেবীকে হাজির করানো।

বশীকরণ মন্ত্র

১.

ঘোর কলিতে ঘোর
শিবের মাথায় জটা
চাইর বন্দনা কইরা
অমুকের কপালে মারলাম ফোঁটা,
দোহাই আলী, দোহাই কালির
দোহাই মহাদেবের,
আমার এই জ্ঞান যদি নড়ে
ব্রহ্মার জট ছিড়ে
ভূমন্তে পড়ে।

২.

অজন ঘাটে নিজল পানি
হেই ঘাটে ষোলশ ডাকিনী,
ডাকিনী ডাইক্যা কয়
অমুককে তুই আয়,
এই পানি পইড়া খাইলাম
তোর পাঁচ পরাণ কাইড়া আনলাম
কার আজ্ঞে,
মা কালীর আজ্ঞে।

www.pathagar.com

সাপের মন্ত্র

দেবী গেলেন গিরি হিমালয় পর্বতে
পাইয়া আইলেন তিলিক চান্দে ফোটা
তাইতে জন্মাইল কলতে কোমারবেটা
বেটার নাম যাই
সঞ্চয় স্মরণে এই বিষ লবণ পড়ায় নাই,
কার আজ্ঞে,
আমার জ্ঞান যদি নড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জট ছিঁড়ে
ভূমন্তে পড়ে।

৩.
উপরে ধোপার ঝি
কাপড় কাচে পদ্ম পাতায় বিষ
ধোপার ঝি তুমি আমার শীদ
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলাম অষ্টনাগের বিষ।

ভয় থেকে মুক্তির মন্ত্র

করাত করাত
মহা করাত
আসতে কাটে
যাইতে কাটে
হেত কাটে
ভূত কাটে
করাতে করাত কাটে
থমলে থম কাটে
পানিতে পানি কাটে
আগুনে আগুন কাটে
এই কথা যদি নড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জট খসে
ভূমন্তে পড়ে।

আমাশয় রোগ মুক্তির মন্ত্র

আমশূল সামশুল
দেবী রইছে ঘাটে
মহারাজ ঢেঁকি পড়ে
বইসা কর কি?
নিজের শূল নিজে খাইছে

www.pathagar.com

তোমরা কর কি?
আমার এই কথা
জাইনা যে না কয়
তার বংশ নিবংশ হয়
আমার এই কথা যদি নড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জট ছিঁড়ে
ভূমস্তে পড়ে।

ভূত চালানের মন্ত্র

১.
ভূত পিশাচ
জীবন পরি
দেব দেবতা
পঙ্গা মা
কালি মা
আইটা চটা
কাঞ্চি চাটা
ছেচড়া চোরা ভাই
ছেচড়া চোরা,
কাল দৃষ্টি বাদম
যত রকম বদ থাকো
সত্যের আসনে অমুকের গায় হাজির হও,
আমার এই কথা যদি নড়ে
ছত্রিশ কোটি দেব দেবীর মাথা খাইছ
দোহাই তোর দক্ষিণ রায়ের।

২.
কালী কালী মহাকালী
নীল কালী ফুল কালী
ব্রহ্মা কালী কৃষ্ণকালী
হাওয়া কালী
তিনশো চৌষট্টিকালি
অমুকের কণ্ঠে করো ভার
উঁচু চালান
শুচো চালান
চার কোন পৃথিবী চালান
উত্তরে থাকে উত্তইরা চালি
পূর্বে থাকে পূর্ব চালি

www.pathagar.com

দক্ষিণে থাকে দক্ষিণা চালি
পশ্চিমে থাকো পশ্চিমা চালি
চালিয়ে করলাম সার।

মৌচাক কাটার মন্ত্র

মাছি মাই চেনি
সোহগগিনি
কানে কুণ্ডুলী,
মস্তকে পাক
আমার মন্তরে মাছি
আথাল জুইয়া থাক,
থাক মাছি আথাল জুইয়া
আমি আসি লংকা ঘুইরা
লংকা থিকা দিলাম ডাক
জাগা ছাইড়া তফাৎ থাক,
আমার এই কথা যদি নড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জট ছিড়া
ভূমন্তে পরে।

দেহ বন্দের মন্ত্র

ধুলো ধুলো পর্বত তুলে নিলাম হাতে
আমি যেখানে যাবোরে মা যাবা আমার সাথে
আমারে ছেড়ে যদি যাও শিবেরও দোহাই
খড়গ হাতে করে মা করে হুংকার
কার আছে টবরাগী জয় কালী আজ্ঞা
শিগির শিগির আমার হাড় মাংস
রক্তে এসে ভর কর দোহাই মা।

চোর বন্দের মন্ত্র

মাচার তলে খুদের হাড়ি
চোরের মাগ দুফুরে নাড়ি
একখান কাচি দুই খান দাও
চোরের কাটি হাত আর পাও
রাগ বাগ ফাহা থাক চুরা আস্তোর ফলা
হাত বন্দনা পা বন্দন চোখ নাক মাজা বন্দন
সোয়া হাত মাটি বন্দন
আমি এইখানে থাকিয়া আমার এই মন্ত্রের যদি নড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা খসে ভূমন্তে পড়ে
দোহাই মা কালী।

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধা শব্দটি এসেছে 'ধন্ধ' শব্দ থেকে। সার অর্থ ধোকা, সংশয়, দুরূহ সমস্যা, কৌতূহলজনক ও বুদ্ধি-বিভ্রমণকারী প্রশ্ন। রূপক, সংকেত উপমা, তুলনা, অতিশয়োক্তি, শ্লোক ইত্যাদির সাহায্যে রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন রচনা করা হয়। ধাঁধার নিদর্শন প্রাচীন। গ্রিক পুরাণে ধাঁধার প্রমাণ রয়েছে। স্ফিংস ইডিপাসকে 'মানুষ' সম্পর্কিত ধাঁধাটি করেছিল। ইডিপাস উত্তর দিয়ে নিজের ও থিবসের নগরবাসীদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। আফ্রিকার বাথোঙ্গা গোত্র, ডাচ ইস্টইন্ডিজের সিলিবিসের আদিবাসীদের মধ্যে ধাঁধার বিশ্বাস কালক্রমে সংস্কারে রূপ নিয়েছে।

ইহুদিদের গ্রন্থাবলি, বাইবেল, ইরানি ও আরবি সাহিত্যে অসংখ্য ধাঁধার নিদর্শন লক্ষ করা যায়। ঋগ্বেদ, সংহিতায় ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে হোতৃ ব্রাহ্মণগণ একে অপরকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করতেন। মহাভারতে বকরূপ যক্ষ পঞ্চপাণ্ডবকে ধাঁধা জিজ্ঞাস করেছিলেন। বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন গোত্রের আদিবাসী বিবাহানুষ্ঠানে, কৃষিকাজে, মৃতদেহ সৎকারে, মন্ত্রাচারে ও ধর্মকর্মে ধাঁধার অনুশীলন করে। ছোট নাগপুরের ওঁরাও উপজাতির বিবাহ অনুষ্ঠানে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা হয়। বাংলার ও আসামের নাগা, কুকি, গারো, কোচ, মুরং উপজাতির কৃষকেরা ফসল পাকার সময় ধাঁধা বলে অনন্দ প্রকাশ করে। মধ্য প্রদেশের গঁড় উপজাতির লোকেরা মৃতের অন্তেষ্টিক্রিয়ার একটি অঙ্গ হিসেবে ধাঁধা চর্চা করে। ফরিদপুর জেলার বিবাহ অনুষ্ঠানে 'দরবারীশোলক' নামক এক ধরনের ধাঁধার প্রচলন আছে। ধাঁধার উত্তর দিয়ে বর পক্ষকে পান খেতে হয়। আনুষঙ্গিক ধাঁধা বলে একে অপরকে পরাস্ত করেন। বিবাহবাসরে কনের বুদ্ধিমত্তা যাচাই, অথবা জামাইকে জব্দ করার জন্য ধাঁধা ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধাঁধা শব্দটি বিভিন্ন নামে প্রচলিত। বরিশালে 'ভাঙ্গানি' ময়মনসিংহে 'কথা' চট্টগ্রামে 'কিচ্ছা' রংপুরে 'ছিলকা' সিলেটে 'শিমাসা' নোয়াখালীতে 'পিলিকা' রাজশাহীতে 'মান' ও ফরিদপুরে 'শ্লোক'। ফরিদপুরের ধাঁধাগুলো মূলত আখ, উট, উনুন, কলসি, কলার মাতি, কলাগাছ, কচুরিপানা, কাগজের টাকা, কাছিম, খেজুরগাছ, ক্ষুর, গেঞ্জি, মশারি, ঘূর্ণি, চক্ষু, চশমা, চিঠি, ছাতা, জাল, তরমুজ, ঢেঁকি, ডাব, ডিম, ডুমুর, নারিকেল, নৌকা, পালকি, পিঁপড়া, পেঁপে, বড়শি, বাঁশ, বিচ্ছা, বিজলি, মরিচ, রৌদ্র, শামুক, হুক্কা বিষয়ক প্রভৃতি।

সংগৃহীত ধাঁধা

১. এক আটনে দুই চাল
দেখরে বিটা খোদার কাম।
- কলার পাতা

২. উবটান, বুকটান
কোন বস্তুর তিন কান।
- কাগজের টাকা

www.pathagar.com

৩. কালো কালো ভোমরা কালো ঘাস খায়
সন্ধ্যা হলে ভোমরা খোয়ারেতে যায়।
- ক্ষুর

৪. উড়ে যায় পাখি
নাড়ি ধরে রাখি।
- ঘূর্ণি

৫. ইট ঘুঘুর পিঠটান
কোন ঘুঘুর তিন কান।
- উনুন

৬. মাইটা আতুল কাঠের গাই
বছর বছর দুয়াই খাই।
- খেজুর গাছ

৭. এক মায়ের দুই ছেলে
কেউ কারে দেখতে না পেলে।
- চক্ষু

৮. কোন মা মা নয়।
- চশমা

৯. আট কুঠুরি উনিশ ঠ্যাং
আছে কাপড়ের তলে,
ঠেলা দিলি ঘুইলা পড়ে।
- ছাতা

১০. রাজার বাড়ির হাতি
নিত্য খায় লাত্তি।
- ঢেঁকি

১১. রাজার বউরানি
কে বাটরায় দুই রকম পানি।
- ডিম

১২. আগায় থর থর গোড়ায় মোটা
বিনিফুলে ধরে গোটা।
- ডুমুর

১৩. মাটির উপর কাঠ, কাঠের উপরে পাতা
পাতার নিচে ফুল, ফুলের ভেতরে মাথা।
- নারিকেল

১৪. হাত নাই পাও নাই পিঠ দিয়া চলে
চাঁন নাই সূর্য নাই দিবারাত্র জলে।
- নৌকা

www.pathagar.com

১৫. কুটি কুটি পানের বিড়া
তার মধ্যে কালিজিরা
সেই পান শহরে যায়
মরা মাইনষে কথা কয়।
- চিঠি

১৬. জন্ম ধলা কর্ম কালা
গলায় গজমাতির হার
উইড়া গিয়া ধইরা আনে
মুনিষ্যির আদার।
- জাল

১৭. চার পায়ের জিনিস আমি, আট পায়ে হাঁটি
রাক্ষস না খাকোস না, আনাম মানুষ গিলি।
- পালকি

১৮. একটুখানি চেমড়ারা দুধভাত খায়
আড়াই হাত মাটির তলায় যুদ্ধ করতে যায়।
- পিঁপড়া

১৯. ঘরের মধ্যে ঘর
তার মধ্যে পইড়া মর।
- মশারি

২০. লাঠি ভন ভন লাঠি ভন ভন লাঠি নিল চোরে
সারা দেশে আগুন লাগছে কে নিভাইতে পারে।
- রৌদ্র

২১. মামারা উড়ুক চিড়া খায়
ভাগনারা গেলে ঘর দুয়ার দেয়।
- শামুক

২২. দুই অক্ষরে নাম তার জলে বাস করে
মাছও না কাছিমও না মানুষ খায় তারে।
- হুক্কা

২৩. চিৎকরে শুয়ায়ে দুই হাতে চেপে
ছোট-ছোট ঝাঁকা দিলে
কানের দুল নড়ে।
কালি দাস পণ্ডিত কয়
যা ভাবিছো তা নয়
কথা যদি হয় ভণ্ড
পাঁচ শিকে দাও দণ্ড।
- পাটা-পুতো

www.pathagar.com

২৪. দিয়ে মুই
জঠ খুলি
কালিদাস পণ্ডিত কয়
যা ভাবিছো তা নয়
কথা যদি হয় ভণ্ড
পাঁচ শিকে দাও দণ্ড।
- খড়কি

২৫. চামের ভিতর
চাম ঠেলি
কালিদাস পণ্ডিত কয়
যা ভাবিছো তা নয়
কথা যদি হয় ভণ্ড
পাঁচ শিকো দাও দণ্ড।
- জুতা

২৬. উড়ায় মুড়ায়
ছ্যাপ দিলি খাড়ায়
কালিদাস পণ্ডিত কয়
যা ভাবিছো তা নয়
কথা যদি হয় ভণ্ড
পাঁচ শিকে দাও দণ্ড।
- সুঁই সুতো।

২৭. দুই ঠ্যাং ফাঁক করে
মধ্যি দিলো ভরে
ঠাসা দিলো যখন
কাজ হলো তখন
কালিদাস পণ্ডিত কয়
যা ভাবিছো তা নয়
কথা যদি হয় ভণ্ড
পাঁচ শিকে দাও দণ্ড।
- সুপারি ও যাতি (সরতা)

২৮. পুড়ায় নুমা ঝুমা
ফুটোলি গন্ধ কয়
কালিদাস পণ্ডিত কয়
যা ভাবিছো তা নয়
কথা যদি হয় ভণ্ড
পাঁচ শিকে দাও দণ্ড।
- পেঁয়াজ রসুন

www.pathagar.com

২৯. আছে ফল দ্যাশে নাই
খাই ফল তার চুঁচা নাই ॥
- বৃষ্টির শিলা

৩০. দুই তক্তার নাও
দুই দাঁড়ে বাও
দুই পাশে দুই ভুচুম নাঁচে
তারই মানে কও ॥
- মই

৩১. নামে আছে কামে নাই
কিনতে গেলে দাম নাই ॥
- ঘোড়ার ডিম

৩২. দুই হাত কুড়ি আঙ্গুল নাকটা
চোখ কান নাই
সে কোন ফেরেশতার ভাই
কালিদাস পণ্ডিত কয়
যা ভাবিছো তা নয়
কথা যদি হয় ভণ্ড
পাঁচ শিকে দাও দণ্ড ॥
- মানুষ

৩৩. আগায় ঝন ঝন
গুড়ায় বান্ধন
এই শ্লোকের মানে যে কতি না পারবি
তার চৌদ্দ গুষ্ঠি শুদ্ধ বান্দর ॥
- ঝাটা

৩৪. ওরে আল্লা হলো কী
আসমানেতে পলো কী
ঘর বারোলে দুয়োর দে
আমি বারোবো কী দে ॥
- খ্যাপলা জাল

৩৫. ফকিরি ফকিরি গাঁথা
এক ফকিরির পাছার ভিতর
আরেক ফকিরির মাথা।
কালিদাস পণ্ডিত কয়
যা ভাবিছো তা নয়
কথা যদি হয় ভণ্ড
পাঁচ শিকে দাও দণ্ড।
- টুপি

www.pathagar.com

৩৬. জন্ম দাতায় জন্ম দিলো না
জন্ম দিলো পরে
যখন ছেলে জন্ম নিলো
মা ছিল না ঘরে।
পিতা হলেন ভগ্নিপতি
ভগ্নি হলো মা,
এমন আশ্চর্য কথা কভু শুনিনা ॥
- লব-কুশ

৩৭. চলিতে চলিতে
মাথা হলো ভার
মাথা কেটে দিলে
চলিবে আবার।
- পেন্সিল

৩৮. হাতা আছে
মাথা নাই
আস্ত মানুষ
গিলে গাই।
- জামা

৩৯. আল্লার কী কুদরত
গাছের মাথায় শরবত।
- ডাব

৪০. দিলি খায় না
না দিলি খায় ॥
- গরুর মুখের টোনা

৪১. তিন তক্তার নাও খানি ষোল দাড়ে বায়
আহ কি সুন্দর নাও শুকনা দিয়া যায়।
- মই

৪২. ছোট বেলায় ঘোমটা দিয়ে যায় যে শ্বশুর বাড়ি
যৌবনে যায় ন্যাংটা হয়ে পরে না আর শাড়ি।
- বাঁশ

৪৩. এই যে আছে ঐ যে নাই।
- মেঘের ছায়া

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

লোকসাহিত্যের অন্যতম একটি ধারা প্রবাদ-প্রবচন। ইংরেজি Proverb অর্থ প্রচলিত বাক্য; বাংলায় প্রবাদ বাক্য। ল্যাটিন Provertio, গ্রিক Paroemia, স্প্যানিশ Refran, তুর্কি Alatol sozu, রুশ Poslovista, আরবি Mathal, হিব্রু Mashal; সংস্কৃতি-আভানক, পয়োবাদ; হিন্দিতে লোকোক্তি, কহনাবত, কহাবত; রাজস্থানিতে ওখানী, মারাঠিতে অনো; গুজরাটিতে কহেবত; প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রবাদ বলতে- যেসব প্রাজ্ঞ উক্তি লোক পরম্পরায় জনশ্রুতিমূলক ভাবে চলে আসছে তাই প্রবাদ। প্রাচীন মিশরের Book of dead (৩৭০০ অব্দে) নামক গ্রন্থে প্রথম প্রবাদ স্থান পেয়েছে। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টোটল সর্ব-প্রথম প্রবাদ সংগ্রাহক। খ্রিস্ট-পূর্ব পাঁচ শতকে মিসরের প্যাপিরাসের গল্পে প্রবাদ আছে, ভারতীয় বেদ-উপনিষদ; বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, লাইলী-মজনু, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশিরাম দাসের 'মহাভারত' এবং ভারত চন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' অনেক প্রবাদ স্থান পেয়েছে। ফরিদপুর জেলায় অজস্র প্রবাদ আছে।

কুকুর : যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

কাজী : কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজি।

কিল : ভাত দেবার মুরদ নেই, কিল মারার গোঁসাই।

চালুন : চালুন বলে ছুচ তোর গুদ ছেঁদা।

চোর : চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

ঝি : ঝিকে মেরে বউকে শিখান।

ঝোপ : ঝোপ বুঝে কোপ মারা।

ঢেঁকি : ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

নাপিত : নাপিত দেখলে কেনি আঙ্গুল বাড়ে।

পাগল : এক পাগলে ভাত পায়না, অন্য পাগলের আনাগোনা।

ফোঁড়ে : আড়ে নাই ফোঁড়ে আছে।

ফকির : ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে।

বাটপার : নেংটার আবার বাটারের ভয়।

বাপ : নিজে বাঁচলে বাপের নাম।

ভাত : পেটে ভাত নেই নাঙের উৎপাত।

মা : মায়ের কাছে মাসীর খবর।

লাভ : লাভে লোহা বয় বিনা লাভে সোনা বয়না।

শকুন : শকুনের দোয়ায় (শাপে) গরু মরে না।

খাজনা : খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি।

গঙ্গা : ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

www.pathagar.com

'প্রবচন' আভিধানিক অর্থে প্রবাদেরই নামান্তর। প্রবাদের পরিপূরক শব্দ হচ্ছে প্রবচন। প্রবচন মূলত বাচ্যার্থ নির্ভর; এতে রূপক, প্রতীক, সংকেত চিত্রকল্পের স্থান নেই। সাধারণ গদ্যে অথবা অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দোবদ্ধ পদ্যে প্রবচন রচিত হয়।

আকাল : কাল অইছে অকাল/ছাগল চাটে বাগের গাল।

ঘুম : মজামারে ফজা ভাই/মধ্যি হান্তা ঘুম কামাই।

ঘোড়া : ঘোড়া আলার ঘোড়া না/সেকেন্দারের ঘোড়া।

জামাই : আসপি জামাই নিবি ঝি/জামাইর গোস্বায় হবে কি।

ঝি : বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট/পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট।

ধন : দিয়া ধন বুঝে মন/ কাইরা নিতে যতক্ষণ

পানি : সাত ঘাটের পানি খেয়ে/বিড়াল বইসে তপস্যায়।

পাখি : খায়দায় পাখিটি/বনের দিকে আঁখিটি

ফল : মাকাল ফল দেখতে ভালো/উপরে লাল ভিতরে কালো।

বর : আশ্বিনে রান্দে কার্তিকে খায়/যে বর মাঙ্গে সেই বর পায়।

ভাত : উনা ভাতে দুনা বল/অতি ভাতে রসাতল।

ভাত : মেয়ে দিবে ভাত দেখে/বউ আনবে হাড় দেখে।

ভাত : যার ঘরে ভাত নাই/তার কোন জাত নেই।

মা : মুড়ি বল চিড়া বল ভাতের মত নাই/খালা বল, ফুপু বল মার মত নাই।

শ্বশুর : শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি/নিত্য গেলে ঝাঁটার বাড়ি।

সতীন : দুই সতীনের ঘর/আল্লায় রক্ষা কর।

মিশ্র

১. দাতার নারকেল, কৃপণের বাঁশ/কাটো না কাটো বাড়ে বার মাস।

২. যম জামাই ভাগিনা/তিন নয় আপনা।

৩. অভাবে স্বভাব নষ্ট মুখ নষ্ট বচনে/ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে।

৪ হেগে খায় খেয়ে মুতে/তার না ছোঁয় যমদূতে।

সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচন

১. হঁচা মারার যুক্তা নাই
ভর্তা খাওয়ার বাড়া।

২. ভাতে না কাপড়ে
বড় বড় থাপুরে।

৩. ভাত দিবার মরদ নাই
কিল মারা গোঁসাই।

www.pathagar.com

৪. ভাত খাও ভাতারের
গীত গাও নাঙের।

৫. নাক কাইটা দিলাম পায়
ত্যাত্তনা বন্ধু আপন হয়।

৬. শ্বশুর বাড়ি মধুর আড়ি
নিত্যি গেলি ঝাটার বাড়ি।

৭. মজা মারে ফজা ভাই
মধ্যি হ্যালদা ঘুম কামাই।

৮. ভেদা মাছে কেদা খায়
ফুঁটি মাছে পান চিবায়।

৯. তিন দিনকার পরাঙ্গী ধান
খোপা নারা বারাবান।

১০. এদিক নাই ওদিক আছে
বারবাড়ি নাই কাচারি আছে।

১১. যেই আমার বিলেই
তার মুহি এত ব ড় কতা।

১২. সমুদ্রে ডোবালে ঘড়া
যা ধরবার তাই ধরা।

১৩. ভাইরা বাবা ভাতার নাই।

১৪. একে ছাই, তারপরে বাতাস।

১৫. পির মানে না ঘরের লোকে
পির মানে না চিনা জোঁকে।

১৬. মনির বৈরী রাজ্য ছাড়ি
দেশ বৈরী পরাণে মরি।

১৭. অদেখার পাথে ঘি
দেশ বৈরী পরাণে মরি।

১৮. বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট
পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট।

১৯. গিন্নীর পাদে গন্ধ নাই।

২০. মাকাল ফল দেখতে ভালো
উপরে লাল ভিতরে কালো।

২১. ভাগ্যবানের বোঝা ভাগ্যবান বয়।

২২. নয় গা মাগলে যা
সাত গাঁ মাগলে তা।

www.pathagar.com

২৩. কুজাত থেকে নিরবংশ ভালো।
তুলনা: নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

২৪. এক বুড়ি আরেক বুড়ির নানী শাশুড়ি।

২৫. ঢেউ গুইনা পয়সা খাও।

২৬. যার ঘরে ভাত নাই
তার কোনো জাত নাই।

২৭. ভাত নাই ঘরে
মানে কিবা করে

২৮. হাড়ির একটা ভাত টিপ দিলে
সব ভাতের খবর মিলে।

২৯. আগুনে অঙ্গার চিনে
লোহা চিনে কামারে।

৩০. নাই ঘরে খাই খাই।

৩১. ভাতই ভাতার।

৩২. কুজ্জার আবার চিৎকাৎ।

৩৩. ছুচার কাম না মুরগি গেলা।

৩৪. পেয়দার উজির হবার শখ।

৩৫. বাপের নাম নাই
দাদার নাম নাই
ট্যামফুরানের নাতি।

৩৬. হহুলি নাচে ধনে পানে
উনি নাচে বোঁচা কানে।

৩৭. এঙ লাফায় বেঙ লাফায়
খলসে বলে আমিও লাফাই।

৩৮. অ-রাঁধুনির হাতে পড়া রুই মাছ কাঁদে
না জানি রাঁধুনি আমার কেমন করে রাঁধে।

৩৯. খায় লয় বনের ওলা
বনের দিকে চায়।

৪০. খাওয়ার উপর খাওয়া
ডওয়ার উপর শুয়া,
গিন্নি বড় দিল পুরা
গোস্ত থুইয়া বাড়ে সুরা।

৪১. মজা মারে মজা ভাই
মধ্যি হানদ্যা ঘুম কামাই।

www.pathagar.com

৪২. আসপি জামাই নিবি ঝি
জামাইর গোসায় অবে কি।

৪৩. দিয়া ধন বুঝে মন
কাইরা নিতে কতক্ষণ।

৪৪. নারী বাঁচলে পরের
মইলি গোরের।

৪৫. মেয়া মানষ্যির নাওয়া
পুইষ্যা মানষ্যির খাওয়া।

৪৬. সাত ঘাটের পানি খেয়ে
বিড়াল বইসে তপস্যায়।

৪৭. খায় দায় পাখিটি
বনের দিকে আঁখিটি।

৪৮. ছের কাইটা দিলাম পায়
তেওনা বন্ধু আপন হয়।

৪৯. আশ্বিনে রান্ধে কার্তিকে খায়
যে বর মাঙ্গে সেই বর পায়।

৫০. উনা ভাতে দুনা বল
ভরা ভাতে রসা তল।

৫১. মেয়ে দিবা ভাত দেইখ্যা
বউ আনবা হাড় দেইখ্যা।

৫২. ইচা মাছের খুসা
জুয়ান মাগীর বুইড়া ভাতার
নিত্তি করে গুসা।

৫৩. মুড়ি বল চিড়া বল ভাতের মত নাই
খালা বল, ফুফু বল মার মত নাই।
তুলনাঃ অশথের ছায়াই ছায়া
মায়ের মায়াই মায়া।

৫৪. দুই সতীনের ঘর
আল্লায় রক্ষা কর।

৫৫. কুড়ি নেবে গুণে
পথ চলবে জেনে।

৫৬. হেগে খায়, খেয়ে মুতে
তারে না ছোয় যমদূতে।

৫৭. সাপ শালা জমিদার
তিন নয় আপনার।

www.pathagar.com

৫৮. যম জামাই ভাগিনা
তিন নয় আপনা।

৫৯. অভাবে স্বভাব নষ্ট
মুখ নষ্ট বরণে
ঝরায় ক্ষেত নষ্ট
স্ত্রী নষ্ট মারণে।

৬০. ছ্যাপ চলে না দুধ রোজ।

৬১. ডাইনে সাপ বামে শিয়াল
তার হলো মন্দ কপাল।

৬২. নামে ডাহে দরজা কাটে
আড়ি পাতিল কুত্তায় চাটে।

৬৩. নাড়ী কাটতি সোনা কাটা।

৬৪. ভাত পায় না চা মারায়।

৬৫. সোনা থুইয়া মুনার গীত।

৬৬. হাতের কড়ি পায়ে বল
তবে যাই নীলাচল।

৬৭. গুয়ায় নাই গোস্ত
ফুলপ্যান নিয়া ব্যস্ত।

৬৮. আইগ্যা ছোচে না
মুইত্যা নামে গলাপানি।

৬৯. আড়ে নাই ফোঁড়ে আছে
পুটকিতে বাঘা নাম।

৭০. যেই না চেহারা
নাম রাখছে পেয়ারা।

৭১. কিসের মধ্যে কি
পান্তা ভাতে ঘি।

৭২. হেলানির বউ তেলানী
চোরার বউ গিন্নী।

৭৩. চালুন বলে ছুচরে
তোর গুদ ছেঁদা।

৭৪. পড়েরে কই কলই চোরা
নিজের মাথায় এক বোঝা।

৭৫. গ্যাং মরিলে র‍্যাগ থাকে বার বছর।

৭৬. সেই শোয়াই শুইলি

www.pathagar.com

তবে কেন নৎ খসালি।

৭৭. হাতে যদি নাই ধন
দশে হও এক মন।

৭৮. অনেক ভাইয়ের ভাই
হিখান পাথান নাই।

৭৯. গিন্নি বড় দেল বুড়া
গোশতো থুইয়া বাড়ে সুরা।

৮০. খায় না করে পুঁজি পাটা
তার কপালে মারি ঝাঁটা।

৮১. খাটার মজা তলে।

৮২. গায়ে গুমাহালি যমে ছাড়ে না।

৮৩. তেঁতুলও মিষ্টি না
চাড়ালও ইষ্টি না।

৮৪. আগাছার বৃদ্ধি বেশি।

৮৫. ঘরের ষাড়ে
পেট ফারে।

৮৬. জাতের ধারা বেগুনের চারা।

৮৭. ঘোড়া দেখে ঘুড়া অয়।

৮৮. ম্যায়া মানুষ ত্যানা ছেঁড়ার যম।

৮৯. খায় না পরাণ
কাকুতি সার।

৯০. ধানের মধ্যে আহালি কত রঙ দেহালি।

কৃষিকথা

৯১. দিনে জল রাতে তারা
এই দেখবে সুখের ধারা।

৯২. যত কুয়া আমের ক্ষয়
তাল তেঁতুলের কিরা হয়।

৯৩. থেকে বলদ না বয় হাল
তার দুঃখ বার মাস।

৯৪. গাই কিনবে দুয়ে
বলদ কিনবে বেয়ে।

৯৫. সুপারিতে গোবর, বাঁশে মাটি
অফলা নারিকেলের শিকড় কাটি।

www.pathagar.com

৯৬. ফাগুনে আগুন চৈতে মাটি
বাঁশ বলে শীঘ্র ওঠি।

৯৭. চাষি আর চষা মাটি
এই দুই মিলে শেষ খাঁটি।

৯৮. যদি উথলি কচুর পাত
তাতে রইলো চাষার ভাত।

৯৯. ধানের আবাদে ধন
আবাদের ধানে ধন।

১০০. চাষ চায় না বাত চাষ
তিলে আধা বর্ষণ খায়।

স্বাস্থ্যকথা

১. উনা ভাতে দুনা বল
ভরা ভাতে রসাতল।

২. দক্ষিণে নিম গাছ
বাড়ির মঙ্গল বার মাস।

৩. আলো হাওয়া কম
রোগ শোকের যম।

৪. বার মাসে বার ফল
না খাইলে রসাতল।

৫. ফল সবজি খেলে
বেশি পুষ্টি মেলে

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

কার্যকারণ সম্পর্কহীন ঘটনার ফলাফলে প্রথাগত বিশ্বাসকেই সাধারণ অর্থে বলা হয় লোকবিশ্বাস। পরলোকে নয়, মৃত্যুর পরে নয়, এই জীবনে কিসে বিঘ্ন দূর হবে কোন্ বস্তু ও ঘটনা শুভদায়ক, কোন বস্তু ও ঘটনা অমঙ্গলজনক– এই সব জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক বিষয় লোকবিশ্বাসের বিষয়বস্তু। যেমন– ভাত তরকারির রান্না করা মাত্র তৎক্ষণাৎ মাটিতে নামাতে নেই, এতে অমঙ্গল সাধিত হয়, অথবা- হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেলে বা কুটুম পাখি ডাকলে বাড়িতে ইষ্টিকুটুমের আগমন ঘটে। রাতের বেলা আয়নায় মুখ দেখতে নেই, মৃত্যু এগিয়ে আসে।

সংস্কারের অভিধানগত অর্থ হল পূর্বজ্ঞান, কর্ম ইত্যাদিজনিত মনোবৃত্তি বা অভ্যাস, পূর্বকৃত কর্মের স্মরণজনক শক্তি বিশেষ শাস্ত্রাভ্যাস বাসনা, জন্মগত জ্ঞান বা প্রবৃত্তি (instinct), বহুকালের অভ্যাসজনিত মনের ধারণা এবং প্রবৃত্তি, গুণবিশেষ, দশবিধ শুদ্ধিজনক কার্য, শুদ্ধি, নির্মলীকরণ, শোধন ইত্যাদি। লোকবিজ্ঞানী আলেকজান্ডার হ্যাগটি ক্র্যাপ লোকসংস্কারকে কুসংস্কার বলে রায় দিয়েছেন। মানুষের প্রতিদিনের বিশ্বাস বিভিন্ন আচরণের বা ক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কার রূপে সুপ্রোথিত হয়। অর্থাৎ একজন মানুষের মনের বিশ্বাস সামাজিকভাবে স্বীকৃত বলে বা অপর কর্তৃক অনুকরণীয় হলে সেটাকে সংস্কার বলে। লোকবিশ্বাসের সঙ্গে লোকসংস্কারের ক্রমপর্যায় হচ্ছে লোকবিশ্বাস। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের মূলে রয়েছে Animism অর্থাৎ সর্বপ্রাণীকে বিশ্বাস। লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি ও কুসংস্কারের প্রভাব বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত লক্ষ করা যয়। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার এমনভাবে মানুষের জীবনে সম্পর্কিত যে, কখনও কখনও একটির থেকে আরেকটি আলাদা করা যায় না। এক্ষেত্রে বিবাহ সম্পর্কিত কতিপয় লোকবিশ্বাস ও সংস্কার তুলে ধরা হলো :

১. বিবাহের বরণডালা, চন্দন, হলুদ, শঙ্খ, সিঁদুর, মাটির ঢাকুন প্রভৃতি একদামে কিনতে হয়, নচেৎ পাত্র-পাত্রীর বৈবাহিক জীবনে অমঙ্গল হয়।

২. নববধূর হলুদের কাপড় খুব সাবধানে রেখে দিতে হয়। কেননা অপয়া মেয়ের বিবাহের জন্য শাড়ির আঁচল কেটে তাবিজ-কবজ করার সম্ভাবনা থাকে। অথবা ঈর্ষাকাতর মহিলারা আঁচলের কাপড় কেটে ক্ষতি করতে পারে।

৩. যার পায়ের পাতা মাটিতে মিশে না (খড়মপায়া) সেই সকল মেয়েকে বিবাহ করতে নেই। কেননা সেই মেয়ে অপয়া বলে তার স্বামী মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে।

৪. ভাদ্র, আশ্বিন মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই সময় বাড়ি থেকে বিড়াল, কুকুর পর্যন্ত কেউ তাড়ায় না।

www.pathagar.com

৫. চুল বাঁধা অবস্থায় কখনো চুল আঁচড়াতে নেই, এতে সতীন আসার সম্ভাবনা থাকে।
৬. বিবাহে কালো রং নিষিদ্ধ কালো রঙের কোনো জিনিস বর কনেকে উপহার দেয় না। কালো রং অমঙ্গল অথবা শোকের প্রতীক। এক্ষেত্রে লাল রঙের পর্যাপ্ত ব্যবহার লক্ষণীয়। আলতা, সিঁদুর এবং লাল রঙের শাড়ির ব্যবহার দেখা যায়। লাল রঙ আবেগের প্রতীক। 'বিবাহের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যৌনমিলনের ব্যাপারটিও এসে পড়ে। এই কারণেও লাল রঙটির আধিক্য আমাদের বিবাহে। বিবাহ উপলক্ষ্যে যে নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত করা হয় তাও লাল কালিতে ছাপা হয়ে থাকে।'
৭. কালরাত্রিতে নববধূর সাথে দৈহিক মিলন পরিহার করা উচিত।
৮. গায়ে হলুদের সময় পাত্র-পাত্রীকে গোসল করানো হয়। ঐ সময় কোন অবিবাহিত মেয়ের গায়ে পানি পড়লে তার বিবাহ হয় না।
৯. বাড়িতে কোনো পরিচিত লোকের আগমন হলে অন্তত কিছু সময়ের জন্য তাকে ঐ বাড়িতে বসতে হয়; নইলে বাড়ির মেয়েদের বিবাহ হয় না।
১০. নববধূর স্বামী গৃহে আগমনের পর তাকে ঢেঁকি এবং রান্নার চুলা স্পর্শ (সালাম) করতে হয়। এতে সংসারের মঙ্গল হয়।
১১. বিবাহের দিনে কনের মাকে উপবাস/রোজা রাখতে হয়। বিশ্বাস, কনের মা যত শুকাবে কনে ততই সুখী হবে স্বামীর বাড়িতে।
১২. বর কনের শুভদৃষ্টির সময় কোনো ঋতুমতী নারী সেখানে থাকতে নেই; থাকলে বর কনের জীবনে নানাবিধ অশান্তি দেখা দেয়।
১৩. বিবাহের কোনো অনুষ্ঠানে অথবা কোন শুভ কাজে বিধবা ও বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের অংশগ্রহণ করতে নেই। এতে সংসারে অমঙ্গল হয়।
১৪. অবিবাহিত ছেলে বা মেয়ের কাছে প্রজাপতি উড়ে এলে সেই ছেলে বা মেয়ের যথাশীঘ্র বিবাহ হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।
১৫. জন্মবারে বিবাহ নিষিদ্ধ।
১৬. বিবাহের সময় বর কনে কলতলায় খুরি ভাঙে। বিশ্বাস, খুরি যত ঠুকরো হবে ততগুলি সন্তান জন্মাবে।
১৭. জ্যৈষ্ঠ মাসে পরিবারের বড়পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেওয়া হয় না।
১৮. বৈশাখ মাসের ভোরবেলা নীলকণ্ঠ পাখি দেখলে সুন্দর বর পাওয়া যায়।
১৯. যাত্রাকালে কাকের করুণ ডাক শ্রবণ করা যাত্রাপথে অশুভ ইঙ্গিত।
২০. শূন্য কলসি কাঁখে রমণী দর্শন অথবা কশ আলুলায়িত রমণী দর্শন অশুভ।
২১. ভাদ্র মাসে নতুন বউয়ের নাইওর যাওয়া অমঙ্গল।
২২. স্বপ্নে যদি মেহেদি, আলতা, নতুন কাপড় ইত্যাদি দেখা যায় তবে তা আসন্ন বিবাহের ইঙ্গিত বহন করে।
২৩. পথের তেমাথায় হলুদ জল দিলে অবিবাহিত ছেলেমেয়ে স্নান করলে তাদের যথাশীঘ্র বিবাহ হয়।

www.pathagar.com

বিবাহ সম্পর্কিত বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বছরের কোন মাসে বিবাহ করা ভালো কিংবা বিপরীতক্রমে কোন কোন মাসগুলিতে বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, কোন গোত্রে বিবাহ অনুচিত, কোন লগনে বিবাহ নিষিদ্ধ, ছাদনাতলায় বর কনের শুভদৃষ্টির সময় কোন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন, নববধূ যাতে শ্বশুরালয়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, শ্বশুরবাড়িতে সকলে কীভাবে নববধূকে নিজেদের বলে গ্রহণ করতে পারে - এইরকম নানা খুঁটিনাটি বিষয় এইসব বিশ্বাস এবং সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত।

ক. লোকবিশ্বাস

১. হুতুম পেঁচা ডাকলে অমঙ্গল হয়। তাই ডাক শোনা মাত্রই লৌহখণ্ড আগুনে ফেলতে হয় অমঙ্গল থেকে রক্ষার জন্য। বিশ্বাস যে, লৌহখণ্ড উত্তপ্ত হওয়া মাত্রই এর তাপ পেঁচার গায়ে লাগবে এবং তৎক্ষণাৎ উড়ে যাবে, ফলে অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

২. ভাত-তরকারি রান্না করা মাত্রই পাত্রটি সরাসরি মাটিতে নামাতে নেই, এতে অমঙ্গল সাধিত হয়।

৩. হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেলে বা কুটুম পাখি ডাকলে বাড়িতে আত্মীয়-কুটুমের আগমন হয়।

৪. থালা থেকে এক লোকমা ভাত খেলে পানিতে ডোবার সম্ভাবনা। তাই দুবার খেতে হয়।

৫. খেতে বসে বিষম খেলে দূরের আত্মীয়-স্বজন কেউ তাকে স্মরণ করছে।

৬. গামছা, গেঞ্জি সেলাই করে পরিধান করা অমঙ্গল।

৭. জুতা-সেন্ডেল, ঝাড়ু পেতে বসতে নেই, এতে অমঙ্গল।

৮. আম-কাঁঠাল গাছে ফল না ধরলে আশ্বিন সংক্রান্তিতে যে 'গাশ্‌শি' অনুষ্ঠান হয় সেই রাতে দা দিয়ে গাছ কোপালে গাছে ফল ধরে।

৯. রাতের বেলা এক ডাকে সাড়া দিতে নেই। কমপক্ষে তিনবার ডাক দিতে হয়। ধারণা করা হয় কোন অপদেবতা, ভূত-প্রেত অনিষ্ট করার লক্ষ্যে এক ডাক দিয়ে ঘরে থেকে বের করার চেষ্টা করছে।

১০. হাত চুলকালে টাকা আসবে।

১১. ডান চোখ ফরকিলে অসুখ আসবে।

১২. বাড়িতে কুকুর বিড়াল অথবা কাক কাঁদলে অমঙ্গল হয়, অসুখ-বিসুখ অথবা মৃত্যু প্রবেশ করে।

১৩. পর পর অবিরাম বৃষ্টি হলে ঘর থেকে ঘটি, বাটি, দা-কুঠার উঠোনে ফেলে দিলে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়।

www.pathagar.com

১৪. দুজনের মাথায় ঠুকে খেলে তৎক্ষণাৎ উভয়ের মাথা একবার ঠুকতে হয়, নইলে আধমাথা বরে বা শাথায় শিং গজায়।

১৫. মাথার উপর দিয়ে কা-কা করতে করতে কাক উড়ে যায়, তাহলে অমঙ্গল হয়।

১৬. বাড়িতে আঁতুড় থাকলে বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আগুনে হাত-পা সেঁকে ঘরে প্রবেশ করতে হয়। নইলে বাইরে থেকে ভূত-প্রেত তার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করতে পারে।

১৭. স্নান করে এসে বা রাত্রিবেলা ভিক্ষা দিতে নেই।

১৮. স্নান করে মুখে কিছু না দিয়ে ফল খেতে নেই।

১৯. রাত্রিকালে ঘর ঝাড়ু দিতে নেই।

২০. চৈত্র, ভাদ্র ও পৌষ মাসে গরু-বাছুর বিক্রি করতে নেই।

২১. সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলা মাছ কুটলে বা কোনে কিছু ভাঙালে ঠোঁক কাটা বা বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মে।

২২. গর্ভাবস্থায় তার ঘরে সুন্দর শিশুর ছবি রাখা হয়। বিশ্বাস এতে সুন্দর শিশুর জন্ম হয়।

২৩. গর্ভাবস্থায় ডাব খেলে সন্তানের চোখ ঘোলা হয়।

২৪. রাত্রিকালে ধার-দেনা পরিশোধ অথবা টাকা পয়সা লেন-দেন করতে নেই।

২৫. রাত্রিকালে ভিক্ষা দিতে নেই।

২৬. রাত্রিকালে এঁটো পানি ঘরের বাইরে ফেলতে নেই।

২৭. রাত্রিকালে গাছের পাতা ছেঁড়া বা গাছ কাটতে নেই।

মসজিদ, মন্দির, দরগা প্রভৃতি ভিত্তিক লোকবিশ্বাস

ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, দরগা, ভিটা, পিরবাড়ি, কিরবাড়িকেন্দ্রিক বেশকিছু লোকচিকিৎসার অস্তিত্ব রয়েছে। যাতে উপলক্ষ্য করে রোগমুক্তি, সন্তান কামনা অথবা অন্য কোনো মনবাসনা পূরণার্থে 'হাজত-মানত' করতে দেখা যায়। এছাড়া প্রায় প্রতিটি গ্রামেই কোনো না কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা কোনো না কোনো রোগের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। ফরিদপুর জেলার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দরগা, আস্তানা বা মসজিদ, মন্দিরের পরিচয় তুলে ধরা হলো অর্থাৎ যাকে উপলক্ষ করে এখনও সাধারণ মানুষ হাজত-মানত করে থাকে।

১. শেখ ফরিদ (রা.)-এর দরগা

ফরিদপুর কালেকটারিয়েট ভবনের পাশে শেখ ফরিদ (রা.)-এর দরগা। দরগাটি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে রোগমুক্তি, সন্তান-কামনা ও অন্যান্য মনবাসনা পূরণার্থে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় হাজত মানত করে থাকে।

www.pathagar.com

২. বিসমিল্লাহ শাহের দরগা

ফরিদপুর শহর থেকে ৩ কি.মি. দক্ষিণে মাহমুদ নামক স্থানে ফরিদপুর-বরিশাল সড়কের পাশে বিসমিল্লাহ শাহের দরগা অবস্থিত। রোগমুক্তি ও অন্যান্য মনবাসনা পূরণার্থে পথ-যাত্রীরা যানবাহন থামিয়ে পয়সা-কড়ি নিক্ষেপ করে। কেউ কেউ আগরবাতি, মোমবাতি, বাতাসা এবং প্রথম গাছের ফলমূল এই দরগায় প্রদান করে থাকে।

৩. কাঠিয়া কালিবাড়ি

ফরিদপুর শহর থেকে ১৫ কি.মি. দক্ষিণে ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের কাছে তালমার মোড় সংলগ্ন কাঠিয়া কালিবাড়ি। হিন্দু সম্প্রদায় এই প্রাচীর কালীমন্দিরটি জাগ্রত কালিমন্দির বলে মনে করেন এবং রোগমুক্তি, বৈবাহিক জীবনে শান্তি-সমৃদ্ধি এবং সন্তান বাসনার হাজত-মানত করে থাকে এবং পূজা দেন।

৪. সাতৈর মসজিদ

বোয়ালমারী থানায় স্থাপিত গায়েবি মসজিদ। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে সাধারণের নিকট পরিচিত। জনশ্রুতি আছে হঠাৎ করে একদিন এই মসজিদটি গায়েবি ভাবে উত্থিত হয়েছে এই মসজিদের পাশে বারোজন ওলি-আউলিয়ার কবর রয়েছে।

৫. মানাই ফকিরের আস্তানা

চরমানাই নামক স্থানে মানাই ফকিরের আস্তানা। মনবাসনা পূরণার্থে, রোগ-শোক থেকে মুক্তি লাভের আশায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় মানাই ফকিরের আস্তানায় হাজত-মানত করে।

৬. অন্যান্য

গেরদা শাহি মসজিদ, জগবন্ধু সুন্দরের আশ্রম, দেওয়া সাগর শাহের দরগা, বিশ্বজাকের মনজিল, চন্দ্রপাড়া দরবার শরীফ, ধলা পিরের দরবার শরীফ, খোকা পিরের দরগা, মদন ফকিরের দরগা প্রভৃতি।

খ. লোকসংস্কার

১. পিঠা, বিশেষ করে তৈলে ভাজা পিঠা একবাড়ি থেকে অন্যবাড়িতে নেয়ার সময় সঙ্গে কাঁচা/মুকনা মরিচ, রসুন এবং একখণ্ড কয়লা দিতে হয়, নতুবা এর সঙ্গে ঘর ভূত-প্রেত প্রবেশ করে। বিশেষ করে ঘরে শিশু থাকলে তাদের মঙ্গল হয়। এবং একখণ্ড পিঠা বাইরে পেলে না দিয়ে খাওয়া হয় না।

২. বিড়াল মেরে ফেললে সওয়াসের লবণ নদীর পানিতে ফেলে দিতে হয়, অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

৩. নতুন কাপড় বড়িতে এনে পরিধান করার আগে তাতে পানির ছিটা দিতে হয়। অথবা কাপড়ের কোনা অথবা নতুন কাপড় থেকে একটুকরো সুতা ছিড়ে আগুনে পুড়ানো হয়, নতুবা এই কাপড়ের সঙ্গে ভূত-প্রেত ঘরে প্রবেশ করে।

www.pathagar.com

৪. ঘর থেকে বের হবার সময় চৌকাঠে মাথা ঠোকা (আঘাত) খাওয়া অমঙ্গল, যাত্রা অশুভ হয়। তাই ক্ষণিক অপেক্ষা করে যাত্রা আরম্ভ করতে হয়।

৫. সকালবেলায় গৃহাঙ্গণ বা ঘরের ভেতর ঝাড়ু না দিয়ে কোথাও যাত্রা করা হয় না অথবা ঘর থেকে কোনোকিছু কাউকে দেয়া হয় না এতে সংসারের অশুভ অথবা অমঙ্গল হয়।

৬. আমাদের সমাজে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বৌ দর্শন করা ভাশুরের জন্য নিষিদ্ধ, এমনকি ভাশুরের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ছোঁয়া যায় না।

৭. বিবাহের 'শাহনজর' (স্বামী স্ত্রীর মুখ দর্শন) অনুষ্ঠানে যখন আয়নার মধ্যে অথবা কাপড় ধরে স্বামী-স্ত্রীর মুখ দর্শন করানো হয় তখন বিধবা কোনো মহিলাকে সেখানে থাকতে দেয়া হয় না।

৮. নববধু স্বামীর বাড়িতে প্রবেশের সাথে সাথে তাকে ধান-দূর্বা, স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। অন্যথা সংসারে অমঙ্গল হয়।

৯. বিয়ের পরদিন বর কনেকে একত্রে গোসল করানো হয়। গোসলের পরে বর কনেকে কোলে নিয়ে ঘরে যাবার সময় মাটির খোলার ওপর দিয়ে যায়। মাটির খোলা যত টুকরো হবে, দম্পত্তি ততটি সন্তান লাভ করবে।

১০. আঁতুড়ঘরে একখণ্ড লৌহ, মরা গরুর হাড় রাখা হয়-কোনো অপদেবতা, ভূত-প্রেতের কুদৃষ্টি এবং অনিষেটর হাত থেক রক্ষা পাওয়ার জন্য।

১১. আঁতুড়ঘর থেকে পোয়াতি প্রকৃতির ডাকে বাইরে গেলে এসে আগুনে হাত-পা সেঁকে ঘরে প্রবেশ করতে হয়।

১২. আঁতুড় ঘরে দরজার সামনে জ্বলন্ত আগুন রাখতে হয়-অপদেবতা, ভূত-প্রেতের কুদৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

১৩. বালিশের উপর বসলে পায়ুপথে হালিশ বের হয়।

১৪. মেয়েদের পায়ের গোড়া মোটা হলে অথবা পা ফাঁকা (খড়ম পা) হলে সেই মেয়ে সংসারে অমঙ্গল ডেকে আনবে, কখনো স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

১৫. মেয়েরা হাসলে গালে টোল পড়লে স্বামী মারা যায়।

১৬. চুল বাঁধা অবস্থায় পুনরায় চুল আঁচড়ালে ঘরে সতীন আসে।

১৭. প্রথম মেয়ে সন্তান সংসারের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ, এতে সংসারে মঙ্গল হয় এবং আর্থিক অবস্থা ভালো হয়।

১৮. মেয়েরা মাথায় টুপি পড়লে সংসারে অমঙ্গল হয়। মাথায় টাক পড়ে।

১৯. ভাঙা আয়নায় মুখ দেখতে নেই। এতে হায়াত কাটা যায়।

২০. রাত্রিকালে টাকা পয়সা গুনতে নেই এবং ধার-দেনা পরিশোধ করতে নেই।

২১. ভাঙা পাত্রে (গ্লাসে) পানি খেতে নেই।

২২. রাত্রিকালে আয়নায় মুখ দেখতে নেই।

২৩. যমজ কলা খাওয়া নিষিদ্ধ, এতে যমজ শিশু জন্মে।

www.pathagar.com

২৪. মুরগির পেটকাটা ডিম মেয়েদের খাওয়া নিষিদ্ধ।
২৫. রোববার বাঁশ ঝাঁড় থেকে বাঁশ কাটতে নেই।
২৬. চৌকাঠের উপর বসতে নেই।
২৭. ভাদ্র মাসে বাড়ি থেকে গরু-বাছুর বিক্রি করতে নেই।
২৮. নিজের প্রতিচ্ছবির ছায়া দিকে তাকাতে নেই।
২৯. সন্ধ্যাবেলায় মেয়েদের চুল খুলে রাখতে নেই।
৩০. পাটকাঠি দিয়ে কাউকে মারতে নেই। মারলে সে পাটকাঠির মত শুকিয়ে যাবে।
৩১. ভাতের চাউল খেতে নেই। খেলে আঁচিল হয়।
৩২. ভাজা পিঠার প্রথমটি এবং অবিবাহিত মেয়েদের খেতে নেই।
৩২. হলুদ ধার দিতে নেই। অমঙ্গল।
৩৩. রাতে মাথা আঁচড়াতে নেই।

লোকাচারে কতিপয় সংস্কার

১. আদ্য ধাতু নারীগর্ভের সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ ঘটায়। লোকবিশ্বাস প্রচলিত আচার ও বিধিনিষেধ যথাযথভাবে পালন করলে সকল প্রকার বৈরীশক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। মুসলমান মেয়েরা আদ্যধাতুর দ্বিতীয় দিনে ঘরের দেয়ালে তিনটি রাজ রসের দাগ দিয়ে একটি দাগ মুছে ফেলে।

হিন্দু সমাজে দ্বিতীয় বিবাহ বা ফুলবিয়া নামক একটি উর্বরতাসূচক অনুষ্ঠান করা হতো। অনুষ্ঠানটি আদ্যঋতুর তৃতীয় কিংবা সপ্তম দিবসে উদযাপিত হত। একে ফরিদপুরে 'কাদামাটি'ও বলে। সামাজিক বিধান অনুযায়ী গৃহস্বামী পাঁচজন এয়োস্ত্রীকে কাদামাটির নির্দিষ্ট দিনে আমন্ত্রণ জানান। তারা বিকালবেলা গৃহস্বামীর বাড়ির আঙ্গিনায় একটি জলাধার নির্মাণ করে জলে পূর্ণ করে। তারপর তারা ঋতুবতী বধূকে আঁতুড় ঘর থেকে এনে জলাধারের পাশে বসায় এবং তার কোলে একটি পাথরের নোড়া দেয়। বধূ প্রসবের ভান করে তা জলাধারে নিক্ষেপ করে। এই সময় থেকে কাদামাটি অনুষ্ঠান চলতে থাকে। কেউ নৃত্য করে, কেউবা সাপুড়ে হয়ে গান গায়, কেউ আবার শিব-দুর্গা সেজে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করতে যায়। এই ভিক্ষালব্ধ খুঁদের পায়েস রান্না করে ঋতুবতী বধূকে রাত্রে খেতে দেওয়া হয়। কাদামাটি শেষ হলে বধূকে ক্ষার জলে স্নান করিয়ে শুষ্ক বসন পরিধান করায়। পাঁচ এয়োস্ত্রী আঙ্গিনায় মাদুর বিছিয়ে তার চার কোণে এবং মধ্যস্থলে কয়েকটি কাঁকর রেখে পাঁচটি কচুর পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়। বধূ মুগুরের আঘাতে সেগুলি ভেঙে গৃহে প্রবেশ করে।

২. গর্ভদোষ নিরাময়ের জন্য আমাবস্যা-পূর্ণিমার গভীর রাতে শেওড়াগাছতলায় সাত কলস পানি দিয়ে মৃতবৎসাকে গোসল করালে, এই রোগ নিবারণ করা হয়।

৩. অমাবস্যা, পূর্ণিমা, গ্রহণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভরদুপুরে রতিক্রিয়া নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

৪. বাসি গোসলের পর কলতলা থেকে নববধূকে পাঁজাকোলে করে গৃহে প্রবেশ করার সময় বরকে সরা ভাঙতে হয়। সরাভাঙা টুকরাগুলি নবদম্পতির ভবিষ্যৎ সন্তানের সংখ্যা নির্ণায়ক।

৫. পোয়াতী নারী খোলা নৌকায় করে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম গেলে তার গর্ভপাত হয়।

৬. পোয়াতী নারীর ছাগলের দড়ি ডিঙাতে নেই। সন্তান প্রসবে কষ্ট হয়।

৭. তৃতীয় মাসে শিশু-দন্ত নিয়ে অস্বাভাবিক ভুমিষ্ট হলে ভ্রাতা/পিতার মৃত্যু হয়। এই দোষ কাটানোর জন্য শিশুর মাতুলকে একখানি নতুন গামছা প্রদান করতে হয়।

৮. তিন তেঁতুল্যা মধ্যে কন্যাকে শুভযুক্ত এবং পুত্রকে অশুভযুক্ত বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে। তিন তেঁতুল্যা কন্যা যতদিন পিতৃগৃহে বাস করে ততদিন পর্যন্ত পিতৃগৃহের আয়-উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু বিবাহের পর স্বামীগৃহে সাংসারিক অবনতি ঘটতে থাকে। এই অবনতি রোধ করতে পিতা জামাতা কর্তৃক কন্যাকে প্রদত্ত স্বর্ণলঙ্কার থেকে গোপনে কিছুটা স্বর্ণ কেটে রেখে দেয়। ফরিদপুর অঞ্চলে সাধারণ বিশ্বাস হলো, তিন তেঁতুল্যা পুত্র এতই ক্ষতিকর যে, সে যদি ঘরের চালের কোণা ধরে অথবা হালের গুটি ধরে তবে তার পিতার মৃত্যু হবেন। (তিন তেঁতুল্যা-পরপর তিনজন পুত্র বা কন্যা)

৯. বামুনপুত্র সন্তান অশুভযুক্ত। 'মা-বাপের মৃত্যু হয়। দোষ কাটানোর জন্য পিতা সন্ন্যাসীর বেশে ঘরের কোণা কেটে প্রবাসে বহিগত হয়। তারপর আড়াই দিন প্রবাসে থাকার পর ঘরে ফিরে আসে।'

১০. গর্ভাবস্থায় প্রসূতির যা যা খেতে ইচ্ছা করে তা যদি খেতে না পায় তাহলে তার প্রসব কষ্ট হয় বলে বিশ্বাস।

১১. 'ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশু যদি অস্পষ্ট স্বরে মা অথবা বাবাকে ডাকে, তবে তার জন্মের দেড়মাসের মধ্যে যাকে ডেকেছে তার মৃত্যু হবে বলে বিশ্বাস। শিশুর মাতুল একখানি নতুন বস্ত্র একদরে ক্রয় করে তাকে প্রদান করলে দোষ কেটে যায়।

১২. যে মায়ের প্রথম সন্তান পুত্র, তিনি ভাদ্রমাসে 'জাত লাউ' খেতে পারে না। খেলে পুত্রের অমঙ্গল হয়।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

আবহমানকাল থেকে মানুষ প্রাকৃতিক উপাদান থেকে বুদ্ধি বলে অনেক জিনিস উৎপাদন ও সৃজন করতে শিখেছে। মূলত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে এ সকল সৃজনকৃত পদ্ধতিই লোকপ্রযুক্তি। লোকপ্রযুক্তি উপাদানগুলো হলোঃ পাটজাত দ্রব্যাদি, কাঠ, বাঁশ, বেত, ধাতব দ্রব্য এবং মাটি। ফরিদপুর জেলার সাধারণ মানুষ আবহমানকাল থেকে জীবনের প্রয়োজনে কখনো জীবন ব্যবস্থার উন্নয়নে নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করছে। উল্লেখযোগ্য লোকপ্রযুক্তির কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. কৃষিকাজে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি

ক. কৃষিকাজে লাঙ্গলের ব্যবহার অতীতকাল থেকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লাঙ্গল এবং মই বিভিন্ন ধরনের এবং তৈরি পদ্ধতি ও উপকরণের ব্যবহার ভিন্নতর। ফরিদপুর জেলায় লাঙ্গল তৈরিতে সাধারণত বাবলা কাঠ ব্যবহৃত হয়। দারুশিল্পীরা লাঙ্গল তৈরির উপযোগী বাবলা গাছের একটি বক্র অংশ হাতুড়ি, বাটালের সাহায্যে লাঙ্গল তৈরি করেন। লাঙ্গলের মাথায় সাধারণত পাকা লৌহের ফলা লাগানো হয়। মই তৈরিতে সোজা বাঁশের ফালি ব্যবহার করা হয় যা দৈর্ঘ্যে দশ থেকে বারো ফিট। যেটি ছিদ্র করে দেড়ফিট লম্বা বাঁশের কাঠিযুক্ত করে দেয়া হয়। মই মূলত লাঙ্গল দিয়ে চাষকৃত জমি সমতল করতে ব্যবহৃত হয়।

খ. কৃষি কাজে সেচ ব্যবস্থায় কাঠের তৈরি 'ঠুঙ্গা' ব্যবহৃত হয় যা আমাদের লোকপ্রযুক্তির একটি অংশ। পাশ্ববর্তী জলাশয় থেকে নালী বা ড্রেন কেটে পানির ধারা কৃষি জমিতে আনা হয় এবং সেখানে একটি গর্ত থাকে। এই গর্তে পানি এসে জমা হয়। এই পানি ঠুঙ্গার সাহায্যে তুলে জমিতে সেচ দেয়া হয়।

গ. হালচাষে যেসকল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলোঃ 'নিরান'। (জমি থেকে আগাছা পরিষ্কারের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এটি কাঠের তৈরি, যা দৈর্ঘ্যে দশ থেকে বারো ফিট। এর সঙ্গে লোহার অনেকগুলো আল থাকে। দেখতে অনেকটা চিরুনির মতো।)

ঘ. কৃষিকাজে ব্যবহৃত অন্যান্য সরঞ্জামাদি : গাদা, ঈষ, ফাল, জোয়াল, হেঁয়ালি, জোত, টোনা, কাঁচি, লড়ি, মুগুড়, গোলা, কোদাল, মাথাল, নিরানি, তাফাল, খুন্তা।

২. মাছ ধরার ফাঁদ

ক. ফরিদপুর নদী প্রধান এলাকা। এখানে কেউ কেউ নিজের প্রয়োজনে আবার কেউ বিক্রির উদ্দেশ্যে মাছ ধরে থাকে। এই মাছ ধরার ক্ষেত্রে বাঁশ-বেতের সাহায্যে

www.pathagar.com

এক ধরনের মাছ ধরার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যাকে স্থানীয় ভাষায় 'দুয়ারি' বলে। মূলত এটি মাছ ধরার এক ধরনের ফাঁদ। দুয়ারি কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যেমন- চিকন, মাঝারি এবং মোটা। ছোট চিংড়ি, ছোট মাছ ধরার জন্য চিকন ফাঁকের দুয়ারি, সাধারণ মাছ ধরার জন্য 'মাঝারি দুয়ারি' এবং বড় আকারের দুয়ারিকে 'পারণ' বলা হয় যা দেখতে অনেকটা ড্রামের মতো। দুয়ারি তৈরি করতে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাঁশ, বেত, তার, এক ধরনের লতা, পাটের দড়ি বা সুতলি। দুয়ারি সাধারণত গোল এবং বর্গাকারের হয়ে থাকে যা জলাশয়ের মধ্যে বাঁধ দিয়ে বাঁধের ফাঁকে পেতে রাখা হয়।

খ. ভেশাল : লোকপ্রযুক্তিতে নির্মিত এক ধরনের বড় জাল যা বড় আকারের দুটি বাঁশের মধ্যে সংযুক্ত করে এমনভাবে আটকিয়ে দেয়া হয় যাতে মাছ শিকারি জলাশয়ে জাল ফেলে কপিকলের মতো উপরে নিচে উঠানামা করতে পারে। ২০টি বাঁশের সমন্বয়ে তৈরি করা হয় এই ভেশাল। আড়াআড়ি দুটি বড় বড় বাঁশকে দুপাড়ে জুড়ে এক স্থান মিলিত করা হয়। সেই বাঁশের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দড়ি দিয়ে আটকানো হয় বিশালকার জাল। আর দুই পাড়ে বাঁশ দুটিকে ঝুলিয়ে রাখার জন্য তিনটি করে মোট ছয়টি বাঁশের খুঁটি থাকে। বাঁশটি যেখানে মিলিত হয় সেখানে বাঁশের পরে বাঁশ ঝুলিয়ে তৈরি করা হয় ঝাকি জাল, মাচা। আর সেখান থেকেই সংগ্রহ করা হয় মাছ।

গ. জাল : মাছ ধরার এক ধরনের ফাঁদ। বর্তমানে মেশিনের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের জাল তৈরি হলেও এর উদ্ভব মূলত লোকপ্রযুক্তিতে কুটির শিল্পে। উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন প্রকার সূতা, লোহার কাঠি ব্যবহৃত হয়। জাল কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যেমন- খেপলাজাল, বেড়জাল, ধরাজাল, টানাজাল, হ্যাচকাজাল, কৈজাল, বড়জাল, বেড়াজাল, ধরমজাল, ঝাঁকিজাল, ভেশাল প্রভৃতি।

ঘ. চাঁই, উচা ও পলো : বাঁশ ও বেতের তৈরি এক ধরনের মাছ ধরার ফাঁদ।

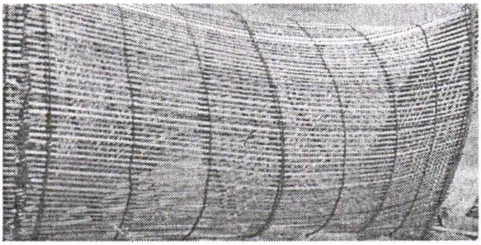

মাছ ধরার চাঁই

৩. তেলের ঘানি

পূর্বে গরুটানা কাঠের ঘানিতে ভোজ্য তেল উৎপাদন করা হতো। এখনো এ প্রযুক্তিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ফরিদপুরে এই কাজের সঙ্গে যে সম্প্রদায় জড়িত তারা 'কুলু' নামে পরিচিত। তেলের ঘানি তৈরি করতে একটি গাছের গুড়ি লাগে, যার উপরে এবং মাঝে

www.pathagar.com

ছিদ্র করা হয় এবং মাটিতে এমনভাবে পুঁতা হয় যাকে অন্য আরেকটি লম্বা কাঠের সংযোগে ঘূর্ণায়ন করা যায়। এই লম্বা কাঠের সঙ্গে একটি গরু জুড়ে দেয়া হয় যেটি অনায়াসে চারদিকে ঘুরতে পারে। ঘানির উপরের অংশে টিনের পাত্র থাকে যার মধ্যে তেল তৈরির উপকরণ যেমন- তিল, তিশি অথবা সরিষা দেয়া হয়। ঘূর্ণনের ফলে গাছের ভেতরের ছিদ্র দিয়ে চুরিয়ে চুরিয়ে তেল নিষ্কাশন হয়। বর্তমানে মেশিনে উৎপাদিত তেলের মূলঘানি মূলত লোকপ্রযুক্তিরই অংশ। পার্থক্য শুধু এটি মেশিনের সাহায্য ঘূর্ণায়ন করা হয়।

৪. মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি

লোকপ্রযুক্তির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধারা চাকে গড়া (Potter's wheel) মৃৎশিল্প। যেটি শুরু হয়েছিল প্রাচীন মিশরে ৩০০০ খ্রিষ্টাব্দে। প্রাচীন সকল সভ্যতায় এই শিল্পের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। সাধারণত চাকের মাধ্যমে এইসব মাটির পাত্র তৈরি হতো। কেবল যে, সাধারণ মাটির পাত্রই তৈরি হতো তা নয়; কাঁচের মতো চকচকে ও মসৃণ পাত্রও তৈরি হতো।

চাক পদ্ধতিতে কাদা মাটির ফলা Potter's wheel এর উপর রাখা হয় এবং চাকটি ঘুরতে থাকলে কারিগর তার নিখুঁত হাতে নানা প্রকার দ্রব্য গড়েন। এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র গোলাকৃতি দ্রব্যাদি তৈরি করা যায়। যেমন- হাঁড়ি, পাতিল, পানির কলসি ইত্যাদি। এই চাক পদ্ধতিতে হাতে চাপ দিয়ে Pressure method পদ্ধতিতে মূর্তি গড়া হয়।

৫. লৌহজাত দ্রব্য থেকে লোকপ্রযুক্তি

লৌহজাত দ্রব্য (লোহার বার) থেকে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দা, কাঁচি, ছুরি, কুঠার, কুদালসহ বেশকিছু দ্রব্যাদি কামার শিল্পে উৎপাদিত হয়। এ শিল্পে সুদূর অতীতকাল থেকে যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে আসছে তা আজও অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে লোহার বার পুড়ানোর ক্ষেত্রে চুল্লিতে সনাতন পদ্ধতিতে হাতেটানা চামড়ার তৈরি বাতাস যন্ত্রের ব্যবহার এবং আগুনে পুড়ানো লৌহখণ্ডকে কোনো দ্রব্য পরিণত করার জন্য মূল ব্যক্তি এবং সহযোগী একই সঙ্গে হাতুড়ি পিটিয়ে থাকে; যে পদ্ধতি আজও অব্যাহত রয়েছে।

৬. তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি

লোকপ্রযুক্তিতে তাঁত শিল্পে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন অতীত কাল থেকে। বর্তমানে পাওয়ারলুমের ব্যবহার হলেও সনাতন পদ্ধতিতে এখনো তাঁতজাত দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়। কোনো কোনো অঞ্চলের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড এই তাঁত শিল্প। এতে শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি, মশারি, গামছা, তোয়ালে, মসলিন, জামদানি, কাতান, তসর, মটকা প্রভৃতি তৈরি হয়। ব্যবহৃত তাঁতগুলো হলো: খটখটি তাঁত, গর্ত তাঁত, চিত্তরঞ্জন তাঁত এবং স্বয়ংক্রিয় তাঁত। যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে চরকা, টাকু। তাঁত শিল্পে হাজার

www.pathagar.com

বছরের আবহমান লোকপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। তাঁতের নৈপুণ্যে দৃশ্য, লতাপাতা ও জ্যামিতিক মোটিফ, বুটিদার ও তেরছা মোটিফ রয়েছে।

৭. গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি

গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে স্থান নির্বাচন, কোন ধরনের ঘর কোথায় হবে এবং কী কী সামগ্রী এতে ব্যবহৃত হবে, বাড়ির আঙ্গিনা কেমন হবে। সব কিছুই সনাতন ধ্যান-ধারণার প্রয়োগ লক্ষণীয়। হালে গৃহনির্মাণে যদিও কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে তবুও অনেকক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়। যেমন- বসতবাড়ি সাধারণত দক্ষিণমুখী হয়। এই ঘর টিনের ছাউনিযুক্ত এবং চার চাল বিশিষ্ট। কোথাও নলী বাঁশের বেড়া থাকে। ঘরে প্রবেশের জন্য একটি দরজা এবং একাধিক জানালা থাকে। এক সময় এ অঞ্চলে 'কাছারি বা বাংলা ঘর' নামে এক ধরনের ঘর ছিল। এ ঘরটি অতিথিদের জন্য ব্যবহৃত হতো। এ ঘরটি চারচালা বিশিষ্ট একটি ঘর। ছন জাতীয় এক প্রকার তৃণ দ্বারা ঘরের ছাউনি আচ্ছাদিত। ভেতরের বাঁধনগুলো বেতের এবং সুদৃশ্য। জানা যায়, ঘর বানিয়ে ঘরের চালার উপর রূপার টাকা ছুড়ে ফেলা হতো। টাকা যদি অনায়াসে মাটিতে এসে পড়তো তাহলে ধরে নেয়া হতো ঘরের চাল ঠিকমতো নির্মিত হয়েছে। ছনের ছাউনিযুক্ত এক ধরনের দোচালা বিশিষ্ট ঘর যা ঢেঁকি ঘর নামে পরিচিত। এ ঘরটি সাধারণত আঙিনায় এক পাশে নির্মিত হতো।

৮. খেজুরগাছ ও তালগাছ থেকে রস আহরণ ও গুড় তৈরিতে লোকপ্রযুক্তি

লোকপ্রযুক্তিতে খেজুর ও তালগাছ থেকে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে রস আহরণ করে এই রস মাটির 'জালা' অথবা টিনের তাফাল এ জ্বাল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার গুড় তৈরি করা হয়। খেজুর অথবা তালগাছ থেকে রস আহরণের পদ্ধতি খুবই সনাতন। এ কাজে আধুনিক কোনো প্রযুক্তি আজও বের হয়নি। ফরিদপুর অঞ্চলের 'গাছি' সম্প্রদায় গ্রীষ্মকালে তালগাছ থেকে এবং শীত মওসুমে খেজুর গাছ থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে রস আহরণ করে এবং বিশেষ পাত্রে এই রস জ্বাল দিয়ে পাটালি গুড়, ঝুলা গুড় অথবা হাজারি গুড় ক্যান্ডি তৈরি করে।

এ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ হলোঃ মোটা দা, ছ্যান, কাঠের হাতুরি বা মুগুর, মাটির হাড়ি, মোটা রশি, বাঁশের ঠুঙ্গা এবং ঠুঙ্গার সঙ্গে মোটা চামড়ার টুকরা প্রভৃতি।

৯. অন্যান্য লোকপ্রযুক্তি

লোকপ্রযুক্তিতে নারিকেলের ছোবড়া থেকে পাপোষ; পাট থেকে শিকা, ম্যাট, কার্পেট, হ্যান্ডব্যাগ, থলে, শতরঞ্জি; বাঁশ বেতের মাধ্যমে সনাতন পদ্ধতিতে গৃহনির্মাণ, নিত্যব্যবহার্য বাঁশের মোড়া, চাটাই, ঝুড়ি, মাছ ধরার ফাঁদ, বইয়ের তাক, টেবিল ম্যাট, পর্দা, দোলনা, ল্যাম্প, ফুলদানি, কৃষিক্ষেত্রে বাঁশের নলকূপ তৈরি হয়। দারুশিল্পে আসবাবপত্র, কাঠের মূর্তি, নকশাযুক্ত নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি, বিভিন্ন মোটিফের নৌকা প্রস্তুত হয়। কাঁসা-পিতলজাত বিভিন্ন সামগ্রীতে লোকপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

লোকভাষা

সাধারণ অর্থে ভাষার দুটি রূপ। একটি কথ্যরূপ অপরটি লেখ্যরূপ। আঞ্চলিক কথ্যরূপই আঞ্চলিক ভাষা। বলা যায়, একটি বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসী মৌখিকভাবে কথাবার্তার মাধ্যমে যে ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করে তাকে আঞ্চলিক ভাষা বলে।

ফরিদপুর জেলার ৮টি উপজেলা। এই সকল উপজেলার মানুষের বাচনভঙ্গি ও শব্দ উচ্চারণে পরস্পরের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফরিদপুরের চর অঞ্চলের মানুষের বাচনভঙ্গির (চরভদ্রাসণ-সদরপুর) সঙ্গে ফরিদপুর সদর, আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারি ও মধুখালী এলাকার মানুষের এবং ভাঙ্গা, নগরকান্দা অঞ্চলের মানুষের শব্দপ্রয়োগ ও উচ্চারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। বোয়ালমারি,আলফাডাঙ্গা, মধুখালী উপজেলার ভাষা বেশ শ্রুতিমধুর। উদাহরণ-মুনি কনে যাচ্ছে, এই ছেলে কোথায় যাও (সদর), যাও ক বেডা (নগরকান্দা), চললা কুন হানে (ভাঙ্গা)।

ফরিদপুর জেলায় বিন্দু, ধাঙর (মেথর, ডোম, হাড়ি ও হেলা) ও বেদে নামের নিম্নবর্ণের কিছু সংখ্যক লোকের বসবাস রয়েছে। এদের সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ, ভাষা ও শব্দচয়নে ভিন্নতর রূপ পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ বেদে সম্প্রদায়- দেলো বু, তুই দুই গোণ্ডা পয়সাই দে, তোর ভাতারের বশ করার তাবিজ দিয়া যাই। তাবিজ বাতাসে দোল খাবি, আর তোর কথা মনে পড়বি। তোক চ্যাটে খাবি। তোর বেলোয়ারি চুড়ি দ্যাখে তোর দামান্দের ঝোল পড়বি।

বিন্দু সম্প্রদায়- তু ক্যাহা চললে ব্যা (তুই কোথা যাচ্ছ)। হামকো গোলগোল্লা দে লেবা (আমাকে গোলগোল্লা দাও)।

ধ্বনি পরিবর্তন

-'ক' এর স্থলে 'হ' এর ব্যবহার। যেমন- টাকা-টাহা, টাকি- টাহি

-'খ' এর স্থলে 'ক' অথবা 'হ' ব্যবহার। যেমন-আখড়া -আকরা, দখল - দহল, দেখা - দেহা, লেখা - লেহা, মাখা - মাকা, লাখ-লাক।

-'ট''ঠ''ড''ঢ' এর স্থলে 'ড' এর ব্যবহার। যেমন-কাটা - কাডা, ছোট - ছোড, ওঠা - ওডা, কাঠ - কাড, পাঠা - পাডা, ঢাকা - ডাহা, ঢাল - ডাল, ঢোল - ডোল।

-'শ''ষ''স' এর স্থলে 'হ' এর ব্যবহার (যুক্তবর্ণ ব্যতীত)। যেমন- শাক - হাক, শালিক-হালিক, ষাড়-হার, সাপ-হাপ, সুতা-হুতা।

-'ড়''ঢ়,' এর স্থলে 'র' এর ব্যবহার। যেমন- কড়া-করা, বড়ো-বরো, পোড়া-পোরা, গাঢ়-গার, দৃঢ়-দৃর।

-'হ' এর পরিবর্তনেঃ যেমন- হাত-আত, হাতি-আতি।

-অল্পপ্রান ধ্বনির পরিবর্তনঃ ডাল-ঠাল, এপার-এফার, পড়ার-ফড়ার।

www.pathagar.com

-স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে শব্দরূপ : তাড়াতাড়ি-তারাতারি, কলা-ক্যালা।

-মহাপ্রাণ ধ্বনি পরিবর্তন: ঘাম-গাম, ঝাল-জাল, কথা-কতা, ভাত-বাত।

- মূল শব্দের প্রতিশব্দ: ময়লা-ছাতা, কুয়াশা-ধুয়া, সবুজ-কউচ্যা, তেজ-কুদি, মাকড়শা-মাহর, শামুক-হামু।

আঞ্চলিক শব্দকোষ

অগু = দাদু, নানু (বাচ্চাদের প্রথম মুখের বাক্য)

অড়নে = মাঙ্গনে৷ 'অইলাম রে ভাই অড়নে লক্ষ্মীদীঘা চরণে'—হুলোই গান

অহন = এহন

আগডুম = খেলাখেলা ভাব৷ 'আগডুম বাগডুম/ ঘোড়াডুম সাজে—ছড়া

আগা = পায়খানা

আচা = নারিকেলের মালা৷ 'আচা ভরা খুদ দিব/মাচায় বইস্যা খাইয়ো'—ছড়া

আতুন = মৃৎপাত্র৷ 'মাইয়া আতুন কাঠের গাই/বছর বছর দুয়াই খাই'—ধাঁধা

আদার = খাদ্য৷ 'আদারে গিলিল ছাউ/একি তামাশা'—ধাঁধা।

আলালে পালানে= অনুর্বর জমি।

আন্দশা = এক জাতীয় পিঠা৷ ফরিদপুরে প্রচলিত ঋতুভিত্তিক তৈলের পিঠা

ইকিরি মিকিরি = দুর্বোধ্য কথা৷ 'ইকিরি মিকিরি চাম চিকিরি'—ছড়া।

ইঁচা = চিংড়িমাছ৷ 'ইঁচার গুড়া, ফলশির গুড়া/ ঢোল বাজানো দক্ষিণ মোড়া—ছড়া।

ইটা মুগুর = মাটির ঢেলা ভাঙ্গার মুগুর বিশেষ।

উঁচা = মাছ ধরার যন্ত্র বিশেষ।

উদেয় = ঢালিয়ে ফেলা।

উনা = কম৷ 'উনা ভাতে বুনা বল/ভরা ভাতে রসাতল'—প্রবচন।

উরুম = মুড়ি৷ 'উরুম হলো গুরুম গুরুম'—মন্ত্র।

এ্যাবর-ঢ্যাবর = ওলট-পালট৷ 'এ্যাবর-ঢ্যাবর কুঞ্চিমালা'—খেলার ছড়া।

এ্যালাইঞ্চা = ঘাস৷ 'এ্যালাইঞ্চার ডুগা নড়বড় করে'—খেলার ছড়া।

ওরন = নারিকেলের মালার তৈরি হাতা বা চামচ বিশেষ।

ওলা = অকর্মণ্য মানুষ৷ 'খায় লয় বনে ওলা, বনের দিকে চায়'—প্রবচন।

ওলান = গাভীর স্তন।

কহোন = কখন [কখন]।

কাইল = আগামীকল্য।

কাউন = এক ধরনের শস্য৷ কাউনের ক্ষীর খেতে মজা।

কাউয়া = কাক৷ 'কাউয়া কা-কা-কা-মৃধা বাড়ি যা/বলে চুৎমারানি ভিক্ষা করুইয়া খা—ক্ষেপানোর ছড়া।

কাহই = বিশেষ ভঙ্গিমায় তাকানো। 'বেঙ্গা কুত্‌কাইতা চায়/মুখ দেয়না ঘাসে, পুলাপানে হাসে— গোয়ালের ডাক।

কুদি = তেজ।

www.pathagar.com

কুশেইর = ইক্ষু।

কেড়াইল = খড়কুটা শুকানোর কাজে ব্যবহৃত বাঁশের তৈরি।

কোনহানে = কোনখানে।

ক্যাবলা = বোকা। ক্যাবলা ছেমড়ি।

ক্যারেশ্‌তেল = কেরোসিন তৈল।

কোরহা = মোরগ-মুরগী

কোনসম = কখন

খাচতেল = সরিষার তেল।

খাড়ায়্যা = দাড়ায়ে৷ কাজির বিটা খাড়ায়্যা নায়।

খুদ = ক্ষুদ্র চুল বা চাউলের ভাঙ্গা অংশ। 'খুদ খাবিতো মারই আন'—ছড়া।

খোয়াড় = পশু আটকিয়ে রাখার ঘর৷

গগন = আকাশ৷ 'গগন বাইয়া তেল চুয়াইলো'—ছড়া

গাই = গাভী।

গাশ্‌শি = আশ্বিন মাসের শেষ দিনের পর্ব বিশেষ।

গিরাম = গ্রাম।

ঘরমুনাই = এক জাতীয় সাপ।

চলোন = বরযাত্রী।

চাইল = চাউল।

চানদোড় = ঘরের পাশ৷ 'চান্‌দোড় চান্‌দোড় কার জন্যি কান্দ'—আক্ষেপের ছড়া।

চিতল পিঠা = মাটির সাঁচে তৈরি এক প্রকার চাউলের পিঠা।

চিনার ভাত = এক প্রকার ধানের ভাত৷ 'আরও একটু পানি দাও চিনার ভাত খাই'—বৃষ্টির আবহনের ছড়া।

চিলি = বাজপাখি।

চুতরা = গালাগাল সূচক কাব্য।

চেরাগ = কুপি।

ধাঁধা ৩০৩

চৌচালা = চারচাল বিশিষ্ট ঘর। 'চৌচালাতে পারলাম বাড়ি, ধোপাবাড়ির কেঁথা চুরি'—খেলার ছড়া।

চৌরিঘর = চার চাল বিশিষ্ট ঘর।

ছাওয়াল = ছেলে সন্তান।

ছাপড়া = একচাল ঘর িশেষ।

ছিট্‌কি = সুর ডাল৷ 'ছিট্‌কি ডাল, তাইদ্যা ফেলাবো পিঠের ছাল'—ছড়া।

ছিলিম = কলকি।

ছেবলা = যার মুখে কথা গোপন থাকে না।

ছেমরা = বেটা ছেলে। 'কুটি কুটি ছেমড়ারা কালা ঘাস খায়/রাইত অইলে খোয়াড়েতে যায়'—ধাঁধা

ছোঁচা = খাওয়ার প্রতি লোভ।

www.pathagar.com

জাউরা = অবৈধ সন্তান।
জালা = খেঁজুরের রস জাল দিয়ে দিয়ে গুড় তৈরি করার পাত্র বিশেষ।
জিয়ল মাছ = মাগুর মাছ/শিং মাছ।
জিয়ালা = বড়শিতে দেওয়া জ্যান্ত মাছের টোপ।
জিরান = বিশ্রাম।
জুলা = তাঁতি।
জেওর = গহনা।
জোলাভাতি = চড়ুইভাতি। আশ্বিন মাসে গাশ্‌শি পর্বে জোলাভাতি আয়োজন করা হয়।
টক্‌টেক্যা = খুব গাঢ়।
টুবা = বাঁশের তৈরি মাছ ধরার ফাঁদ বিশেষ।
ডওয়া = ঘরের ভিটি। 'খাওয়ার উপর খাওয়া/ডওয়ার উপর শুয়া'—প্রবচন।
ডাহুন = মাটির সরা।
ডেংগুটি = লৌকিক খেলা বিশেষ।
তফাৎ = পার্থক্য, দূরত্ব।
তাপাল = ইক্ষুর রস জ্বাল দেবার টিনের পাত্রবিশেষ।
তারাবন = ঝোপ-ঝাড়। 'তারাবনে আগুন লেগেছে, কে নিভাইতে পারে'—ধাঁধা।
থাহের = বুঝতে পারা।
থুক্‌কু = বিরতিসূচক ধ্বনি।
থুবি = রাখা।
থুরিবুড়ি = ভুল সংশোধন।
দাইন = বাজী।
দাতাল = বুড়ো শুকর।
দানাদার = এক প্রকার মিষ্টি।
দামড়ি = বকনা বাছুর। দামড়ি ছেমড়ির বিয়া অয়নি।
দামান = স্বামী।
দুআইর = মাছ ধরার ফাঁদ। ৩০৪ বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
দুনা = বেশি। উনা ভাতে দুনা বল।
দুরমুসে = অলক্ষ্মী; হতভাগা।
দুলাভাই = ভগ্নিপতি।
দুহান = দুকান।
দুয়াইলি = গাভী দোহন করা।
দেওয়া = বৃষ্টি।
ধলা = সাদা। 'জন্ম ধলা, কর্ম কালা'—ধাঁধা।
ধানাই পানাই = ছলচাতুরি।
ধুপি = ভাপা পিঠা। চাউল এবং শুকনা গুড়ের সংমিশ্রণে ভাপ দিয়ে তৈরি পিঠা।
নড়ি = লাঠি।
নয়াল = বাচ্চা মুরগী।

www.pathagar.com

নাইওর = গোসল করা।
নাককাটা ছুরি = লজ্জা দেওয়া।
নাগাল = ধরা ছুঁয়া। 'চিলির নাগাল পাইলাম না, দুধ ভাত খাইলাম না'—ছড়া
নাড্ডা = বদমায়েশ।
নাদান = নির্বোধ।
নালি = ছোট খাল।
নাহাশি = নাজের হাড্ডি।
নিদ্‌দান = ঠেকা; অভাব।
নিয়ারা = অনুনয় বিনয়॥ নিয়ারা নিয়ে হালচাষ।
নূড়া = জমিতে ফেলানো-ছিটানো ধান।
নৈলা = বৃষ্টি আবহনের গান
পলাপলি = লুকোচুরি॥ এক ধরনের লৌকিক নাম।
পাইকা = ধান মাপার পাত্র বিশেষ।
পাইনেল = জামরুল; পানিফল।
পাইল্যা = পাতিল।
পাকান পিঠা = কুলিপিঠা।
পাটালি = আখের পাটালি গুড়।
পাদ = বায়ু পথে বায়ু নির্গত হওয়া।
পানাই = দুধ দোহনের পূর্বে॥ 'দিনে পানাই রাইতে খাই'—ধাধা।
পানাই = হাল চাষের সময় পায়ে দেবার পাদুকা বিশেষ।
পানদান = পানের থালাা।
পান্‌থা = পানিভাত॥ প্রত্যুষে কৃষকেরা মরিচ-পেঁয়াজে পানতা খায়।
পানাপুকুর = প্রন্থ পুকুর; জলাশয়।
পিড়্যা = বসার পিঁড়ি॥
পিতলা ঘুঘু = চালাক লোক।
পুইন্ = কুম্ভকালের চুলা।
পুইশ্যা = পুরুষ মানুষ।
পুটকি = পায়ুপথ॥ 'করিসনা পুট্‌কি নাড়ানাড়ি, তোর গেরস্ত দেয়না কড়ি'—গোয়ারের ডাক।
পুতুর পুতুর = সিদ্ধান্তহীনতা।
ফকফকে = সাদা।
ফটকা = ফাকিবাজি।
ফটুক = অল্প॥ 'আরও ফটুক ডলক দে, চিনার ভাত খায়'—মেঘরাজার গান।
ফালনা দফনা = অমুক তমুক।
ফত্‌রা = বাচাল।

www.pathagar.com

ফুচকি = উঁকি।
বক্‌কিল = কৃপণ৷ 'খা-খা বক্‌কিল্ রে খা'—গান।
বতোর = ফসল তোলার মরশুম।
বাইসা = গগণা। বাইশটিতে এই বাইশ।
বাইসা = মাঝি৷ 'বাইশা টান দেওরে, খুলো খুলো নাউ' সারি গান।
বাগরা = বেকে বসা কোনো কাজে অসম্মতি জ্ঞাপন।
বিদিরবরণ = গালাগাল সূচক বাক্য।
বিয়ান্ = সকাল।
বিয়ান = প্রসব করা।
বেসর = নাকের নোলক৷ 'কি দিয়া সাজাবো রে, সোনারুর বেসর আইনা মনিকারে সাজাবো'—মেয়েলি গীত।
ভরাপড়া = নির্বোধ, গালিসূচক বাক্য।
মলন = ধান মাড়াই।
মাইটা = মাটির রং।
মুড়া = মাছের মাথা। 'মাছ কাটলি মুড়া দিবো, বাড়া বানলি খুদ দিবো'—ছেলে ভুলানো ছড়া।
মুলানো = দাম কষা।
রাহাল = রাখাল।
লাহের = কাঠি; হাতা। আঁশের বা সুপারি গাছের তৈরি মোট শলা বিশেষ; যা খাদ্য নাড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।
সালুন = তরকারী।
সিট্‌কি = এক প্রকার আগাছা৷ সিট্‌কির গুটা দিয়ে কালি তৈরি করা যায়। 'সিট্‌কি ডালে পুট্‌কি থুইয়া বিহালা বাজাই'—ক্ষেপানোর ছড়া।
সুচা = খাদ্য দেখলেই যে খেতে চায়।
সেউর আগা = পাতলা পায়খানা।
হাতুন = গাভি দোহনের পাত্র।
হাপুর হুপুর = শীঘ্র; জলদি৷ এ গাঙ্গে কুমড়ি নাই, হাপুর হুপুর নাইয়া যাই'—খেলার ছড়া।
হালট = চাষাবাদের কাজে।
হুদা = খালি।
হুমুন্দি = স্ত্রীর বড় ভাই।
হিগান = শিক্ষা।

www.pathagar.com

তথ্যসহায়ক

১. শেখ নেদন (মৃত): গ্রাম-বোকাইল, ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা - কৃষি শ্রমিক।

২. আবদুল ওহাব (মৃত): গ্রাম-বাখুণ্ডা, ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-কৃষিকাজ।

৩. ধুনাই মণ্ডল (মৃত): গ্রাম-রঘুয়াপাড়া, ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকচিকিৎসা।

৪. হাসন ফকির (মৃত): গ্রাম-রঘুয়াপাড়া, ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকচিকিৎসা।

৫. ইসহাক ফকির (মৃত): গ্রাম-বাখুণ্ডা(কুলুপাড়া), ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকচিকিৎসা (সাপের ওঁঝা)।

৬. ফুলজান বিবি (মৃত), স্বামী মৃত আহেজ মিয়াঃ গ্রাম-বাখুণ্ডা (দক্ষিণপাড়া), ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-গৃহিণী।

৭. জুলেখা বেগম (৭০) স্বামী মৃত মহিউদ্দিন মিয়াঃ গ্রাম-বাখুণ্ডা (মধ্যপাড়া), ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-গৃহিনী।

৮. ডাক্তার আলী আজগর (মৃত): গ্রাম+ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-গ্রাম্যচিকিৎসক (এলোপ্যাথিক)।

৯. আলী ফকির (মৃত): গ্রাম+ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পরে ফকিরী।

১০. সমশের ফকির (৬৫): গ্রাম-বাখুণ্ডা, ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-চায়ের দোকানদার ও লোক চিকিৎসা।

১১. চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী (মৃত): গ্রাম-আকইন, ডাকঘর-তাম্বুলখানা, উপজেলা-ফরিদপুর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-গ্রাম্যচিকিৎসক (এলোপ্যাথিক)।

১২. ফিরোজা বেগম (৫৫), স্বামী নিজাম উদ্দিনঃ গ্রাম-বাখুণ্ডা, ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-গৃহিণী।

১৩. খলিলুল্লাহ্-দিল-দারাজ (৫৮): গ্রাম-সাদিপুর, ডাকঘর-টেপাখোলা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-স্কুল শিক্ষক।

১৪. এস এম সামসুল হক (৬২): গ্রাম+ডাকঘরঃ টেপাখোলা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-সাহিত্যকর্ম।

১৫. মো. ফারুক (৪৫): গ্রাম-তুলাগ্রাম, ডাকঘর-কাফুরা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-সঙ্গীত শিক্ষক।

১৬. মনিমোহন সরকার (৬০): গ্রাম-পশরা, ডাকঘর-পশরা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-গায়ক।

১৭. সুনীল কুমার রাহুত (৬৮): গ্রাম-গোয়ালচামট, ডাকঘর-শ্রীঅঙ্গন, উপজেলা-ফরিদপুর

www.pathagar.com

সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-শিক্ষকতা (অব.)।

১৮. আবদুল বাতেন মিয়া (৬২): গ্রাম-বাখুণ্ডা, ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-স্কুল শিক্ষকতা (অব.)।

১৯. মোমরেজ ফকির (৫০): গ্রাম-বাখুণ্ডা, ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-ফকিরী (লোকচিকিৎসা)।

২০. আয়নাল মিয়া (৪৮): গ্রাম-বাখুণ্ডা, ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-কৃষিকাজ ও লোকশিল্পী।

২১. মান্নান মোল্লা (৫৮): গ্রাম-বাখুণ্ডা, ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-কাঠমিস্ত্রী ও লোকচিকিৎসক।

২২. সাদেক বয়াতি (৬২): গ্রাম-অম্বিকাপুর, ডাকঘর-ফরিদপুর, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর, পেশা-ব্যবসা।

২৩. সুফী আবদুল মজিদ-আল-চিশতী (৬৫): গ্রাম-দক্ষিণ আলীপুর, ডাকঘর-ফরিদপুর, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর, পেশা-চাকুরী (অবঃ)।

২৪. মোঃ নওশের আলী খান (৬৮): গ্রাম-বাখুণ্ডা, ডাকঘর-বাখুণ্ডা, উপজেলা-ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-কৃষিকাজ ও দর্জির কাজ।

২৫. আহম্মদ ফকির (মৃত): গ্রাম-কুঞ্জুনগর, ডাকঘর-কুঞ্জুনগর, উপজেলা-নগরকান্দা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী।

২৬. শেখ আলাউদ্দিন ফকির (৭০): গ্রাম-মাসাউজান, ডাকঘর-তালমা, উপজেলা-নগরকান্দা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-ফকিরী (লোকচিকিৎসক)।

২৭. মোকসেদ বয়াতি (মৃত): গ্রাম-বিনিকদিয়া, উপজেলা-নগরকান্দা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী।

২৮. মাখন বয়াতি (মৃত): গ্রাম-রসুলপুর, ডাকঘর-রসুলপুর, উপজেলা-নগরকান্দা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী।

২৯. মোতালেব শরীফ (মৃত): গ্রাম-রামচন্দ্রপুর, ডাকঘর-ভাবুকদিয়া, উপজেলা- নগরকান্দা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-সরকারি চাকুরি।

৩০. আয়নাল বয়াতি (৭০): গ্রাম-সদরদি, ডাকঘর+উপজেলা-ভাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী (বিচার গানের বয়াতি)

৩১. চাঁন মিয়া বয়াতি (মৃত): গ্রাম-সোনাখোলা, উপজেলা-ভাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী (বিচার গানের বয়াতি)

৩২. জমির উদ্দিন ফকির (মৃত): গ্রাম-উচাবাজার, উপজেলা-ভাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-কৃষিকাজ।

৩৩. হাবিবুর রহমান বাবু (৪০): গ্রাম-নূরপুর, ডাকঘর+উপজেলা-ভাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-সংস্কৃতিকর্মী।

৩৪. মীর ইউসুফ আলী (৫০): গ্রাম-হামিরদী, ডাকঘর-মুনসুরাবাদ, উপজেলা-ভাঙ্গা, জেলা-

www.pathagar.com

ফরিদপুর। পেশা-চাকুরী।

৩৫. শামসুন্নাহার (৩৫) পিতা-আছিরুদ্দিন আকন: গ্রাম-মাধবপুর, ডাকঘর-পুকুরিয়া, উপজেলা-ভাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-গৃহিনী।

৩৬. জীবন্নাহার (৪০) স্বামী-নূরুল ইসলাম: গ্রাম-মাধবপুর, ডাকঘর-পুকুরিয়া, উপজেলা-ভাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-গৃহিনী।

৩৭. মাঈনুদ্দিন আহমেদ (৫৭): গ্রাম-জাহাপুর, ডাকঘর-সাতৈর, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-এনজিও কর্মী।

৩৮. আকবর হোসেন সরকার (৫৮): গ্রাম-ইছাডাঙ্গী, ইউনিয়ন-রূপাপাত, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর। পেশা লোকশিল্পী।

৩৯. কাউসার হোসেন (৫৭): গ্রাম-বানা, ইউনিয়ন-বানা, উপজেলা-আলফাডাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-স্কুল শিক্ষক।

৪০. খোরশেদ বয়াতি (মৃত): গ্রাম-চাঁনপুর, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী।

৪১. মোসলেম বয়াতি (৬০): গ্রাম-বনমালিদিয়া, উপজেলা-মধুখালী, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী।

৪২. ফারুক-ই-আজম (৫৫): বোয়ালমারী সদর, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-সাংস্কৃতিককর্মী।

৪৩. নাজমুল হক নজীর (৫৭) : গ্রাম-শিয়ালদী, উপজেলা-আলফাডাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-সাংবাদিকতা ও সাংস্কৃতিক কর্মী।

৪৪. গনি বয়াতি (মৃত): চরভদ্রাসন সদর, উপজেলা-চরভদ্রাসন, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী (জারি গানের বয়াতি)।

৪৫. কুটি মুনসুর (মৃত): গ্রাম-লোহারটেক, চরভদ্রাসন সদর, উপজেলা-চরভদ্রাসন, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী।

৪৬. জাহাঙ্গীর হোসেন (৩৮): গ্রাম-হাজিগঞ্জ, উপজেলা-চরভদ্রাসন, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-চাকুরী।

৪৭. খোরশেদ (মৃত): গ্রাম-কাজিরসুরা, উপজেলা-চরভদ্রাসন, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী।

৪৮. মকছেদ খাঁ (মৃত): গ্রাম-বাইলাটি, উপজেলা-চরভদ্রাসন, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-কৃষি।

৪৯. তালেব মিয়া (৫৮): সদরপুর সদর, উপজেলা-সদরপুর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-সাহিত্যকর্ম।

৫০. আবদুল গফফার শেখ (৫৫): গ্রাম-চাপলডাঙ্গা, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী।

৫১. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (৪৮): গ্রাম- হাশেম মোল্লার ডাঙ্গী, উপজেলা-সদরপুর, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-কলেজ শিক্ষক।

www.pathagar.com

৫২. চ বি আবু বকর সিদ্দিক (৬০): গ্রাম-চরবন্দরখোলা, উপজেলা-সদরপুর, জেলা-ফ । পেশা-সাহিত্যকর্ম।

৫৩ ামসুন্দর সরকার (৫২): গ্রাম-চতুল, ইউনিয়ন-চতুল, উপজেলা-বোয়ালমারী, ,- রিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী।

৫৪. াতান বয়াতি (৫৪): গ্রাম-খরসুতি, ইউনিয়ন-ময়না, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপু । পেশা-লোকশিল্পী।

৫৫. মো. অ উব আলী (৫০): গ্রাম-চন্দনী, ইউনিয়ন-গুনবাহা, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-কৃষিকাজ।

৫৬. মো. আলী আশরাফ (৫৫): গ্রাম-ধুলজোড়া, ইউনিয়ন-পরমেশ্বরদী, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-কৃষিকাজ।

৫৭. লুৎফর রহমান বয়াতি (৫৫): গ্রাম-কাজীপাড়া, ইউনিয়ন-পরমেশ্বরদী, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-কৃষিকাজ।

৫৮. সিরাজুল ইসলাম (৫৭): গ্রাম-মুরাইল, ইউনিয়ন-ময়না, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী।

৫৯. শিউলী পারভীন (৪০): গ্রাম-চতুর, ইউনিয়ন-চাদপুর, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী।

৬০. রিনা পারভীন (৪২): গ্রাম+ইউনিয়ন-ময়না, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর। পেশা-লোকশিল্পী।

গ্রন্থ সহায়ক

১. মেছেরশাহ, সত্যধর্ম মারুফতে এছলাম, প্রকাশকাল অজ্ঞাত।
২. আবদুল হালিম মিয়াঃ জ্ঞান দর্পণ (১৯৫৭), হালিম সঙ্গীত, ১৯৪৭
৩ ঐ : মুসল্লি ও ফকিরের তর্কযুদ্ধ (১৯৫৮)
৪. ঐ প্রমসুধা (১৯৬৫)
৫ ালিম সঙ্গীত ও তর্কযুদ্ধ ২য় খণ্ড (১৯৬৮)
৬ পরশ রতন (১৯৭৬)
৭ : সৃষ্টিতত্ত্ব (১৯৯১)
৮ াসুদ রেজা : লোকসাহিত্যে ফরিদপুর, জেলা শিল্পকলা পরিষদ, ফরিদপুর ১৯৭৮
৯ শেখ শামসুল হক : ফরিদপুরের লোকসাহিত্য, রুনা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৯০
১০. জসীমউদ্‌দীন : জারীগান, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৮
১১. ঐ : মুর্শিদা গান, বাংলা একাডেমী, ঢকা ১৯৭৭
১২. ঐ : বাউল, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৩
১৩. আবুল আহসান চৌধুরী : মহিন শাহের পদাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৪. ড. মাসুদ রেজা : ফরিদপুরের লোককবি লোকগান, ফরিদপুর মিডিয়া সেন্টার, ফরিদপুর ২০০০
১৫. ঐ : মেছের শাহঃ জীবন ও গান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৭

www.pathagar.com

১৬. ঐ : ফরিদপুরের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা, বাংলা একাডেমী, ঢা[illegible]৮

১৭. ঐ : ফরিদপুরের একটি গ্রাম, চর্যাপদ, ফরিদপুর ২০১০

১৮. শফিকুর রহমান চৌধুরী : আবদুল হালিম বয়াতিঃ জীবন ও গান, বাংলা এ[illegible] ঢাকা ২০০০

১৯. রথীন্দ্রকান্তি ঘটক রায় চৌধুরী : কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত, বাংলা এ[illegible]ডেমী, ঢাকা ১৯৮৪

২০. ড. তপন বাগচী : বাংলাদেশের যাত্রাগান : জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা ২০০৭

২১. তালেব মিয়া : বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্য ও খ্যাতিমানদের ইতিবৃত্ত, ঢাকা ১৯৮[illegible]

২২. ঐ : যিকিরের প্রাণ, ঢাকা ১৯৯৬

২৩. এস, এম আলী ফকির : সাঝের তরী (১৯৭৩), পরশ পাথর (১৯৭৩)

২৪. আনেচ আলী চিশতি : (১৩৬৪ মৃত) তত্ত্বজ্ঞান ভাণ্ডার

প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য লেখা

১. জসীমউদ্‌দীন- পূর্ববঙ্গের ছড়া ও পাঁচালী, মাহেনও, ১৩৫৯

২. মোহাম্মদ নাফিজদ্দিন- ফরিদপুর জেলার ছড়া, ইত্তেফাক, ৭ মাঘ ১৩৬৮

৩. কে,এন মোসলেমউদ্দিন (সংগ্রহ), ফরিদপুরের ছড়া, ইত্তেফাক, ১৭ জুন ১৯৫৯

৪. কে,এন মোসলেমউদ্দিন (সংগ্রহ), ফরিদপুরের ছড়া, ইত্তেফাক, ১৭ জুন ১৯৬০

৫. খলিমুল্লাহ দিল-দারাজ- ফরিদপুরের কয়েকজন মরমী সাধক, গণমন, ডিসেম্বর ১৯৭৬

৬. ঐ- ফরিদপুরের বাউল সাধক, একাল, ৮ জুন ১৯৭৯

৭. ঐ- মরমী সাধক মেছের শাহ, আজকের আওয়াজ, অক্টোবর ১৯৯৯

৮. ঐ- বাংলাদেশের লোকসংগীতঃ বিচার ও জারীগান, লোকসংস্কৃতি উৎসব ২০০২

৯. ঐ- লোকসাহিত্য সংগীত সংগ্রহে জসীমউদ্‌দীন, জসীম স্মরণিকা ফরিদপুর ২০০৩

১০. মাসুদ রেজা- ফরিদপুরের লোকসাহিত্য, একাল, ৮ জুন ১৯৭৯

১১. ঐ- বাউল সাধক মেছের শাহ, গণমন, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮

১২. ঐ- এক অখ্যাত সাধক, দৈনিক সংবাদ ১৯৮১

১৩. ঐ- ফরিদপুরের বিবাহে লোকাচার ও মেয়েলীগীত, ফরিদপুরঃ ইতিহাস ঐতি[illegible] বৈশাখ ১৪১৭

১৪. ঐ- লোকগানে প্রবাদ-প্রবচনের ভূমিকাঃ ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুরঃ ইতিহা[illegible] বৈশাখ ১৪১৫

১৫. ঐ- বাউল ও সুফিতত্ত্বঃ মেছের শাহ, ফরিদপুরঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য, শ্রাবণ ১৪১৫

১৬. ঐ- ফরিদপুরের লোকসাহিত্য, ফরিদপুর দর্পণ, ১৯৭৭

১৭. ঐ- ফরিদপুরের লোকসংগীতের রূপরেখা, লোকসংস্কৃতি উৎসব ২০০২

১৮. ঐ- লোককবি মেছের শাহ, খঞ্জনা, ফেব্রুয়ারি ২০০২

১৯. শেখ শামসুল হকঃ লোকসাহিত্যের ভূমিকায় ফরিদপুর, দীপ্তবাংলা, ১৯৭৮

২০. মোহাম্মদ এমদাদুল হক : ফরিদপুর অঞ্চলের গাস্বি, ফরিদপুরঃ ইতিহাস ঐতিহ্য, বৈশাখ ১৪১৭

২১. মফিজ ইমাম মিলন- আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দ, ফরিদপুরঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য, বৈশাখ ১৪১৭

২২. মো. আলমগীর হোসেন- ফরিদপুরের হরিজন সম্প্রদায়, ফরিদপুরঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য, বৈশাখ ১৪১৭

www.pathagar.com

২৩. মঈনদ্দিন আহম্মেদ- সাধক কবি তাইজদ্দিন ও তার সঙ্গীত, গণমন।
২৪. ঐ- লোকগান ও বৃহত্তর ফরিদপুরের লোককবি, ফরিদপুরঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য, চৈত্র ১৪১৫
২৫. পরিতোষ হালদার- গোপালগঞ্জ অঞ্চলের লোকগান ও প্রবাদ-প্রবচন, ফরিদপুরঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য, চৈত্র ১৪১৫
২৬. ড. তপন বাগচী- মাদারীপুরের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়ঃ প্রসঙ্গ রাজৈর, ফরিদপুরঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য, চৈত্র ১৪১৫
২৭. ঐ- ফরিদপুরের যাত্রাগান ও যাত্রাদল, ফরিদপুরঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য, কার্তিক ১৪১৫
২৮. ঐ- ফরিদপুর অঞ্চলের লোকসংগীত, ফরিদপুরঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য, শ্রাবণ ১৪১৫
২৯. মো. নিশানে হালিম- লোকসংগীতের প্রবাদ পুরুষ আবদুল হালিম মিয়া, ফরিদপুরঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য, কার্তিক ১৪১৫
৩০. রবীন্দ্রনাথ অধিকারী- গোপালগঞ্জ জেলার লোকজসম্পদঃ একটি সমীক্ষা, ফরিদপুরঃ ইতিহাস ঐতিহ্য, কার্তিক ১৪১৫
৩১. অধ্যাপক এম,এ সামাদ- ফরিদপুরের লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতিক উৎসব ২০০২

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি